পুলিশোত্তম

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

আত্মজ

শ্রীমান মানসকুমার

স্নেহাস্পদেষু

এক ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেল বাংলার ওপর দিয়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঝড়। ওলট-পালট ঘটে গেল বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে। বাঙ্গালীর মানসিকতায়ও ঘটলো পরিবর্ত্তন। হের-ফের হলো জীবনের মূল্যবোধেরও।

সেই ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের পরে প্রায় ছ'টি বছর কেটে গেছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কোলে প্রায় এককোটি অসহায় মানুষকে সঁপে দিয়ে বাকিরা তখনও নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। এমনি এক দিনে কার্ত্তিক মাসের এক সকালে রাঢ় অঞ্চলের ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষকের বাড়িতে দশ বছরের একটি মেয়ে তার সতেরো বছরের ঘুমন্ত দাদার গায়ে ঠেলা দিয়ে তাকে ডাকছিল, ও দাদা—দাদা, আর কত ঘুমাবে ? এবার ওঠো। বেলা পানে তাকিয়ে দেখ। এর পরে আর কখন মাঠে যাবে ?

বোনের ডাকাডাকিতে দাদার কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না। একসময় দাদা নিজের গায়ের ছেঁড়া কাঁথাটাকে ভালোমত টেনে দিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমোবার উপক্রম করতেই বোন জোর করে সেই ছেঁড়া কাঁথাখানাকে সরিয়ে নেয়। এতক্ষণে চোখ মেলে তাকায় সেই দাদা। কার্ত্তিক মাসের প্রথম শীতে ঐ কাঁথার উষ্ণতার আমেজটুকু সরে যেতেই তার ভ্রূযুগল কুঁচকে ওঠে। পরক্ষণেই তার চোখ পড়ে বোনের মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মুখের সেই বিরক্তির চিহ্ন ছাপিয়ে সেখানে ফুটে ওঠে স্নেহরসের ধারা। বোনের ঢলঢলে মুখখানার দিকে কয়েকপলক তাকিয়ে থেকে কাঁথাখানা আবার গায়ের ওপর টেনে দিতে দিতে দাদা বলে ওঠে, না, আজ আর মাঠে যাবো না। আজ অনেকক্ষণ ঘুমাবো।

—সেকি ! 'বিস্মিত কণ্ঠস্বর বোনের, ঘরে দানাটাক চাল নাই। আর তুমি মাঠে না গিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমাবে ?

—হ্যাঁ ঘুমাবো। চোখবুজে জবাব দেয় দাদা।

—খাবে কি ? জিজ্ঞেস করে বোন।

—ছাই খাবো। মৃদু হেসে দাদা জবাব দেয়।

ঠিক এমনি সময় ঘরে ঢোকে ওদের মা। ছেলের কথাটা কানে যেতেই সে তাকে ধমকে ওঠে, ওকি অলুক্ষণে কথা বলছিস এই সাতসকালে? বালাই-ষাট। ওসব খেতে যাবি কেন রে!

এতক্ষণে বিছানায় উঠে বসে যুবকটি। স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, তা'ছাড়া আর কী খাবো, মা? তুমি তো বললো ঘরে নাকি চাল নাই।

—নাই তো নাই, তাই বলে তোকে ওসব খেতে হবে কেন, শুনি? দেখিস, আমি ঠিক জোগাড় করে আনবো।

একটু থেমে স্ত্রীলোকটি আবার সখেদে বলতে থাকে, নেহাত শরীলটা ভেঙ্গে পড়েছে। নইলে এই তিনটে প্রাণীর ভাতের জোগাড় আমি একাই করতে পারতাম। তোকে আর এভাবে সাতসকালে উঠে মাঠে গিয়ে দেহপাত করতে হতো না।

মিথ্যে বলেনি স্ত্রীলোকটি। একটি বছর পরে ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে ফিরে এসে অন্যের বাড়ির ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে সংসার চালাতো সে। এই করেই শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে তার।

স্ত্রীলোকটি এলোকেশী—গ্রামের চৌকিদার জনার্দন সামন্তর বিধবা। অন্য দু'জন তারই ছেলে-মেয়ে—জয়রাম ও তরঙ্গ।

ছ'বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এলোকেশী এখনও কেঁপে ওঠে। কী ভয়ানক দিনই-না গেছে। আকাশে মেঘ নেই, মাঠে ফসল নেই, মানুষের পেটে ভাত নেই। নিদারুণ হাহাকার চারিদিকে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার আশায় দলে দলে মানুষ হয়েছে ভিটে ছাড়া। গাঁয়ের রাজ-প্রতিনিধি চৌকিদার জনার্দনও অন্য উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল অজানা পথে। পেছনে পড়ে ছিল তার চৌকিদারী চাকরানার নিষ্কর জমি, পড়ে ছিল তার মাতৃসমা বৃদ্ধা পিসি ক্ষ্যান্তমণির স্মৃতি। তার তখনকার একমাত্র ভাবনা—যে করেই হোক দুর্ভিক্ষের হাত এড়িয়ে নিজেদের বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে এই ছেলে-মেয়ে দু'টোকে।

ফলবতী হয়েছিল জনার্দনের আকাঙ্ক্ষা। বেঁচেছিল স্ত্রী এলোকেশী, বেঁচে-ছিল তাদের পুত্র-কন্যা—জয় ও তরঙ্গ। কেবল বাঁচেনি জনার্দন নিজে

বাংলার সেই মন্বন্তর গ্রাস করেছিল তাকে। অবশেষে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বেগ একটু কমতেই অনন্যোপায় এলোকেশী ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ফিরে এসেছিল এই ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে।

ফিরে আসার সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে এলোকেশীর। এই একটা বছরের মধ্যেই ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের চেহারা পাল্টে গেছে। এক সুন্দরী সালঙ্কারা নারী যেন রোগগ্রস্তা এক বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছে। চারিদিকে কেমন যেন এক রুক্ষতা। শ্রীহীন গ্রাম। ঝোপ-ঝাড়ের পরিমাণ বেড়ে উঠেছে। বাড়িগুলোর কোনটার চাল নেই, কোনটার বা মাটির দেয়ালই উধাও হয়ে গেছে কিম্বা কাত হয়ে পড়েছে। যে দু'চারটা এখনও কোনরকমে টিঁকে আছে সেখানেও তেমন কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। কঙ্কালসার কয়েকটা কুকুর খাবারের খোঁজে এখানে-ওখানে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।

নিজেদের বাড়ির উঠোনে মাটির ওপর উবু হয়ে বসেছিল এলোকেশী। পাশে এগারো বছরের জয়রাম। মা-ছেলের কারুর মুখেই কথা নেই। ঘরের ভাঙ্গা দেয়াল ও উড়ে যাওয়া চালের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়েছিল তারা। সেইমুহূর্তে অতীতের কথা মনে পড়ছিল এলোকেশীর। তার নিজের বিবাহিত জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে এই বাড়িতে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে তার এই সংসার সেই মানুষটাই আর নেই। দু'টো ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে সে সরে পড়েছে। অগস্ত্যযাত্রা করেছিল জনার্দন। আর ফিরে আসেনি। অনন্যোপায় হয়ে কেবল এলোকেশীই ফিরে এসেছে ছেলে-মেয়ে দু'টোকে নিয়ে। স্বামীহীন ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে অন্ততঃ একটু মাথাগোঁজার ঠাঁই মিলবে, কিন্তু বিদেশ-বিভূঁয়ে যে তা-ও মিলবে না।

এলোকেশী ও জয়রাম নিঃশব্দে বসে থাকলেও চার বছরের তরঙ্গের মুখে কিন্তু কথার ফুলঝুরি। সংসারের দুঃখ কষ্ট এখনও স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। তাই চঞ্চল তরঙ্গ মা ও দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের বিরক্ত না করে আপন মনেই কথা বলতে বলতে চারিদিকে ঘুর ঘুর করছিল, আর ভাঙ্গা কলসীর কানা, শুকনো পাতা, মাটির ডেলা প্রভৃতি যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু পরম যত্নে এক জায়গায় জড়ো করে খেলার আয়োজন করছিল।

সন্ধ্যা হয়নি তখনও। সূর্য অস্ত গেলেও দিনের আলো তখনও স্পষ্ট। হঠাৎ একটু দূরে জেগে ওঠে এক কণ্ঠস্বর, কে—কে ওখানে?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় এলোকেশী। ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের আঁচলে ঘোমটা টানার বৃথা চেষ্টা করতে করতে লোকটির দিকে তাকিয়েই সে চিনতে পারে ভরু মিস্তিরকে। ভরুর সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। এই একটা বছরেই লোকটা যেন অনেকটাই বুড়ো হয়ে পড়েছে। পরনে ধুতি, গায়ে উড়নি। কোত্থেকে যেন ফিরছিল সে।

ভরু আবার জিজ্ঞেস করে, কে—কে তোমরা? কী করছো ওখানে?

এলোকেশীর ইঙ্গিতে এগিয়ে যায় জয়রাম। ভরু কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সোৎসাহে বলে ওঠে, আরে, তুই—তুই আমাদের জনার্দন চৌকিদারের ছেলে না? কি যেন নাম তোর—ছাই মনেও থাকে না।

ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, আমার নাম জয়রাম।

—ঠিক্-ঠিক্, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ভরু মিস্তির, তা, হ্যাঁরে জয়, কোত্থেকে ফিরে এলি রে তোরা? তা, তোর বাপ জনার্দনই বা—

কথাটা শেষ না করেই ভরু মিস্তির এলোকেশীর দিকে তাকিয়েই হঠাৎ থেমে যায়। এলোকেশী ততক্ষণে নিজের চোখে আঁচল চাপা দিয়েছে। সেই দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মুখে আক্ষেপের শব্দ করে আবার বলে ওঠে ভরু মিস্তির, জনার্দান নেই? বাপকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলি না?

জয়রাম চুপ্ করে থাকে। অনেকটা আপন মনেই বলে যেতে থাকে ভরু মিস্তির, বড়ই ভালো লোক ছিল রে, তোর বাপ। গাঁয়ের চৌকিদার—গাঁয়ের আপন জন। মানুষের বিপদে-আপদে জনার্দনই ছিল সকলের ভরসা। সেই জনার্দনই একদিন তোদের নিয়ে গ্রামছাড়া হলো। বারণ করলাম, শুনলে না। বললে, ভরুদাদা, এভাবে গ্রামে থেকে সবাই-মিলে শুকিয়ে মরতে পারবো না। কথার শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে চুপ্ করে ভরু মিস্তির।

সেই শুরু। বলতে গেলে সেদিন থেকেই নিজের পুরানো পরিবেশে নতুন-ভাবে বেঁচে থাকতে তৎপর হয়ে উঠেছিল এলোকেশী। মনে মনে স্বামী জনার্দনের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলেছিল, তোমাকে এ গাঁয়ের সবাই কতই না ভালো-বাসতো। তোমার ওপর গাঁয়ের লোকের সেই ভালোবাসার ওপর ভরসা করেই আমি চেষ্টা করবো তোমার জয়-তরঙ্গকে মানুষ করে তুলতে।

জয়রামকে মানুষ করে তুলতে পেরেছে কিনা জানে না এলোকেশী। তবে এটুকু জানে যে তার সেই কিশোর জয়রাম এই ছ'টি বছরে যতই যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছে ততই সে সবার নজর কাড়ছে। দেখতে শুনতেও যেমনি সুপুরুষ

তেমনি খেলাধুলো, কাজকর্মতেও সে সবার সেরা। এমনকি দুরন্তপনায়ও সে গ্রামের ছেলে-ছোক্‌রাদের মধ্যে এগিয়ে। অবশ্যি কাজকর্ম বলতে মাঠের কাজ—অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ। এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না এলোকেশীর। অন্যের বাড়িতে ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটেও তিনজনের সংসার চালানো যখন তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না তখনই কেবল সে জনার্দনের বন্ধু রমজান আলীর কথায় সায় দিয়ে বলেছিল, বেশ, যা ভালো বোঝেন করেন। সংসার যখন চলছেই না তখন এই কচি ছেলেটাকে দিয়ে দিনমজুরের কাজ করানো ছাড়া আর উপায় কি?

ইদানীং রমজান আলীই জনার্দনের এই অসহায় পরিবারটির প্রধান ভরসা। জনার্দনের মত রমজান কিন্তু দেশ ছেড়ে পালায়নি। সে এখনও ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের দক্ষিণচৌকির চৌকিদার। সেই সুবাদে চৌকিদারী চাক্‌রাণার নিষ্কর জমির দখলদারও সে। সেই জমিতে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে। সবার জমিতেই এবার ফসলের প্রাচুর্য। ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও যারা বেঁচেছিল তাদের মুখে এবার হাসি ফুটেছে। কেবল হাসি নেই এলোকেশীর মুখে। এক ছটাক জমিও নেই তাদের। গ্রাম ছেড়ে তারা একদা চলে গিয়েছিল। তাই গ্রামের উত্তর-চৌকির চৌকিদার জনার্দনের চৌকিদারী চাক্‌রাণার জমিটুকুও জমিদারের খাস হয়ে গেছে। এগারো বছরের ছেলে জয়রামের দিনমজুরী ও এলোকেশীর নিজের পরিশ্রম, এই দু'য়ে মিলেই তাদের সংসার-নৌকো এই দু'টি বছর ধরে কোনমতে ভেসে চলছিল।

সেই মুহূর্তে সেই সুখশয্যা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না জয়রামের। সুখশয্যা মানে একখানা ছেঁড়া মাদুর, তেল চিটচিটে একটা শক্ত বালিস ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা।

কিন্তু না উঠে উপায় নেই। তরি অর্থাৎ তরঙ্গ এই মুহূর্তে যা শোনালো অর্থাৎ ঘরে বাড়ন্ত চালের কথা তারপরে আর শুয়ে থাকা চলে না। জয়রাম বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই এলোকেশী বলে ওঠে, ওকি, উঠছিস কেন রে? এই না বললি আজ মাঠে যাবি না?

জয়রাম কিছু জবাব দেবার আগেই দশবছরের শাড়িপরা মেয়ে তরঙ্গ ভারিক্কি চালে বলে ওঠে, যাবে না তো কি? পড়ে পড়ে কেবল ঘুমাবে নাকি? এদিকে রান্নাঘরে যে চালের হাড়ি ফাঁকা।

—তুই থাম্ তো। তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না। তরঙ্গকে ধমকে ওঠে এলোকেশী। তারপর জয়রামের দিকে তাকিয়ে একটু স্নেহের

হাসি হেসে আবার বললে, না বাবা, ইচ্ছে যখন করছে না তখন আজ মাঠে না-ইবা গেলি। গেরস্থ ঘরে কি চালের হাঁড়ি একেবারে খালি রাখলে চলে? লুকানো যে-ক'টা চাল আছে তা দিয়েই না হয় দু'একটা দিন কোনরকমে চালিয়ে নেবো। তুই বাবা আর একটুকুন ঘুমা।

মায়ের কথায় জয়রাম সারা মুখে চাপা হাসি ছড়িয়ে বোনের দিকে তাকাতেই তরঙ্গ দাদার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে সেখান থেকে সরে যেতে যেতে বললে, হ্যাঁ, এবার তুমি নিশ্চিন্দে আরও একটুকুন ঘুমাও দাদা! কুম্ভকর্ণের মত ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমাও। তারপর সারাদিন পুকুরের জল, মাঠে-ঘাটে তোমার ঐ বাউণ্ডুলে বন্ধুদের সঙ্গে টো-টো করো গে।

সতেরো বছরের জয়রাম তার মায়ের চাইতেও তার এই দশবছরের বোনটিকে বেশি সমীহ করে। উচিত কথা বলতে ওর জুড়ি নেই। এই বয়সেই ওর চালচলন গিন্নী-বান্নীর মত। তরঙ্গর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে এলোকেশী। এতটা বয়স হলো, কিন্তু এখনও বিয়ে দিতে পারলে না। আর দেবেই বা কী দিয়ে? কেবলমাত্র পেটের ভাতক'টা জোগাড় করতেই যে তারা মা-ব্যাটা ক্লান্ত। নেহাত দিন-কাল পাল্টেছে, তাই রক্ষে। নইলে সমাজপতি সর্বেশ্বর কি আর ছেড়ে কথা কইতো? দশ বছরের আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে রাখার কথা দু'পাঁচ বছর আগেও তো কেউ কল্পনা করতে পারতো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। মন্বন্তরের কোপ গ্রামবাংলার সমাজ-ব্যবস্থার ওপরেও কম পড়েনি।

জয়রাম এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে বললে, না মা, এত বেলায় আর ঘুম আসবে না। আজ যখন মাঠের কাজেই আর যাওয়া হলো না তখন না হয় একবার বাহাদুরপুর গিয়েই একটু চেষ্টা-তদ্বির করে আসি।

—আর কত চেষ্টা করবি, বাবা? চেষ্টা তো কম করিস নাই। ফল কি কিছু হলো? মাঝখান থেকে গতায়াতের শ্রমই সার। অখুশি কণ্ঠে বলে ওঠে এলোকেশী।

জাবার দেয় জয়রাম, না মা, রমজান চাচাই বলছে আবার যেতে। বলছে, যা না, চেষ্টা কর, লেগে থাক। ফল একদিন ফলবেই। অন্যের জমি-জিরেতে এভাবে দেহপাত করে কী লাভ?

রমজানের নামে এলোকেশী চুপ করে থাকে। তার এই সংসারে রমজান আলীর কথাই শেষ কথা। বন্ধু জনার্দনের এই দুঃস্থ পরিবারটির জন্যে কী না করেছে রমজান? গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, নরহরি কবিরাজের

মত মানুষকে চটিয়েছে। অবশেষে এই তো সেদিন রাস্তায় সর্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা হতেই বলেছে, পেন্নাম হই চক্কোত্তিমশায়। একটুকুন কথা ছিল আপনার সঙ্গে। অভয় দেন তো বলি।

—বলো রমজান, বলো তোমার কথা। কৌতূহলী চোখে তাকায় সর্বেশ্বর।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে রমজান বললে, আপনারা হিন্দু, আমি মোছলমান। আপনাদের সমাজের কথা আমি বলি কোন্ মুখে? তবুও বলছি ঐ মেয়েটার মুখের পানে তাকিয়ে। শত হলেও বন্ধুর মেয়ে তো বটে।

—কার কথা বলছো? জনার্দনের মেয়েটার কথা?

—ঠিক্ ধরেছেন চক্কোত্তিমশায়। তরঙ্গ—তরঙ্গের কথাই বলছি।

—তা, কী হয়েছে মেয়েটার?

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রমজান, না চক্কোত্তিমশায়, কিছু হয় নাই। বলছিলাম তার বিয়ে শাদীর কথা। দশ বছর বয়স হয়েছে। বেধবা মা'র বিয়ে দেবার ক্ষেমতা কোথায়? আপনি সমাজের মাথা। আপনি যদি একটুকুন চেষ্টা না করেন তা'হলে ওরা দাঁড়ায় কোথায়, চক্কোত্তিমশায়? এর পরে তো ঐ দোষে আবার আপনারাই ওদের একঘরে করবেন।

—আর একঘরে! একটু হতাশ-কণ্ঠে বলতে থাকে সর্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, যা দিনকাল পড়েছে তাতে দেশ-গাঁয়ে সমাজ আর কোথায়? তবে হ্যাঁ, জনার্দন চৌকিদার একটা মানুষের মত মানুষ ছিল বটে। তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার। দেখি, কি করতে পারি।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে এলোকেশী গাঁয়ে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই ওদের ব্যাপারেই নরহরি কবিরাজের সঙ্গে বেশ একটু মনকষাকষি হয়েছিল রমজানের। এলোকেশীর তখন চরম দুরবস্থা। ঘরের মাথায় চাল নেই, পেটে ভাত নেই। দিনের পর দিন নিজে উপোস থেকেও ছেলে-মেয়ে দু'টোকে ঠিকমত দু'মুঠো ভাত দিতে পারছিল না। একমাত্র সহায় রমজান আলী। কিন্তু তার নিজের অবস্থাও ভালো নয়। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সে তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে। অবশেষে তারই চেষ্টায় এলোকেশী অন্যের বাড়ির ধান ভানতে, চিঁড়ে কুটতে শুরু করলে। প্রথম প্রথম এসব কাজ করতে গিয়ে একটু দ্বিধাবোধ করতো সে। শত হলেও গাঁয়ের রাজপ্রতিনিধি চৌকিদারের বৌ। একদা এই ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে খানিকটা আলাদা সম্মানের অধিকারিণী ছিল সে। কিন্তু জনার্দনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই আলাদা সম্মানের অস্তিত্ব আর ছিল না। তবুও

জনার্দনের বৌ হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে একটু বাধো বাধো ঠেকতো। এলোকেশীর মনের সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিন্তু বেশিদিন আর বজায় রইলো না। ছেলে-মেয়ে দু'টোর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে মন শক্ত করতে হলো তাকে। তার তখন একমাত্র চিন্তা নিজের বেঁচে থাকা আর জয়-তরঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখা।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হতো এলোকেশীকে। এগারো বছরের ছেলে জয়রামের তখন একমাত্র কাজ ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বাগ্দী ও মালোপাড়ার ছেলের দলের সঙ্গে মিশে খেলাধুলো ও টো-টো করে বেড়ানো। মা চাইতো তার ছেলে তার পাশে পাশে থেকে তাকে খানিকটা সাহায্য করুক। কিন্তু ছেলের সেদিকে নজর নেই। এলোকেশী বকাঝকা করতো, আর জয়রাম চুপ করে থাকতো। এলোকেশীর কথামত চলতোও না, আবার তার বকাঝকার প্রতিবাদও করতো না। অবশেষে একদিন রমজান তার উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ছেলের ওপর রাগে, দুঃখে একেবারে ফেটে পড়লো এলোকেশী।

গ্রীষ্মের দুপুর। সারা গায়ে ঘাম ও দু'পায়ে ধুলোর মোজা পরে রমজান এসে দাঁড়াতেই এলোকেশী একখানা কাঠের চৌকি এনে উঠোনের ছায়ায় বসতে দেয় তাকে। চৌকির ওপর বসতে বসতে রমজান এলোকেশীর হাতে-মুখে তুলোর আঁশ দেখে জিজ্ঞেস করে, তুলা পেঁজছিলেন নাকি, জয়ের মা?

গম্ভীর মুখে কেবল মাথা নাড়ে এলোকেশী। রমজান আবার বললে, সকাল থেকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী। দুপুরে একটুকুন বিশ্রাম না করলে শরীর কি থাকবে?

অনুযোগের সুরে জবাব দেয় এলোকেশী, কাজ না করে উপায় কি বলেন? ভাতের জোগাড় করতে হবে তো? এইমাত্তর মুখে দু'টো গুঁজে আবার কাজে লেগেছি। বাড়ুয্যে বাড়ি থেকে একধামা তুলা পাঠিয়েছে। আজই পেঁজে দিতে হবে।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে রমজান, একধামা তুলা আজই পেঁজে দিতে হবে! একা কি আর পারবেন? ছেলেটাকে ডেকে পাশে বসান।

জয়রামের প্রসঙ্গে একেবারে ফেটে পড়ে এলোকেশী। জবাবে বললে, কোথায় সে? ডাকবো কাকে? সেকি আর বাড়িতে আছে? শত্তুর—শত্তুর! একটা শত্তুরকে পেটে ধরেছিলাম। মায়ের কষ্ট কি আর বোঝে? দেখেন

গে, হয় কোথাও বসে ডাংগুলি খেলছে, নয় তো ফল-পাকড়ের আশায় গাছের ডালে ডালে চড়ে বেড়াচ্ছে।

এলোকেশীর কণ্ঠের চড়া সুরে একটু সময় চুপ করে থাকে রমজান। তারপর তাকে শান্ত হবার সুযোগ দিতে গিয়েই যেন সে বললে, একটু জল খাওয়ান তো জয়ের মা। বড় তেষ্টা পেয়েছে। যা চড়া রোদ্দুর।

এলোকেশী তাড়াতাড়ি চলে যায় বাড়ির ভেতর। তারপর একঘটি জল এনে রমজানের সামনে নামিয়ে রাখতেই রমজান ঘটির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, এভাবে জল খাবো কী করে? আপনাদের ঘটি আমি ছোঁব নাকি? আমার হাতে জল ঢেলে দেন।

এলোকেশী আবার এগিয়ে এসে রমজানের হাতে জল ঢেলে দেয়। জলপান করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে রমজান বললে, হ্যাঁ, বলেন এবার। ছেলেটার বিষয়ে কী যেন বলছিলেন?

—বলছি আমার কপালের কথা, ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে এলোকেশী, কী চরিত্তিরই না হয়েছে ছেলেটার! কোন কথাই কানে তোলে না। এদিকে আমি দুখে রক্ত উঠে মরি। দেন না ছেলেটাকে একটা কাজ-কম্মে লাগিয়ে।

—কাজ-কর্ম? ঐটুকুন ছেলে আবার কী কাজ-কর্ম করবে?

—কেন, কাজ-কম্মের অভাব কি? বলতে থাকে এলোকেশী, আপনারাই তো বলেন, মরে-হেজে গিয়ে গাঁয়ে নাকি এখন কাজের লোকের অভাব। মনিষের অভাবে অনেকের জমি নাকি অনাবাদী পড়ে আছে।

—তা'ঠিক, জবাবে বলতে থাকে রমজান, দেশে-গাঁয়ে মনিষের বড়ই অভাব। জোয়ান-মরদ নেই বললেই চলে। তাই তো জমি-জমার মালিকদিগের মধ্যে লেগে গেছে রেষারেষি। আজ ওমুকে দু'জন মনিষ জোগাড় করে আনে তো কাল আর একজন তাদের ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এ বলে, জমি দেব বাস্তুভিটে বানিয়ে থাক, আর আমার মাঠের কাজ কর। ও বলে, জমি তো দেবই, ঘর বানাবার পয়সা-কড়িও দেব। আয় আমার জমিতে।

রমজান থামতেই এলোকেশী বললে, তা'হলেই দেখেন। মনিষের যখন এতই অভাব তখন দেন না জয়ের একটা ব্যবস্থা করে। কাজে লাগলে স্বভাব-চরিত্তিরও বদলাবে, আর সংসারের একটুকুন সুরাহাও হবে।

এলোকেশীর প্রস্তাবে রমজান সরাসরি সায় না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে

কি যেন ভাবতে থাকে। এলোকেশী তাড়া দেয়, চুপ করে রইলেন কেন? ছেলেটার একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন না।

হঠাৎ যেন চমক ভেঙেছে এমনিভাবে রমজান তাকায় এলোকেশীর দিকে। রমজান লক্ষ্য করে, এলোকেশীর চোখ দু'টো ছল ছল করছে।

এলোকেশীর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা টের পায় রমজান। আরও একটু সময় চুপ করে থেকে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললে, বুঝতে পারছি জয়ের মা, আপনার মনের কথা আমি টের পাচ্ছি। ঐটুকুন একটা কচি ছেলেকে দিয়ে মাঠের কাজ করাতে আপনার মন সরছে না। শত হলেও মায়ের মন তো। তা'ছাড়া, আমাদের জনার্দন চৌকিদারের ছেলে। কোথায় ঐ ছেলে আজ পাঠশালায় যাবে, টোলে পড়বে। তা'নয়, ঐটুকুন ছেলেকে এখন মাঠের কাজে পাঠাবার কথা আপনাকে ভাবতে হচ্ছে। সবই আল্লার মর্জি। তা'নইলে জনার্দন ভাই-ই বা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন, আর আপনার সংসারেরই বা এমন হাল হবে কেন?

স্বামীর বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে গিয়ে চুপ করে থাকে এলোকেশী। জলে টলটল্ করতে থাকে তার চোখ দু'টো। রমজান একবার সেইদিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ, দেখি চেষ্টা করে। তবে, ছোট ছেলে তো। কেউ কি মাঠের কাজে ওকে লাগাতে চাইবে?

রাজি হলো নরহরি কবিরাজ। মনিষের অভাবে তার অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। তাই সে বললে, শোন বাপ রমজান, জনার্দন চৌকিদার মানুষটা ভালই ছিল, তার ছেলে বলেই রাজি হচ্ছি। তবে একটা কথা, একবেলা খোরাকী বাদে রোজ একসের করে চালের বেশি কিন্তু দিতে পারবো না।

—একসের মাত্তর? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রমজানের।

জবাবে নরহরি কবিরাজ বললে, তুমিই বলো, ঐটুকুন ছেলের মজুরী কি এর বেশি হয়? একবার বিবেচনা করো, বাপ। খোরাকী বাদে একসের চাল কি কম হলো?

—কম-বেশি জানিনা কবরেজ-মশাই, বলতে থাকে রমজান, এত কম মজুরীতে কে আসবে আপনার জমিতে কাজ করতে?

অনেক টানা-পোড়েনের পরে একসেরের বদলে দেড়-সেরে রাজি হলো রমজান। তবে নরহরিকে কথা দিতে হলো, ছেলেটা যদি ভালো কাজ করে তা'হলে চালের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সের বিচারের বদলে জয়রামের কাজের পরিমাণের বিচারেই তার মজুরী ঠিক হবে।

শুরু হলো এককালের রাজপ্রতিনিধি জনার্দন চৌকিদারের একমাত্র বংশধর জয়রামের কাজ। মাত্র এগারো বছর বয়সেই মাঠের কাজে নামতে হলো তাকে। পড়ে রইলো তার বন্ধু, বান্ধব। পড়ে রইলো তার খেলাধুলো। অনভ্যস্ত হাতে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম। সন্ধ্যায় গামছায় বাঁধা চালের পুটলিটা এনে এলোকেশীর সামনে নামিয়ে রাখতেই এলোকেশী ছেলেকে কাছে টেনে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে মাঠের কাজে খুব শ্রম হয়, না রে বাবা?

এলোকেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় জয়রাম, কাজ করলে শ্রম তো হবেই মা। তবে ফাঁকি দিতে পারলে শ্রম কম হয়।

—তুই কাজে ফাঁকি দিস্ নাকি, বাবা? জিজ্ঞেস করে এলোকেশী।

জবাব দেয় জয়রাম, রমজান চাচা বলে, কাজে এখন ফাঁকি দিলে পরে নাকি নিজেকেই ফাঁকে পড়তে হবে।

—হ্যাঁ বাবা, বলতে থাকে এলোকেশী, তোর রমজান চাচা ঠিক কথাই বলে। কাজে ফাঁকি তোর বাবার ধাতেও সইতো না। কথা বলতে বলতে জনার্দনের চৌকিদারী জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এলোকেশী।

অল্পদিনেই মাঠের অনভ্যস্ত চাষের কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে জয়রাম। আর তারপরেই নরহরি কবিরাজের সঙ্গে খটামটি শুরু হয় রমজানের। উপলক্ষ জয়রামের কাজের মজুরী হিসেবে সেই চালের পরিমাণ।

রমজান বলে, একী বলছেন কবরেজমশায়? একটা লোকের মজুরী যেখানে তিনসের চাল সেখানে আপনি এই ছেলেটাকে দেড়-সের দেবেন কেন? আমি নিজে মাঠে গিয়ে দেখেছি, জয় বয়সে কম হলেও একটা জোয়ান-মরদের কাজ করে। তা'হলে ওকে ঠকাবেন কেন?

রমজানের কথায় চটে ওঠে নরহির, কী আমি ঠকাচ্ছি? আমি ঠক্— আমি জোচ্চোর?

বিপাকে পড়ে রমজান। ধুরন্ধর নরহরিকে সে চেনে। এর পরেই হয়তো নরহরি সারা গাঁয়ে প্রচার করে বেড়াবে যে রমজান তাকে জোচ্চোর বলেছে। আর, এ নিয়ে জল ঘোলা করতেও সে ছাড়বে না। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, কবরেজমশায়। আমি আপনাকে জোচ্চোর বললাম কখন? এ চাক্‌লায় আপনাকে ঐ কথা বলার মত বুকের পাটা কার আছে শুনি? আমি বলছিলাম ঐ ছেলেটার কথা। বেধবার ছেলে।

দুঃখে-কষ্টে সংসার চলে। দেড় সের চালে ওদিগের চলে কেমন করে তা' একবার আপনিই বিবেচনা করেন।

একটু নরম হয় নরহরি। একটু সময় চুপ্ করে থেকে সম্ভবতঃ রমজানের অনুরোধেই বিষয়টা নিয়ে বিবেচনা করে। তারপর সেই বিবেচনার ফল প্রকাশ করতে গিয়ে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করার ভঙ্গিতে মুখ বেঁকিয়ে বললে, জনার্দনের ছেলে, আমাদিগের একটা দায়িত্ব তো আছে। এখন থেকে ধান-চালের বদলে মাসে মাসে না হয় ছেলেটা আটগণ্ডা করে পয়সা নেবে।

নরহরির কথায় কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলো রমজান। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠলো তার। একটা ছেলেকে সারামাস খাটিয়ে মাত্র আটগণ্ডা পয়সা মজুরী!

রমজানকে চুপ্ করে থাকতে দেখে নরহরি আবার বললে, তা'হলে ঐ কথাই রইলো, কি বলো হে রমজান? একবেলার খোরাকি আর মাস গেলে আটগণ্ডা পয়সা।

জবাবে এবার একটু দৃঢ় কণ্ঠেই রমজান বললে, না কব্রেজমশায়, তা' হয় না। দেশজুড়ে এই অনটন-মড়কের আগেই তো দিনমজুরী তিনসের চাল বা মাসমজুরী একটা পুরো টাকা ছিল। এখন তো আরও বেড়েছে। তাই বলছি, আপনি বরঞ্চ অন্যলোক দেখেন; কাল থেকে জয় আর আপনার কাজ করবে না।

কথার শেষে আর একটু সময়ও না দাঁড়িয়ে রমজান হন্-হন্ করে নরহরি কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কথাটা শুনে এলোকেশী প্রথমটায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল রমজানকে, তবুও তো ছেলেটা রোজ দেড়সের করে চাল ঘরে আনতো—।

জবাবে বলেছিল রমজান, তাই বলে ঐ জোচ্চোর কব্রেজ এভাবে ছেলেটাকে ঠকাবে? আপনি কিছু ভাববেন না জয়ের মা। আমি কাল থেকেই ওকে অন্য জায়গায় কাজে লাগাবো।

কথা রেখেছিল রমজান। ভক্ত মিস্তিরের কাজের লোকের তেমন একটা দরকার না থাকলেও রমজানের কথায় জয়কে সে নিয়েছিল তার মাঠের কাজে। মজুরী ঐ তিনসের চাল। সেই সঙ্গে তার মাঠের এটা-ওটা তরি তরকারি তো আছেই।

সেই থেকে একটানা প্রায় ছ'টি বছর জয়রাম কাজ করে চলেছে ভক্ত মিস্তিরের মনিব হিসেবে। এই বাপ-মরা ছেলেটাকে স্নেহও করে ভক্ত।

মাঝে মাঝে সে নিজেই আক্ষেপের সুরে জয়কে বলে, এভাবে আর কতদিন অন্যের জমিতে কাজ করে দেহপাত করবি রে? একটুকুন নিজের জমি যদি করতে পারতিস তো—।

ভকুর কথা তেমন একটা কানে তোলে না জয়। আসলে ভকুর কাছে সে ভালই আছে।

যেমনি দেখতে-শুনতে তেমনি কাজ-কর্মেও চৌকস ছেলে জয়। গাঁয়ের সমবয়সীদের মধ্যে সব ব্যাপারেই সে এগিয়ে। খেলা-ধুলোয়ও সে সবার সেরা। এ নিয়ে এলোকেশার যত গর্ব তার চেয়ে রমজানের গর্ব অনেক বেশি। একদিন সে হেসে বলেছিল এলোকেশীকে, জানেন জয়ের মা, আপনার ছেলে একখণ্ড আসল সোনা। অমি যদি মোছলমান না হতাম তাঁহলে আমার আমিনার সঙ্গে ওর শাদী দিতাম।

রমজানের কথায় এলোকেশী কেবল মৃদু হাসে। সেইদিকে তাকিয়ে রমজান আবার বলে, না—না জয়ের মা, হাসবেন না। ওর মত ছেলে দশটা গাঁয়ে আর নাই। জানেন জয়ের মা, এককালে রণপায়ে চড়ায় এ তল্লাটে আমার নাম-ডাক ছিল। আপনার ছেলে আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি রণপায়ে চেপে দৌড়তে পারে।

পুত্রগর্বে সেইমুহূর্তে এলোকেশীর বুকটা ভরে উঠলেও মুখে সে কিছু প্রকাশ করে না। অবশেষে একসময় মৃদু কণ্ঠে বললে, সোনার টুকরা হোক আর রূপার টুকরা হোক, সারাদিনের রোজগার তো কেবল ঐ তিনসের চাল। এদিকে মেয়েটার দিকে তাকালে তো আমার শরীলের রক্ত হিম হয়ে ওঠে। এতখানি বয়স হলো এখনও বিয়ের কোন ব্যবস্থাই হলো না। কত যে দুর্গতি আছে মেয়েটার অদেষ্টে!

ছয় বছরের মনিষ-জীবনে জয়রামের চরিত্রেও ঘটেছে দারুণ পরিবর্তন। ছয় বছর আগে যে জয়কে পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে পাঠানো দুঃসাধ্য ছিল সেই জয়রামই ইদানীং সারাদিন মাঠে খাটাখাটনির পরে সন্ধ্যায় চলে যায় বৃদ্ধ তারকনাথ তর্কতীর্থের বাড়িতে। ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে পণ্ডিত বলে নাম ডাক আছে তারকনাথের। অকৃতদার এই মানুষটি থাকেন তাঁর ভাইপোর সংসারে। একটা সংস্কৃত টোল আছে তাঁর। সংস্কৃত ছাড়া কিছু ফার্সিও জানেন তিনি।

জয়রামের এই লেখাপড়ার ব্যবস্থা অবশ্য ভকু মিত্তিরই করে দিয়েছিল। জয়ের সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, এ তো খুব ভালো কথা রে

ভয়। এতে লজ্জার কী আছে? আরে বাপু, সব বয়সেই লেখা-পড়া করা চলে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমিই তারক জ্যাঠার সঙ্গে কথা বলে তোর লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করে দেব।

তারকনাথ তর্কতীর্থ পণ্ডিত হলেও পুরাতনপন্থী। তাঁর ধারণা লেখা-পড়ায় একমাত্র উচ্চবর্ণেরই অধিকার। তাই, ভকু মিত্তির তাঁর সামনে জয়ের কথা পাড়তেই তিনি মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে বললেন, কী বলছো হে ভকু, সব ব্যাপারে তো সবার অধিকার থাকে না। চৌকিদার জনার্দন সামন্তর ছেলে জয়রাম সামন্ত। বাপ এককালে রাজপ্রতিনিধি থাকলেও ছেলে করে চাষবাসের কাজ।

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ভকু মিত্তির, না জ্যাঠা, ঠিক চাষবাস নয়। নিজেদের এক ছটাক জমি-জিরেতও নেই। আমার জমিতেই মনিষ খাটে।

—তা'হলে তো আরও ভালো, বলতে থাকেন তারকনাথ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে অন্যের জমিতে কাজ করে, সে করবে লেখা-পড়া? না বাবা ভকু, আমাকে অপাত্রে বিদ্যাদান করতে অনুরোধ করো না।

তারকনাথের কথায় একটু দমে যায় ভকু মিত্তির। সেদিন সে বড় মুখ করে জয়কে আশ্বাস দিয়েছিল। ভেবেছিল একটা ছেলের লেখা-পড়ায় আগ্রহের কথা শুনে তারকনাথ হয়তো খুশি হবেন।

তারকনাথের কথায় ভকু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে, শাস্ত্রে আছে নাকি যারা জন-মজুরের কাজ করে তারা লেখা-পড়া করতে পারে না?

—না—না, তাড়াতাড়ি জবাব দেন তারকনাথ, তেমন কোন কথা অবশ্য শাস্ত্রে নাই। তবে ব্যাপার কি জানো বাবা ভকু, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। যে চাষবাস করে তার মাথায় তো রাতদিন কেবল চাষবাসের কথাই ঘোরা-ঘুরি করে। লেখা-পড়া তার মাথায় ঢুকবে কেন?

তারকনাথের যুক্তির জবাবে ভকু পাল্টা যুক্তি দিতে পারলেও সে সেপথে গেল না। শত হলেও তারকনাথ তর্কতীর্থ পণ্ডিত ব্যক্তি। বিদ্যার অভিমান থাকলেও সে নিঃসন্দেহে বিদ্বান। তাই সে অনুরোধের সুরে বললে, ছেলেটার লেখা-পড়ায় বড়ই আগ্রহ, জ্যাঠা। আপনি যদি দয়া করে একটু .ন আপনার পায়ে ঠাঁই দেন তো ছেলেটা বর্তে যায়।

গরমে মাখন গলে, অনুরোধে গলে পাষাণ। শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন তারকনাথ। বললেন, ঠিক আছে—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দিও একবার। দেখি লেখাপড়ায় কেমন আগ্রহ ছেলেটার।

প্রথমদিন জয়রামকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তারকনাথ জিজ্ঞেস করেন, লেখা-পড়া তো শিখতে এসেছ। বলি, সংসারের অবস্থা কেমন?

সংসারের অবস্থা বলতে তারকনাথ সঠিক কী বোঝাতে চাইছেন বুঝতে না পেরে জয়রাম কেবল তাকিয়ে থাকে তারকনাথের মুখের দিকে।

নিরুত্তর জয়রামের দিকে তাকিয়ে নিজের সাদা ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত করে তারকনাথ আবার জিজ্ঞেস করেন, বলি, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া জোটে তো?

এবার মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, আজ্ঞে কোনরকমে চলে যায়। মা ও আমি দু'জনে মিলে—।

—ব্যস্-ব্যস্, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। বলে ওঠেন তারকনাথ, বোঝা গেল খাওয়া-দাওয়া জোটে। তা' বাপু, লেখা-পড়া তো করতে এসেছ। গুরুদক্ষিণা দিতে পারবে তো?

—গুরুদক্ষিণা! স্খলিত কণ্ঠস্বর জয়রামের।

—হ্যাঁ, গুরুদক্ষিণা। লেখা-পড়া শেখাবো, আর দক্ষিণা দেবে না?

একটু সময় চিন্তা করে জিজ্ঞেস করে জয়রাম, কী দক্ষিণা?

রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দেন তারকনাথ, তেমন কিছু বেশি নয়। মাসে কেবল এক মণ করে চাল।

—এক মণ চাল? টেনে টেনে কথাটা উচ্চারণ করে হঠাৎ থেমে যায় জয়রাম। প্রতিমাসে এক মণ করে চাল গুরুদক্ষিণা হিসেবে দেবার ক্ষমতা তাদের কোথায়? কাজেই লেখা-পড়া শেখার বিলাসিতা ত্যাগ করে তাকে আবার ঐ মাঠের কাজেই ফিরে যেতে হবে।

জয়রামের মনের কথা যেন টের পান তারকনাথ। মুখের সেই রহস্যময় হাসিটুকু বজায় রেখে তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ বাবা জয়রাম। আমার দক্ষিণা মাসে ঐ এক মণ চাল। তবে তেমন অবস্থায় কিছু কমও হতে পারে।

—কত কম? প্রশ্ন করে জয়রাম।

জবাব দেন তারকনাথ, খুবই কম। মাসে মাত্র একদানা চাল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাত্র একটি চালের দানা। লেখা-পড়ায় ছাত্রের মন থাকলে ঐ একটি দানা, নইলে পুরো এক মণ। তার এক ছটাকও কম নয়।

এরপরে আর লেখা-পড়ায় মন না দিয়ে উপায় থাকে না জয়রামের। সারাদিন ভক্ত মিস্ত্রিদের জমিতে কঠিন পরিশ্রম করে রাতে রেড়ির তেলের প্রদীপের সামনে বসে লেখা-পড়া করতে হয় তাকে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলেও এক মণ চালের ভয়ে লেখা-পড়ায় মন দিতেই হয়।

বছরখানেকের মধ্যেই বেশ কিছুটা সংস্কৃত শিখে ফেলে জয়রাম। এমন একটি মনোযোগী ছাত্র পেয়ে তারকনাথও খুশি। কেবল সংস্কৃতই নয়, সেই সঙ্গে কিছু কিছু ফার্সিও তিনি শেখাতে থাকেন জয়রামকে।

এমনিভাবে চললে জয়রাম আরও এগিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু বিধি বাম। শুরুতেই যার জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ, তার বিধি বাম তো হবেই। হঠাৎ একদিনের সান্নিপাতিক জ্বরে বিছানা নিলেন তারকনাথ এবং তে-রাত্তির পেরোবার আগেই চলে গেলেন তিনি। জয়ের লেখা-পড়াও শেষ হলো সেখানেই।

রমজানই সতেরো বছরের যুবক জয়রামের মাথায় জমিদার চন্দ্রনারায়ণের রাজধানী বাহাদুরপুর গিয়ে একটু চেষ্টা-তদ্বিরের পরিকল্পনা ঢুকিয়েছিল। বলছিল, শোন জয়, এভাবে জীবনটা নষ্ট না করে একবার সেখানে যা। গিয়ে বল যে এককালে তোর বাপ জনার্দন এই গাঁয়েরই চৌকিদার ছিল। সেই সুবাদে সে চৌকিদারী চাকরাণার জমি ভোগ-দখলও করতো।

—আমার বাবা এককালে জমি ভোগ দখল করতো বলে আমাকেও জমি দেবে কেন, রমজান চাচা ? প্রশ্ন তুলেছিল জয়রাম।

জবাবে বলে উঠেছিল রমজান, কেন দেবে না, শুনি ? তোর বাপ যে এতকাল নিজের সুখ-সুবিধা বেসজ্জন দিয়ে জমিদারের হয়ে খাটলো তার কোন দাম নাই নাকি ?

—সে তো বাবার এই গাঁ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

—কেন শেষ হয়ে যাবে ? তর্ক জুড়ে দিয়েছিল রমজান, তোর বাপ কি ইচ্ছা করে গাঁ ছেড়েছিল ? পেটের জ্বালায় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

পেটে কিছু বিদ্যে আছে জয়রামের। সেই সূত্রে তার যুক্তির ধারও হয়ে উঠেছিল খানিকটা প্রখর। সেই যুক্তি দিয়ে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না তার বাবা চৌকিদারী করতো বলে চৌকিদারী চাকরাণার যে জমি ভোগ-দখল করতো, সেই জমির স্বত্ব তার অবর্তমানে তার ছেলের ওপর বর্তাবে কেমন করে ? কিন্তু এসব যুক্তি রমজান মেনে নিতে চাইবে না। তাই সে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বলেছিল, আচ্ছা চাচা, ভেবে দেখি।

—ভেবে আবার কী দেখবি রে ? বলে উঠেছিল রমজান, কথায় আছে নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কিন্তু তুই তা-ও বুঝবি না। বেশ তো, না শুনলি আমার কথা। চিরটা জীবন অন্যের জমিতে গতর খাটিয়েই যাবি।

কথায় শেষে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রমজান।

রমজানের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব টের পেয়ে জয়রাম আবার বলেছিল, তুমি আমাকে শুধু শুধুই বাহাদুরপুর যেতে বলছো, চাচা। জমিদার চন্দ্রনারায়ণকে তো তুমি ভালই চেন। আমার তো বিশ্বাস হয় না সে আমাকে জমি ফিরিয়ে দেবে।

একটু সময় চিন্তা করে বলেছিল রমজান, বেশ তো তোর বাপের জমি তোকে না হয় ফিরিয়ে না দিল। কিন্তু আর পাঁচজনের মত তোকেও একখণ্ড চাষের জমির বন্দোবস্ত করে দিতে বাধা কোথায়, বল্?

—না, তেমন বাধা অবশ্য নাই, বলতে থাকে জয়রাম, জমিদার ইচ্ছা করলেই তা' পারে। জমিদারের খাসে তো অনেক জমি। খাজনার বদলে তার একখণ্ড সে সহজেই আমাকে দিতে পারে।

এরপরে বাস্তবিকই জয়রাম একদিন গিয়েছিল বাহাদুরপুরের জমিদারের কাছারিতে। এবং যথারীতি শুকনো মুখেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। জমির বন্দোবস্ত তো দূরের কথা, কাছারির কোন কর্তাব্যক্তির কাছে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগও সে পায়নি।

জয়রাম হাল ছাড়লেও রমজান কিন্তু হাল ছাড়েনি। বলেছিল, আবার যা সেখানে। লেগে থাক্। ফল একদিন ফলবেই।

বার কয়েক বাহাদুরপুরের কাছারির কাছে-পিঠে ঘোরাফেরা করে কেমন যেন একটা জেদ চেপেছিল জয়রামের। একখণ্ড জমি তাকে পেতেই হবে। রমজান চাচা ঠিক্ কথাই বলেছে। এভাবে অন্যের জমিতে খাটাখাটনি করে কী লাভ? দুর্বল শরীর নিয়ে এলোকেশীকে এখনও অন্যের কাজ করে দিয়ে সংসারের চাকা ঘোরাতে হয়। জয়রামের তিনসের চালে তো আর সংসার চলে না। এদিকে বোন তরঙ্গকেও আর ঘরে রাখা যায় না। এর পরে হয়তো তার আর বিয়েই হবে না। নেহাত দিন-কাল পাল্টে গেছে বলেই রক্ষে, নইলে দশ বছরের মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখার অপরাধে এতদিনে তাদের একঘরে হতে হতো।

দুই

বাংলা মুলুকে তখনও দ্বৈত শাসন চালু। একদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস, অন্যদিকে তার অনুচর বাংলার দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ। ব্রিটিশ সিংহের

ভয়ঙ্কর থাবা তখন একটু একটু করে শক্ত হতে আরম্ভ করেছে বাংলার বুকে। রাজ্যশাসনের চেয়ে রাজস্ব আদায়ের দিকেই তখন কোম্পানীর প্রধান নজর। আর এই কাজে তাদের প্রধান সহায় গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ। মহম্মদ রেজা খাঁ তার কর্মনৈপুণ্যে বাংলার বুকে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে গিয়েছিল, গঙ্গা গোবিন্দ হেস্টিংস সাহেবকে খুশি রাখতে সেই ক্ষতকে একটুও শুকোতে দেয়নি। রাজস্ব আদায়ের নামে বাংলার মানুষের ওপর তখনও আগের মতই অত্যাচার। তবে মহম্মদ রেজা খাঁ'র আমলের সেই মন্বন্তরের করাল ছায়া আর নেই। এক কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে বাংলার মানুষ তখন একটু একটু করে স্বাভাবিকতার পথে।

সকাল সকাল স্নান-খাওয়া সেরে গ্রামের পথ ধরে হন্-হন্ করে হেঁটে চলেছে জয়রাম। পরনে মালকোঁচা ধুতি, গায়ে হাতে-সেলাই ফতুয়া। ধুলি-ধুসরিত খালি পা। হাতে একখানা লম্বা বাঁশের তেল চক্‌চকে লাঠি। বাপ জনার্দনের মত জয়রামের মাথায়ও এক বোঝা বাব্‌ড়ি চুল। জয়রামের গন্তব্যস্থল জমিদার চন্দ্রনারায়ণের রাজধানী বাহাদুরপুর। উদ্দেশ্য সেই একই—একখণ্ড চাষের জমির বন্দোবস্ত।

কার্তিক মাসের প্রথম শীতের আমেজটুকু দুপুরের চড়া রোদের তেজে ততক্ষণে অন্তর্হিত। ঘুঘুডাঙ্গা থেকে বাহাদুরপুর, এই চার ক্রোশ পথের দু'পাশে কখনও বা ঘন জঙ্গল, কখনও বা ধান ক্ষেত। পাকা ধানের লোভে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর আনাগোনা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ—প্রচুর শস্য জন্মেছে এবার বাংলার মাটিতে। ছয় বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কোপে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক কোটি বাঙ্গালীর আত্মার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাতেই যেন এবার বাংলার মাটিতে সোনার ফসলের এমনি ছড়াছড়ি। যদিও কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের সহায়তায় ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মাধ্যমে এই সম্পদের একটা বড় অংশই চলে যাবে বিলেতে, তবুও বাংলার চাষীর মুখে তৃপ্তির হাসি।

হাসি নেই কিন্তু জয়রামের মুখে। এক ছটাক জমিও নেই তার। সেই জমি লাভের তদ্বিরেই সে চলেছে বাহাদুরপুর। বারে বারে বিফল হয়েও রমজান চাচার উপদেশে সে হাল ছাড়েনি।

পথ চলতে চলতে জমিদার চন্দ্রনারায়ণের কথাই ভাবছিল জয়রাম। স্বভাব-চরিত্রে এই মাঝ-বয়সী মানুষটি তার বাবা রুদ্রনারায়ণের ঠিক বিপরীত। মন্বন্তরের সময় তার কুকীর্তির কথা আজও গ্রামবাসীর মুখে মুখে। পাইক-

বরকন্দাজদের দিয়ে দল গড়ে অভুক্ত অসহায় গ্রামবাসীর ঘরে সে ডাকাতি পর্যন্ত করিয়েছে। তার অত্যাচারে প্রজাদের ঘরের সুন্দরী বৌ-মেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতেও পারতো না। সেই চন্দ্রনারায়ণ আজ জমিদার।

জমিদার কাছারির কাঠামোয়ও এসেছে দারুণ পরিবর্তন। জয়রামের বাবা জনার্দনের আমলের দেওয়ান হরিহর নন্দী আর বেঁচে নেই। এই মানুষটির বাস্তববুদ্ধি ও কর্মনৈপুণ্যের জোরেই এককালে রুদ্রনারায়ণের বাড় বাড়ন্ত। রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে চন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হলেও কোন মতে টিঁকে ছিল দেওয়ান হরিহর নন্দী। তার মৃত্যুর পরে নায়েব-দেওয়ান শম্ভুনাথ দেওয়ান হতে পারলে হরিহরের ধারাবাহিকতা হয়তো খানিকটা বজায় থাকতো। কিন্তু তা' হয়নি। রতনে রতন চেনে। তাই শম্ভুনাথকে টপ্‌কে চন্দ্রনারায়ণের যাবতীয় কু-কর্মের দোসর কৃষ্ণকান্ত দত্ত ওরফে কেষ্ট দত্ত যেদিন দেওয়ান হলো সেদিন মনের দুঃখে শম্ভুনাথকে জমিদারীর কাজ ছেড়ে চলে যেতে হলো। চন্দ্রনারায়ণের জমিদারীতে শুরু হলো কালো লম্বা একজোড়া শাণিত চোখের অধিকারী কেষ্ট দত্তের আধিপত্য। অসহায় প্রজাদের চোখের জলের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। একমাত্র ধ্যান জ্ঞান তার চন্দ্র-নারায়ণের জমিদারির আয় বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আখের গোছানো।

কাছারি ঘরে প্রজাদের ভিড়। নানারকম আর্জি নিয়ে এসেছে তারা। সেরেস্তার গোমস্তারা তাদের সামলাতে ব্যস্ত। তাদের তদারকি করছে নতুন নায়েব-দেওয়ান মুকুন্দলাল। পাশের ঘরে দেওয়ান কেষ্ট দত্তের দপ্তর। প্রজাদের ভিড়ের মধ্যে সতেরো বছরের যুবক জয়রামও দাঁড়িয়ে।

দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল জয়রাম। জমিদার কাছারিতে তিক্ত অভিজ্ঞতা তার। প্রথম কয়েকবার এখানে এসে তো সে কাছারিতেই ঢুকতে পারেনি। দেউড়ি থেকেই পত্রপাঠ বিদায় নিতে হয়েছিল তাকে। তারপরে যে ক'বার সে এখানে এসেছে নায়েব-দেওয়ান মুকুন্দলালের মুখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা শুনতে হয়েছে তাকে—খাসের জমি আর কোথায় যে বন্দোবস্ত দেয়া হবে? সব তো আগেই বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা' জয়রামের মত অজ্ঞ লোকও বুঝতে পারে। আসলে এসব পেটোয়া লোকের কাছে জমি বন্দোবস্ত দেবার মতলব। এই বাবদ নায়েব দেওয়ানের পকেটে কিছু আসে। বোধহয় খোদ্ দেওয়ান কেষ্ট দত্তও তা' থেকে বঞ্চিত হয় না।

জয়রামের পালা আসতেই ফরাসপাতা বিছানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে থাকা মুকুন্দলাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, তুই আবার এসেছিস্ এখানে ? তোকে না সেদিন বলেছি যে বন্দোবস্ত দেবার মত কোন খাস জমিই আর অবশিষ্ট নেই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আভূমি নত হয়ে মুকুন্দলালকে প্রণাম করে জবাব দেয় জয়রাম।

মুকুন্দলাল এবার তেড়ে ওঠে, তা'হলে আবার এসেছিস কেন ?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে, ভেবেছিলাম যদি ইতিমধ্যে—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় জয়রাম।

—যদি ইতিমধ্যে নতুন কোন জমি খাসে আসে, তাইতো ?

মাথা নেড়ে সায় দেয় জয়রাম।

কঠিন স্বরে বলতে থাকে মুকুন্দলাল, জমিদারের খাস জমির বন্দোবস্ত পাওয়া কি এতই সোজা ? একি ছেলের হাতের মোয়া ?

—আজ্ঞে না। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম।

—তা'হলে আর শুধু শুধু ঘোরাঘুরি করছিস কেন ? সরে পড় এখান থেকে।

নায়েব-দেওয়ান মুকুন্দলালের কথায় দমে যায় জয়রাম। বিরূপ হয়ে ওঠে মন এই মুকুন্দলালের ওপর। সেইমুহূর্তে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে—আর নয়। এভাবে ঘোরাঘুরি করা একান্তই অর্থহীন। জমি সে কোন কালেই পাবে না। পরের জমিতেই তাকে চিরকাল কাজ করে যেতে হবে। কাজেই আর সে এপথ মাড়াবে না।

ম্লান মুখে কাছারি থেকে সবে বেরোতে যাবে জয়রাম, হঠাৎ উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন ওঠে—জমিদার—জমিদার।

এই প্রথম জমিদার চন্দ্রনারায়ণকে চাক্ষুস দেখতে পেল জয়রাম। বাস্তবিকই সুপুরুষ। গায়ের দুধে-আলতায় রং যেন ফেটে পড়ছে। কাছারির টানা বারান্দার অন্যপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে চন্দ্রনারায়ণ। কাছারির প্রহরীরা লাঠি হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর প্রজাপুঞ্জ অপলক চোখে তাকে দেখতে দেখতে অর্জন করতে থাকে রাজ-দর্শনের পুণ্য।

চন্দ্রনারায়ণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। সে সোজা এগিয়ে আসতে থাকে দেওয়ান কেষ্ট দত্তের ঘরের দিকে। ইতিমধ্যে কাছারির কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। জমিদার নিজে সচরাচর কাছারিতে আসে না।

প্রয়োজনে দেওয়ান কিম্বা নায়েব-দেওয়ানকে ডেকে পাঠায় অন্দরে। কাজেই জমিদার নিজে যখন কাছারিতে আসছে তখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা কিছু গুরুতর। ব্যস্ত হয়ে ওঠে কাছারির গোমস্তারা। ফরাস ও তাকিয়ার আরাম-শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় মুকুন্দলাল। ততক্ষণে খোদ্ দেওয়ান কেষ্ট দত্তও নিজের ঘর ছেড়ে সশব্যস্তে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

চন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান কেষ্ট দত্তর কাছাকাছি আসতেই কেষ্ট দত্ত বিনীত ভঙ্গিতে তাকে নমস্কার করে। চন্দ্রনারায়ণ একটা ভাঁজ করা কাগজ কেষ্ট দত্তকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, সোনামুখীর শিব মিত্তিরের হাতে এই চিঠিটা এখনই পৌছানো চাই। খুব জরুরী। একপ্রহরের মধ্যেই তার কাছ থেকে জবাব নিয়ে আসতে হবে।

—এক প্রহরের মধ্যে? চিঠিটা হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করে কেষ্ট দত্ত।

—হ্যাঁ, এক প্রহরের মধ্যে। জবাব দেয় চন্দ্রনারায়ণ, তার জবাব পেলেই আমি রওনা হবো সেখানে। জরুরী দরকার। কথার শেষে চন্দ্রনারায়ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে যেতে থাকে অন্দরের দিকে। আর, চিঠিখানা হাতে নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে কেষ্ট দত্ত।

জরুরী দরকারটা যে কী, তা' অজানা নয় কেষ্ট দত্তর। সোনামুখীর শিব মিত্তির চন্দ্রনারায়ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জমিদার না হলেও ধনী লোক সে। প্রচুর জমিজমার মালিক। জমিদার প্রাসাদের মতই তার চক্‌মেলানো বাড়ি। সেখানে সর্বদাই রকমারি ফূর্তির ব্যবস্থা মজুদ। অকৃতদার শিব মিত্তির সর্বদাই ডুবে থাকে তার মধ্যে। আর এই ফূর্তির টানেই চন্দ্রনারায়ণ যখন-তখন এসে হাজির হয় সেখানে। দুই বন্ধু একটানা বেশ কয়েকদিন ডুবে থাকে তার মধ্যে। অবশেষে ক্লান্ত চন্দ্রনারায়ণ একদিন ফিরে আসে নিজের আস্তানায়।

ঝানু দেওয়ান কেষ্ট দত্তর এসব অজানা নয়। সে নিজেও এটাই চায়। চন্দ্রনারায়ণ জমিদারির কাজকর্ম থেকে যতই দূরে থাকে ততই কেষ্ট দত্তর সুবিধে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে চন্দ্রনারায়ণের মর্জি নিয়ে। সে যা বলবে তার একচুল এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। সে যখন বলেছে যে একপ্রহরের মধ্যে জবাব আনতে হবে তখন তার চাইতে এক দণ্ড দেরি হলেও চলবে না।

চন্দ্রনারায়ণ চোখের আড়ালে অদৃশ্য হতেই কেষ্ট দত্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। মুকুন্দলালকে ডেকে বললে, ওহে মুকুন্দ, দাঁড়িয়ে দেখছো কি হে? শুনলে তো কর্তার হুকুম। একপ্রহরের মধ্যে সোনামুখী থেকে জবাব নিয়ে আসতে

হবে। শিগ্‌গির জগা বাগ্দীকে ডেকে পাঠাও।

এ অঞ্চলের নামকরা রণপায়ী জগা বাগ্দী জমিদারের লেঠেল দলেরই লোক। বাহাদুরপুর থেকে সোনামুখী, এই ন'দশ ক্রোশ রাস্তা একপ্রহরের মধ্যে যেতে-আসতে পারে একমাত্র সে একাই। রণপায়ে চেপে যেন সে উড়ে যায়। কাজেই এধরনের কাজে জগাই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

কেষ্ট দত্তর কথায় বলে ওঠে মুকুন্দলাল, জগাকে আপনি পাবেন কোথায় দেওয়ানমশাই? আজ ছ'সাত দিন ধরে সে তো জ্বরে বিছানায় বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।

—সেকি হে! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে কেষ্ট দত্ত. জগা ছাড়া আর কে মাত্র একপ্রহরের মধ্যে ন'দশ ক্রোশ রাস্তা রণপায়ে পাড়ি দিতে পারবে?

জবাব দেয় মুকুন্দ, এতল্লাটে তেমন কাউকে তো আর দেখছি না।

—তা'হলে কি হবে, মুকুন্দ? বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, একপ্রহরের মধ্যে জবাব না পেলে কর্তা তো খেপে উঠবে। তখন?

—তখন আর কি? বলে ওঠে মুকুন্দ, কর্তাকে বললেই হবে যে জগা অসুস্থ বলেই অন্য লোককে পাঠানো হয়েছিল। তাই দেরি হয়েছে। আমাদের কর্তা একরোখা হলেও অবুঝ তো নয়। বোঝালে বুঝবে না কেন?

—তা' যদি তুমি বুঝতে, বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, তোমাকে তো আর সামলাতে হয় না। যাক্‌গে, এবার বলো এখন কী করি? কাকে এখন সোনামুখী পাঠাই?

জবাব দেয় মুকুন্দলাল, বলেন তো রণপায়ীদের মধ্যে অন্য কাউকে ডেকে পাঠাই। তবে একপ্রহরের মধ্যে সোনামুখী থেকে ফিরে আসতে পারে এমন কাউকেই তো দেখছি না।

কাছারির টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেষ্ট দত্ত ও মুকুন্দলাল যখন কথা বলছিল তখন একপাশে দাঁড়িয়েছিল প্রজারা। খোদ্ জমিদারের আগমনে সেরেস্তার নায়েব-গোমস্তাদের কাজেও ঘটেছিল ছন্দপতন। জয়রামও দাঁড়িয়েছিল একপাশে। হঠাৎ সে বলে ওঠে, অনুমতি করেন তো একটা কথা বলতে পারি, দেওয়ানমশাই।

ইদানীং জমিদারি সেরেস্তায় যাতায়াত করতে করতে প্রজাদের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ রপ্ত করে ফেলেছিল জয়রাম। তাই সে কথাটা বলেই জোড়হাতে একটু নীচু হয়ে তাকিয়ে থাকে কেষ্ট দত্তর মুখের দিকে।

ভ্রু কুঁচকে জয়রামের দিকে তাকায় কেষ্ট দত্ত। ছোকরার সাহস তো কম

নয়! তাদের কথাবার্তার মধ্যে কথা বলছে। জিজ্ঞেস করে মুকুন্দলালকে, কে হে এই ছোক্‌রা, মুকুন্দ?

বিরক্ত চোখে জয়রামের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয়, আজ্ঞে এই ছোকরা হচ্ছে ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের চৌকিদার জনার্দনের ছেলে।

—ঘুঘুডাঙ্গার চৌকিদার জনার্দন? কেষ্ট দত্তর কণ্ঠে বিস্ময়।

নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দেয় মুকুন্দলাল, না—না, এখন আর নেই। আগে ছিল। আকালের সময় গাঁ ছাড়া হয়ে বাঁচতে গিয়ে মারা গেছে।

এতক্ষণে জনার্দনকে মনে পড়ে কেষ্ট দত্তর। নিজের শাণিত চোখজোড়া জয়রামের মুখের ওপর স্থির রেখে মুকুন্দলালকে প্রশ্ন করে, তা, ছোক্‌রা এখানে কেন? কী চায়?

জবাব দেয় মুকুন্দ, খাস জমি বন্দোবস্ত নেবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। ওর বাপের চৌকিদারি চাকরাণার যে জমিজমা ছিল তা' তো খাসে চলে গেছে।

—বুঝেছি। মুকুন্দলালের কথার জবাব দিয়ে কেষ্ট দত্ত এবার খোদ্ জয়রামকেই জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলি তুই?

একমুহূর্ত দ্বিধা করে জয়রাম বললে, বলছিলাম কি, আমি রণপায়ে চাপতে পারি। ভালই পারি। অনুমতি করেন তো আমি সোনামুখী যেতে পারি।

—তুই যাবি? অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করে কেষ্ট দত্ত, পারবি এক-প্রহরের মধ্যে সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে?

—আজ্ঞে, চিঠির জবাব পেতে যদি দেরি না হয় তো নিশ্চয়ই পারবো।

জয়রামের মত একটা ছোক্‌রার কথায় ভরসা করা যায় কিনা তা-ই বুঝতে কেষ্ট দত্ত মুকুন্দলালের দিকে তাকাতেই মুকুন্দলাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এসব ছেলে-ছোক্‌রাদের কথায় বিশ্বাস কি, দেওয়ানমশাই? আমাদের রণপায়ীদের মধ্য থেকেই কাউকে—।

কথার মাঝখানেই বলে ওঠে কেষ্ট দত্ত, তাদের মধ্যে কি কেউ কাজটা সেরে ফিরে আসতে পারবে একপ্রহরের মধ্যে?

—আজ্ঞে না, তা' অবশ্য পারবে না। তবে—।

আবার তার কথার মাঝখানে কেষ্ট দত্ত বলে ওঠে, কেউ যখন পারবেই না তখন এই ছোক্‌রাকে একবার পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি?

মুকুন্দলালকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কেষ্ট দত্ত জয়রামকে আবার বললে, ভালো করে ভেবে দেখ্, ছোক্‌রা, পারবি তো একপ্রহরের

মধ্যে ফিরে আসতে? কেষ্ট দত্তর চোখে শাসানি।

—আজ্ঞে পারবো। স্পষ্ট স্বরে জবাব দেয় জয়রাম।

জয়রামের কথায় কেবল কেষ্ট দত্ত ও মুকুন্দলালই নয়, উপস্থিত প্রজাকুলও কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ছেলেটা পাগল নাকি? বাহাদুরপুর থেকে সোনামুখী, এতখানি পথ একপ্রহরে পাড়ি দিয়ে ফিরে আসা কি যার-তার কর্ম? ওস্তাদ রণপায়ীরা যা পারে না কোথাকার এই ছোক্‌রা পাগল না হলে সেই কাজের দায়িত্ব কেন নিতে চাইছে নিজের ঘাড়ে? না পারলে যে ওর কী দুর্দশা হবে তা' বোধহয় ও জানে না।

শাসানির স্বরে কেষ্ট দত্ত আবার জিজ্ঞেস করে, যদি না পারিস্ তা'হলে কী হবে?

অম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, পিঠের ছাল খুলে নেবেন।

এরপরে আর কিছু বলার থাকতে পারে না। জোগাড় হলো একজোড়া রণপা। জমিদারের চিঠি নিয়ে রণপায়ে চেপে জয়রাম রওনা হলো সোনা-মুখীর উদ্দেশে। আর তার ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে করতে প্রজারাও এসে আবার ভিড় করে দাঁড়ালো নায়েব-গোমস্তাদের কাছে। শুরু হলো আবার জমিদারি সেরেস্তার কাজ।

একপ্রহর পার হতে তখনও দণ্ডদু'য়েক বাকি। ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে সোনামুখী থেকে ফিরে এলো জয়রাম। সঙ্গে শিব মিত্তিরের নিজের হাতে লেখা জবাব।

শিব মিত্তিরের চিঠিখানা হাতে নিয়ে জয়রামের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে দেওয়ান কেষ্ট দত্ত। ছেলেটাকে প্রশংসা করতেই হয়। এই ছেলেটা না থাকলে আজ চন্দ্রনারায়ণের কাছে কড়া কথা শুনতে হতো তাকে। জয়রামই তাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সেকথা মুখে প্রকাশ না করাই দেওয়ানী রীতি। রাজার প্রশংসায় প্রজা আস্কারা পায়।

দেওয়ান কেষ্ট দত্ত তার শাণিত চোখের দৃষ্টিকে যথাসম্ভব নরম করে জয়রামের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, তোর বরাত ভালো রে জয়রাম। এতদিনে একটা পুণ্যের কাজ করার সুযোগ পেলি।

কেষ্ট দত্তর কথার সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে জয়রাম কেবল তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কেষ্ট দত্ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে আবার বললে, কিরে, বুঝতে পারলি না তো? আরে বাপু, জমিদার ভগবানের সমান। আজ সেই ভগবানের কাজ করার সুযোগ পেলি তুই। এর চাইতে বড় পুণ্যের

কাজ আর কী হতে পারে?

জয়রাম এবারেও কোন জবাব না দিয়ে কেবল চুপ্ করে থাকে। তারপর একসময় মৃদু কণ্ঠে বললে, অনুমতি করেন তো আমি এবার যাই।

—যাবি? একটু সময় চিন্তা করে কেষ্ট দত্ত আবার বললে, হ্যাঁ, ভালো কথা, তুই যেন কী জন্যে এই কাছারিতে ঘোরাঘুরি করছিস্?

—আজ্ঞে, একখণ্ড খাস-জমি বন্দোবস্ত নেবার জন্যে।

—হ্যাঁ—ঠিক, এবার মনে পড়েছে। বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, একখণ্ড খাস-জমি চাই তোর। কেমন, এই তো?

মাথা নেড়ে সায় দেয় জয়রাম। কেষ্ট দত্ত আবার বললে, তা'বাপু, খাস-জমি বন্দোবস্ত নিয়ে আর কতটা লাভ হবে তোর? তার চাইতে একখণ্ড জমি যদি কোনরকমে কিনতে পারিস্—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় কেষ্ট দত্ত।

মৃদু কণ্ঠে জয়রাম এবার জবাব দেয়, নিজের জমি আর কোনকালেই আমার হবে না, দেওয়ানমশাই। জমি কেনার পয়সা-কড়ি পাবো কোথায়? পরের জমিতে খাটা-খাটনি করে কোনরকমে দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করি।

—হুঁ, গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করে কেষ্ট দত্ত। তারপর হঠাৎ জয়রামের আপাদমস্তক জরিপ করার ভঙ্গিতে একবার ভালোমত দেখে নিয়ে অনেকটা আপন মনে বলতে থাকে, বয়স কম হলেও বেশ বাড়ন্ত গড়ন। দেখতে-শুনতেও শক্ত-সমর্থ। তা'ছাড়া রণপায়ে চাপতেও ওস্তাদ। আচ্ছা, পাইক-বরকন্দাজের কাজ করতে রাজি আছিস তো?

কেষ্ট দত্তর কথায় সহসা কোন জবাব দিতে পারে না জয়রাম। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে কেবল তাকিয়ে থাকে কেষ্টর মুখের দিকে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। এসেছিল একখণ্ড খাস জমির বন্দোবস্ত নিতে। তার বদলে একেবারে পাইক-বরকন্দাজের চাকরি। আর এই চাকরি মানেই একখণ্ড সরেস জমি ভোগ-দখল করার অধিকার। চৌকিদারি চাকরানায় যতটা জমি পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি জমি পেয়ে থাকে একজন পাইক। বলতে গেলে একেবারে নিজস্ব একখণ্ড জমি। নিষ্কর—নিঃসর্ত।

জয়রামের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কেষ্ট দত্ত আবার বললে, কিরে একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে। বলি, আপত্তি নেই তো? কথার শেষে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে সে।

—আপত্তি! কী যে বলেন দেওয়ানমশাই। কথাটা বলতে বলতে

জয়রাম এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কেষ্ট দত্তকে।

—থাক্—থাক্। তেমনি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে হাসতে বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, শোন্ জয়রাম, তোর বাপ এককালে ছিল চৌকিদার। আর তুই হলি গিয়ে পাইক। বাসুদেবগঞ্জের থানায় কাজ করবি তুই। আর হ্যাঁ, কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি পাবি। পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করবি। থানার কাজ-কর্ম করবি মন দিয়ে।

দেওয়ান কেষ্ট দত্তর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় জয়রামের চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে ওঠে।

আগুনের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘুঘুডাঙা গাঁয়ে। আরে ব্বাস্ রে! ঐটুকুন ছেলে কিনা সরাসরি বাসুদেবগঞ্জ থানার পাইক! শুভাকাঙ্ক্ষীরা খুশি হয়। আর যারা তা' নয় তারা বলে অন্য কথা। বলে, আরে দেখ না রগড়টা। দেওয়ানকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে পাইকের কাজ জোটালেই কি হলো? মনে করছো নাকি তিষ্ঠোতে পারবে? দু'দিনেই সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে পালাতে পথ পাবে না। তখন দেখবে কপালে কত দুর্গতি।

রমজান যেন পাগল হয়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই ডেকে বলছে জয়রামের কৃতিত্বের কথা। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্ছে। বলছে, আরে বাপু কার ছেলে একবার দেখতে হবে তো! অমন বাপের এমন ছেলে না হলে মানাবে কেন? তোমরা দেখে নিও এই ছেলে একদিন ওর সেই বাপকেও ডিঙিয়ে যাবে। তা' যাবে বলছি কেন, ডিঙিয়ে তো গেছেই। বাপ জনার্দন ছিল এই গাঁয়ের চৌকিদার। আর ছেলে হয়েছে থানার পাইক—খোদ্ থানাদারের নিজের লোক।

বাড়িতে দশ বছর বয়সের বোন তরঙ্গ গিন্নী-বান্নীর মত ভারিক্কি চালে বলে, ভালই হয়েছে। পাইকের চাকরি আর সেই সঙ্গে নিজের জমি। এখন যদি সংসারের হাল একটুকুন ফেরে। তা' বাপু যে যাই বলুক, সব্বাই আমার যায় না। দাদা পারবে তো পাইকের কাজ করতে?

এলোকেশীর মুখে কিন্তু কোন কথা নেই। আনন্দের আতিশয্যে সে কথা হারিয়েছে। কেবল দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে সেই মানুষটাকে যে নাকি তাদের সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে অসময়ে বিদায় নিয়েছে। সেই মানুষটা আজ বেঁচে থাকলে কতই না খুশি হতো।

পঞ্চায়েত সভায় প্রসঙ্গটা তুললো তরু মিত্তির। পান চিবোতে চিবোতে

বাবড়ি চুলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে পঞ্চায়েত প্রধান অম্বিকা বাড়ুয্যেকে বললে, খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছ, অম্বিকাদাদা। আমাদের জনার্দনের ছেলে জয়রাম থানার পাইক হয়েছে।

অম্বিকা কিছু বলার আগেই বলে ওঠে নরহরি, গাঁয়ের কে কোথায় চৌকিদার হলো, পাইক হলো তা-ও পঞ্চায়েত সভায় আলোচনার বিষয় নাকি ?

—নিশ্চয়, জবাব দেয় ভরু, ষোল-সতের বছর বয়সের একটা বাপ-মরা ছেলে বাসুদেবগঞ্জ থানার পাইক হয়ে সারা গাঁয়ের মুখ উজ্জল করেছে, এটা সভায় আলোচনার বিষয় হবে না তো কী ? নরহরিদাদার কবিরাজি বটিকা নিয়ে যদি আলোচনা হতে পারে তা'হলে এটা নিয়ে আলোচনা হবে না কেন ?

ব্যাস্, আঁতে ঘা লাগলো নরহরির। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার জুড়ে দিলে। ভুরুর দিকে চোখ পাকিয়ে বললে, কবিরাজি বটিকা নিয়ে কি আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম সেদিন ? শুরু করেছিলে তো তুমি। আর তাতে সায় দিয়েছিল এই পঞ্চায়েত শিরোমণি অম্বিকা। বলো, বলো অম্বিকা, তুমিই বলো।

পঞ্চায়েত প্রধান অম্বিকা কোন কথা না বলে কেবল মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে নরহরির মেজাজ আরও গরম হয়ে ওঠে। ভরুকে ছেড়ে সে এবার অম্বিকাকে নিয়ে পড়ে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে থাকে, না—না, এভাবে চুপ্ করে থেকে জবাব এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমি হচ্ছো গিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের পঞ্চায়েত শিরোমণি। জবাব তোমাকে দিতেই হবে।

নরহরি কবিরাজের আসল ব্যথাটা কোথায় তা' এই পঞ্চায়েত সভার প্রতিটি সদস্যই জানে। পঞ্চায়েত প্রধান না বলে অম্বিকাকে পঞ্চায়েত শিরোমণি বলে সম্বোধনের পেছনে নরহরি কবিরাজের যে কী ধরনের মানসিকতা কাজ করছে তাও তাদের অজানা নয়। গ্রাম্য দলাদলি ছাড়াও এর সঙ্গে জড়িত ছিল স্বার্থের সংঘাত। নরহরি কবিরাজ কিছুতেই অম্বিকার এই পদোন্নতিকে মেনে নিতে পারছিল না। তাই সে যখন-তখন অম্বিকাকে পঞ্চায়েত প্রধান না বলে পঞ্চায়েত শিরোমণি বলে ব্যঙ্গ করতো। অম্বিকার দল এ-নিয়ে বেশ কয়েকবার ফুঁসেও উঠেছিল, কিন্তু অম্বিকা নিজেই তাদের শান্ত করেছিল বলে-কয়ে। বলেছিল, বেশ তো, এ-নিয়ে বাদানুবাদ করে কী লাভ ? প্রধানের বদলে শিরোমণি বলে নরহরি যদি ওর গায়ের ঝাল

মেটায় তো মেটাক্। এনিয়ে আমরা মাথা গরম করতে যাই কেন ?

অম্বিকা বাড়ুয্যে বরাবরই কেবল ঠাণ্ডা মেজাজেরই মানুষ নয়, যাকে বলে ব্যাক্ বেঞ্চার, ঠিক তাই। পঞ্চায়েত সভায় তার আসন সামনের সারিতে হলেও সে কথা বলতো কম। কিন্তু যতটুকু বলতো সেটুকু ছিল বাস্তবিকই মূল্যবান। এই জন্যেই সেকালের পঞ্চায়েত প্রধান সর্বেশ্বর চক্রবর্তী অম্বিকা বাড়ুয্যেকে পছন্দ করতো।

পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে সমাজপতি সর্বেশ্বর চক্রবর্তীর দারুণ প্রভাব ছিল। কেবল প্রতিনিধিরাই নয়, ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের প্রায় প্রতিটি মানুষই পছন্দ করতো সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত এই পবিত্র চরিত্রের মানুষটিকে। চাল-চলনে একটু গোঁড়া হলেও সর্বেশ্বর গ্রামের মানুষের মঙ্গল চিন্তায় সময় কাটাতো। তাই গ্রামের মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল তার ওপর। সবাই বলাবলি করতো এই মানুষটি যেদিন চলে যাবে সেদিন কানা হয়ে যাবে ঘুঘুডাঙ্গা গ্রাম।

হলোও ঠিক্ তাই। সমাজপতি সর্বেশ্বর যেদিন পরিণত বয়সে চোখ বুজলো সেদিন গ্রামখানা কেবল কানাই হলো না, গ্রামের প্রতিটি মানুষ শোকে দুঃখে বোবা হয়ে গেল। এমনকি খবর পেয়ে চন্দ্রনারায়ণের মত অত্যাচারী জমিদার পর্যন্ত তার রাজধানী বাহাদুরপুর থেকে লোক পাঠালো সর্বেশ্বরের অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে খোঁজ-খবর করতে।

এর পরেই শুরু হলো সর্বেশ্বরের শূণ্য আসনে বসার জন্যে সাজ-সাজ রব। ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের আকাশে-বাতাসে তখন একটিমাত্র কথা—কে হবে এই গাঁয়ের সমাজপতি ? একদিকে নরহরি কবিরাজ, অন্যদিকে ভরু মিস্তির। বেঁটে খাটো চেহারার নরহরি বরাবরই গ্রাম্য দলাদলিতে ওস্তাদ। চরিত্রও অকলঙ্ক নয় তার, কিন্তু তা' সত্বেও প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করতে অনেকেই নারাজ। গ্রামের একমাত্র কবিরাজ নরহরি। অসুখ-বিসুখে সে-ই একমাত্র ভরসা। তা'ছাড়া নরহরি কাকে কখন কোন্ প্যাঁচে ফেলে নাস্তানাবুদ করবে তার ঠিক্ কি ? কাজেই নরহরি সম্পর্কে চুপ্ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সারা গাঁয়ে নরহরি একমাত্র সমঝে চলে ভরু মিস্তিরকে। মুখে ভরুকে নস্যাৎ করলেও মনে মনে তাকে একটু ভয়ই করে। সর্বেশ্বর বেঁচে থাকতে চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চায়েত সভায় এই দু'জনের মধ্যে প্রায়ই খটামটি লেগে থাকতো। প্রায় সব ব্যাপারেই নরহরি ও ভরু বিপরীত। লম্বা ফর্সা চেহারার ভরু মিস্তির প্রচুর জমিজমার মালিক। গান-বাজনায় দক্ষ এই

মানুষটি গ্রামের উচ্চ-নীচ সবার সঙ্গেই মেশে। বাবড়ি চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে হা-হা করে যেমন হাসে তেমনি মুখের উপর উচিত কথা বলতেও কাউকে ছাড়ে না। বিশেষ করে নরহরিকে তো নয়ই।

নরহরি জানতো তার প্রতিপক্ষ ভক্ত মিত্তির নিজে সমাজপতির আসনের দাবীদার নয়। পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার মানসিকতা তার নেই। তবে দলে যখন সে-ই ভারি তখন সে যাকে চাইবে সেই হবে প্রধান। অবশেষে যখন শোনা গেল ভক্ত মিত্তির অম্বিকা বাড়ুজ্যেকে ঐ আসনে বসাবার তোড়জোড় করছে তখন নরহরি গাঁয়ে প্রচার শুরু করলে যে অম্বিকার মত ভালো মানুষকে দিয়ে পঞ্চায়েতের কাজ চলবে না। এর জন্যে চাই একজন শক্ত-সমর্থ মানুষ। একাজে অম্বিকা একেবারেই অযোগ্য।

যোগ্য হোক্ আর অযোগ্য হোক্ শেষপর্যন্ত গাঁয়ের মানুষের রায় কিন্তু গেল অম্বিকারই দিকে। অম্বিকা বাড়ুয্যেই হলো ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের সমাজপতি। সেই থেকেই নরহরির কাছে অম্বিকা পঞ্চায়েত শিরোমণি।

পঞ্চায়েত সভায় জয়রামের প্রসঙ্গ নরহরির মনঃপুত না হওয়ার প্রধান কারণটি ছিল জয়রামের প্রতি নরহরির অনীহা। দক্ষিণ-চৌকির চৌকিদার রমজান যে একদিন ঐ ছেলেটাকে তার জমির কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভক্তর জমিতে লাগিয়েছিল সেকথা এতদিনেও ভুলতে পারে নি নরহরি। তা ছাড়া, জয়রামের মত একটা চালচুলোহীন ক্ষেতমজুর রাতারাতি থানার পাইকের মত একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল হয়ে অনেকের মত নরহরিরও মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল।

নরহরির কথার জবাবে অম্বিকা শান্ত কণ্ঠে বললে, তা' অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ নরহরি। সেদিন সেই কবিরাজি বটিকার প্রসঙ্গ ঠিক্ তুমি তোল নি। তা' যাই হোক্, গাঁয়ের একটা ছেলে থানার পাইক হয়েছে এটা তো খুবই আনন্দের বিষয়। থানার পাইক বলে কথা। আপদে-বিপদে এই গাঁয়ের মানুষই তো তার সাহায্য পাবে। থানাদার তো বছরেও একবার এদিকে পা দেয় না।

অম্বিকা থামতেই বলে ওঠে ভক্ত মিত্তির, তা' যা বলেছ অম্বিকাদাদা। গাঁয়ে আমরা তো টিঁকে আছি কেবল ভগবানের দয়ায়। তিনি ছাড়া আমাদের দেখার মত আর কে আছে? দেশে তো এখন ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব। আমাদের কথা ভাববার মত সময় কোথায় ঐ ব্যাটাদের? এদিকে জমিদারের সঙ্গেও আমাদের কেবল খাজনার সম্পর্ক। কাজেই গাঁয়ের এই চৌকিদারেরাই

একমাত্র ভরসা। সেই সঙ্গে যদি থানায় একজন পাইককে আমরা পাই তাতে লাভ বৈ ক্ষতি তো কিছু নাই।

—তা' তো বটেই—তা' তো বটেই। একবাক্যে উপস্থিত সবাই সমর্থন করে ভকুকে। নরহরি আর কিছু না বলে চুপ্ করে থাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে জল ঘোলা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জয়রাম যেদিন পাইকের পোশাক পরে একখানা ধারালো সড়কি হাতে প্রথম থানায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো সেদিন কাছে-পিঠের বৌ-ঝিয়েরা অনেকেই আড়াল থেকে দেখছিল তাকে। দেখছিল আর বিস্ময় বোধ করছিল। ষোল-সতেরো 'বছরের ঐ ছেলেটা কিনা থানার পাইক। পাইকের পোশাকে বেশ মানিয়েছে ছেলেটাকে। ঠিক্ যেন চৌকিদার জনার্দনের ছেলেবেলা। সামান্য কিছু তফাৎ ছাড়া চৌকিদার ও পাইকের পোশাকও প্রায় একরকম।

যাবার আগে এলোকেশীর পায়ের ধুলো নিতেই এলোকেশী তার মাথায় হাত রেখে বিড় বিড় করে কি যেন বললে। সেই মুহূর্তে তার চোখ দু'টো সজল হয়ে ওঠে। ধরা গলায় কেবল বললে, সাবধানে থাকিস্ বাবা। সাবধানে চলাফেরা করিস।

দরজার কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছোটবোন তরঙ্গ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল। সেই দিকে তাকিয়ে জয়রাম বলে ওঠে, ওকি তবি, তুই হাসছিস কেন রে?

দাদার প্রশ্নে তরঙ্গর হাসির বেগ আরও বেড়ে ওঠে। কৃত্রিম ধমকের সুরে জয় আবার জিজ্ঞেস করে, আরে মলো যা, হাসছিস কেন বলবি তো? আমি আজ প্রথম কাজে যাচ্ছি, আর তুই হি—হি করে হাসছিস?

এবার জবাব দেয় তরঙ্গ, হাসছি তোমাকে দেখে।

—কেন আমাকে দেখে হাসির কী হয়েছে?

মুখের আঁচল সরিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে তরঙ্গ বললে, এই পোশাকে তোমাকে ঠিক্ সঙের মত লাগছে গো, দাদা।

জয়রাম জানে এটা ওর মনের কথা নয়। জয়রাম সম্পর্কে ও যা ভাবে, বলে তার ঠিক্ উল্টো। দাদার সঙ্গে এভাবে খুনসুটি করাই ওর স্বভাব। এতেই ওর আনন্দ। তাই সে সস্নেহ কণ্ঠে তাড়া দেয় বোনকে, নে যাঃ, আর জ্যাঠামো করতে হবে না। তোর দাদার চেহারাখানা কি খারাপ যে সঙের মত লাগবে?

—না—না, বলে ওঠে তরঙ্গ, তুমি তো দেখতে আমাদের কাত্তিক ঠাকুরের মত গো।

এইসময় বিরক্ত কণ্ঠে মেয়েকে ধমকে ওঠে এলোকেশী, কী হচ্ছে রে তরি? ছেলেটাকে যেতে দে।

মায়ের ধমকে ভারি হয়ে ওঠে মেয়ের মুখ। অভিমান-ভরা কণ্ঠে সে বললে, বা-রে, আমি তোমার আদরের দুলালকে আটকে রেখেছি নাকি? যাও গো পাইকদাদা, এবার দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে রওনা হও। কী জানি, থানায় যেতে দেরি হলে পাইকগিরি যদি আবার ভেস্তে যায়! কথাটা বলেই একটু মুচকি হেসে সেখান থেকে সরে পড়ে তরঙ্গ।

উঠোনে দাঁড়িয়েছিল রমজান। পোশাকপরা জয়রাম তার কাছে এসে দাঁড়াতেই রমজান দু'হাতে তাকে নিজের বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, বাঘের বাচ্চা বাঘ। অবিকল জনার্দনের মত লাগছে। না-রে, ভুল বললাম। বাবের বাচ্চা সিংহ। জনার্দন ছিল গাঁয়ের চৌকিদার, আর তুই থানার পাইক। বলতে গেলে এককাঠি ওপরে। নে চল্‌, আর দেরি করিস না। পা চালিয়ে চল্‌ আমার সঙ্গে।

রমজানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে জয়রাম, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে, চাচা?

—কেন থানায়। তোকে পৌঁছে দিতে। সামান্য হেসে জবাব দেয় রমজান।

বলে ওঠে জয়রাম, না চাচা, তোমার বয়স হয়েছে। তুমি শুধু শুধু আমার সঙ্গে এতটা পথ যাবে কেন? আমি কি বাসুদেবগঞ্জের রাস্তা চিনি না?

—না—না, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রমজান, তা' নয়। আজ প্রথম দিন তুই যাচ্ছিস। তাই—।

—না চাচা, তোমার যাবার দরকার নাই। আমি একাই যেতে পারবো।

একটু সময় চিন্তা করে রমজান আবার বললে, বেশ—বেশ, তবে চল্‌, তোকে বড় সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

সড়কি হাতে হন্‌ হন্‌ করে পথ চলছে জয়রাম। এই পথে সে অনেকবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু আজকের মত এমন এক আশ্চর্য অনুভূতি সে আগে কখনও অনুভব করেনি। পথের পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম, ফসলের ক্ষেত। চাষীরা কাজ করছে ক্ষেতে। ছোট ছোট ছেলেরা হাঁটুজল পুকুরের পাঁকে নেমে মাছ ধরছে। গরু চরাচ্ছে রাখাল বালকেরা। পথ চল্‌তি জয়রামকে দেখে

সকলেই কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে। প্রায় সকলেরই মুখে চোখে একই প্রশ্ন—এ তল্লাটে আবার পাইক কেন? কোন্ গাঁয়ে আবার কী ঘটলো? তা'ছাড়া, এ যে দেখছি একেবারে বাচ্চা পাইক। মুখে তো সবে গোঁফের রেখা ফুটেছে।

মুন্‌শিডাঙ্গার বাঁক ঘুরতেই বিরুপাক্ষর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জয়ের। নরহরি কবিরাজের দল ঘেঁষা বিরুপাক্ষ বলতে গেলে নরহরির চেষ্টাতেই ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের উত্তর চৌকির চৌকিদারী কাজে বহাল হয়েছিল। জয়রামের বাবা জনার্দনের আসনে বিরুপাক্ষ। গ্রামের লোক প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস না পেলেও আড়ালে-আবডালে বিরুপাক্ষের সমালোচনা করে। বলে কিসে আর কিসে। কোথায় চৌকিদার জনার্দন, আর কোথায় এই বিরুপাক্ষ। কিন্তু উপায় নেই, মেনে নিতেই হবে। তদ্বিরের জোর কম নয় নরহরির। মন্বন্তরের পরে সবকিছু স্বাভাবিক হতেই নরহরি সেকালের পঞ্চায়েত প্রধান সর্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে ধরাধরি করে তার এই পেটোয়া লোকটিকে জনার্দনের শূন্য জায়গায় বসিয়েছিল। আর, সর্বেশ্বরের সুপারিশ স্বাভাবিক নিয়মেই মেনে নিয়েছিল বাহাদুরপুরের দেওয়ান।

বেঁটে অথচ শক্ত-সমর্থ পেটাই শরীরের অধিকারী বিরুপাক্ষের সারা মুখে বসন্তের দাগ। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। সামনের গোটা কয়েক দাঁত নেই। নীচের পুরু ঠোঁটখানা খানিকটা ঝুলে পড়েছে। সব মিলিয়ে আসল বয়সের চেয়ে বেশি বলে মনে হয় তাকে।

জয়ের মুখোমুখি হতেই প্রায় লোমহীন ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে বিরুপাক্ষর। পরক্ষণেই একটু শুকনো হেসে বললে, এই যে জয়, থানায় চললে বুঝি?

সলজ্জ হেসে মাথা নেড়ে সায় দেয় জয়রাম। বলতে থাকে বিরুপাক্ষ, তা বাপ্, খেল্ দেখালে বটে একখানা। কী মন্তরে যে নায়েব-দেওয়ানের মত একটা শক্ত মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পাইকগিরি আদায় করলে তা' ভাবলে বিস্ময় মানতে হয়।

বিরুপাক্ষের কথার ধরনে মনটা শক্ত হয়ে ওঠে জয়ের। নিজেকে সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর সুরে বললে, না বিরুখুড়ো। নায়েব-দেওয়ানকে নয়, খোদ্ দেওয়ানজীকে।

বিস্ময়ে এবার বাস্তবিকই চোখ কপালে ওঠে বিরুপাক্ষের। কথাটা বিশ্বাস করতে যেন মন চায় না। দেওয়ান কেষ্ট দত্তর মত মানুষকে কব্জা করে তাকে দিয়ে আপন কাজ বাগিয়ে নেয়া তো একরকম অসাধ্য ব্যাপার।

জয়ের পাইকের কাজ পাওয়ার খবরে সে মনে করেছিল ছেলেটা নির্ঘাৎ নায়েব দেওয়ান মুকুন্দলালকে দিয়ে কাজটা বাগিয়েছে। মুকুন্দলালের যে ধরনের চরিত্র তাতে পয়সা কড়ি কিম্বা অন্যকিছুর বিনিময়ে সে একাজ করে দিতেও পারে। সত্যি বলতে কি, তার নিজের চৌকিদারী পাওয়ার ব্যাপারে ঐ মুকুন্দলালের যে হাত ছিল তা' তো সে নরহরির কাছেই জানতে পেরেছিল। নরহরিই তো মুকুন্দলালের মাধ্যমে সর্বেশ্বর চক্রবর্ত্তির ওপর চাপ্ দিয়ে ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ছেলেটা বলছে কি? একেবারে খোদ্ দেওয়ান কেষ্ট দত্ত? ছেলেটা নির্ঘাৎ জাদু জানে।

বিস্মিত বিরুপাক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটু হাসে জয়। সে জানে এই খবরটা অতি অবশ্য নরহরি কবিরাজের কানে উঠবে এবং পরিণতিতে তার ওপর নরহরির অসন্তোষ বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু তা' সত্ত্বেও নরহরির পক্ষে মনে মনে গুমরে মরা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না। খোদ্ দেওয়ানজীর সঙ্গে যার এত মাখামাখি তাকে অবশ্যই ঘাঁটাতে চাইবে না নরহরি।

কথা বলতে বলতে হাতের সড়কি বার কয়েক মাটিতে ঠুকে খানিকটা ধুলো উড়োয় জয়। সে যেন এই ধুলোর মতই বিরুপাক্ষের মত পরশ্রীকাতর মানুষদের অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পারে। অবশেষে শান্ত কণ্ঠে বললে, আমি এবার চলি বিরুখুড়ো। অনেকটা পথ যেতে হবে।

—হ্যাঁ বাপ্, যাও—যাও। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে বিরুপাক্ষ, থানার পাইকের কাজের বোঝা কাঁধে নিতে চলেছ তুমি। তোমাকে দেরি করিয়ে দেয়া কি উচিত হবে?

জয় আর দাঁড়ায় না। পথের ধুলোয় আর একবার সড়কি ঠুকে ধুলো উড়িয়ে অবশেষে সেটা কাঁধে ফেলে সে আবার পথ চলতে থাকে।

জয়ের মত অল্প বয়সী একটা ছেলেকে পাইকের কাজে বহাল করায় অনেকের মত থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পালও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমান। তাই এ নিয়ে সে একটা কথাও জিজ্ঞেস করে না জয়কে। কেবল উপদেশের সুরে বললে, পাইকের কাজ খুবই দায়িত্বের কাজ। মন দিয়ে কাজ করবে, বুঝলে?

জয় কেবল মাথা নেড়ে সায় দেয়। আর সেদিন থেকেই পাইকের কাজ শুরু হয় জয়রামের।

তিন

মনুষ্য সমাজে যে-কোন দুর্যোগের আবির্ভাব মানেই সমাজের ওপর কঠিন আঘাত। সেই আঘাতের তারতম্যের ওপরই নির্ভর করে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারা। খুব বড় আঘাত এসে পড়লে সমাজ জীবনে ঘটে যায় দারুণ ওলট-পালট। পুরানো মূল্যবোধ ভেঙে চৌচির হয়ে জন্ম দেয় নতুন মূল্যবোধের।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তেমনি এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। এই দুর্যোগ বাংলার সমাজ-জীবনে ঘটালো ভয়ানক পরিবর্তন। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়লো বাংলার মানুষ। তারা দেখেছে না-খেতে-পাওয়া মানুষ একমুঠো খাবারের জন্যে জঘন্যতম কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এই জন্যে সেদিন তারা দায়ী করলে দেশের জমিদার তথা বিদেশী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। ঐ ফিরিঙ্গীগুলোই এখন দেশের আসল রাজা। মিরজাফর তো কেবল নামে নবাব। সে তো ঠুঁটো জগন্নাথ। ভয়ঙ্কর সেই মন্বন্তরের জন্যে তো ঐ বিদেশী ফিরিঙ্গীগুলেই দায়ী। ওরাই তো নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁকে দিয়ে খাজনা আদায়ের নামে বাংলার প্রজাপুঞ্জের ওপর করেছিল অকথ্য অত্যাচার। ওরাই তো সৈন্যবাহিনীকে পুষতে মণ মণ ধান-চাল চড়া দামে কিনে প্রজাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছিল। আর, দেশের জমিদার-কুলও মওকা বুঝে গিয়ে ভিড়েছিল ঐ বিদেশী বণিক ও রেজা খাঁর দলে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া সেদিন বাংলার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার আর কেউ ছিল না। বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও সেদিন হয়ে পড়েছিলেন অসহায়। তাই এক কোটি হতভাগ্য বাঙালীর অকাল মৃত্যু সেদিন তিনিও ঠেকাতে পারেননি।

বিদেশী ফিরিঙ্গীরা দূরের মানুষ। তারা কলকাঠি নাড়ে দূর থেকে। কাছের মানুষ জমিদার। একদিন বাংলার সাধারণ মানুষ এই জমিদারশ্রেণীকে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলেই মনে করতো। ভয়ের সঙ্গে ভক্তিও করতো তাদের। আজ আর তা' নেই। ভয় থাকলেও ভক্তির ছিঁটেফোঁটাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঁয়ের মানুষের কাছে জমিদারও দূরের। কাছের মানুষ গ্রামের চৌকিদার—রাজপ্রতিনিধি। স্বাভাবিক নিয়মে সেই রাজপ্রতিনিধির ওপর থেকেই যখন সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অনেকটাই কমে গেছে তখন থানাদার ও তার চেলা-চামুণ্ডা অর্থাৎ পাইক-বরকন্দাজদের সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধার তো কণামাত্রও আর অবশিষ্ট নেই।

ঘুঘুডাঙা গাঁয়ের দক্ষিণ চৌকির চৌকিদার রমজান আলী স্পষ্টই বুঝতে

পারে সে যেন একটু একটু করে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দুর্বল হয়ে পড়ছে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে রাজপ্রতিনিধি চৌকিদারের সেই প্রীতির বন্ধন। বিষয়টি নিয়ে যতই চিন্তা করে ততই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে রমজান। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই রাজপ্রতিনিধিত্ব ছেড়ে দিতে। কিন্তু ছেড়ে দিলে খাবে কি? বাড়িতে কয়েক গণ্ডা পোষ্য। নিজের যে সামান্য কিছু জমিজমা ছিল তার সঙ্গে চৌকিদারী চাকরাণার নিষ্কর জমিটুকু ছিল বলেই না সে এখনও পরিবার-পরিজনের মুখে দু'বেলা দু'টো ভাত তুলে দিতে পারছে। কাজেই চৌকিদারী ছেড়ে দিলে কোনমতেই চলবে না।

বিষয়টি সম্পর্কে রমজান আলী যতটা স্পর্শকাতর, জয় কিন্তু মোটেই তা' নয়। অবশ্যি তার কারণও আছে। রমজান কেবল গ্রামের চৌকিদারই নয়, সে প্রাচীন। আর, জয় থানার পাইক ও নবীন। রমজান দেখেছে গাঁয়ের চৌকিদারের সম্মান ও প্রতিপত্তি। জয় তা' দেখেনি। সে একালের ছেলে। সেকালের রমজান আলীর মত মানুষের কাছে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের প্রীতির সম্পর্কটুই ছিল মূল্যবান। আর, একালের জয়রামের কাছে গ্রামের মানুষ রাজপ্রতিনিধিকে খানিকটা ভয়ের চোখে দেখলেই যথেষ্ট। প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না জয়রাম। সেকালের প্রশাসন ছিল মিষ্টি-মধুর ঘরোয়া বস্তু, আর একালের কঠোর-কঠিন বাইরের জিনিষ।

বাংলার বুকে বিদেশী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধারালো নখ তখন বেশ ভালোভাবেই বসতে শুরু করেছে। কোম্পানীর নজর একমাত্র বাংলার সম্পদের দিকে। গভর্ণর হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ তখন দেওয়ান। তার চরিত্রও তার পূর্বসূরী নায়েব-নাজিম রেজা খাঁর-ই মত। দেশের মানুষ অনাহারে থাকুক কিম্বা অর্দ্ধাহারে থাকুক তাতে কিছুই যায়-আসে না গঙ্গা গোবিন্দের। তাদের কাছ থেকে জোর করে রাজস্ব আদায় করে হেস্টিংসের মন জোগানোই তার একমাত্র কাজ। দেশের জমিদারকুলের মাধ্যমে সেই কাজ বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন করছিল গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ।

সেদিন সকাল সকাল স্নান-খাওয়া সেরে বাসুদেবগঞ্জ থানায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল জয়রাম। হঠাৎ বাইরে উত্তর চৌকির চৌকিদার বিরুপাক্ষের ত্রস্ত কণ্ঠস্বর, জয়—জয়, বাড়ি আছো নাকি জয়? শিগ্‌গির একবার বাইরে এসো।

জয় তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই বিরুপাক্ষ আচমকা বলে ওঠে, শুয়োর।

—শুয়োর? কিছু বুঝতে না পেরে জয় কেবল কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

বিরুপাক্ষ আবার বললে, বন-শুয়োর।

এতক্ষণে বিষয়টির খানিকটা হৃদয়ঙ্গম হয় জয়ের। গ্রামবাংলার চাষীদের কাছে এ এক বভীষিকা। শত শত বন-শুয়োর দল বেঁধে বন-জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে এসেই নেমে পড়ে চাষীর ক্ষেত খামারে। একালের পঙ্গপাল কিম্বা হাতির পালের মত জমির শস্য নষ্ট করে এরা। শুয়োরের তাণ্ডবে চোখের নিমেষে শত শত বিঘার জমির ফসল তছনছ হয়ে যায়। চাষীর ঘরে ঘরে ওঠে কান্নার রোল। এভাবে জমির শস্য নষ্ট হলে সারা বছর তারা খাবেই-বা কী, আর জমিদারের খাজনাই বা দেবে কেমন করে? কিন্তু এ নিয়ে খোদ জমিদারের তেমন কোন মাথা-ব্যথা নেই। এধরনের বিপদ থেকে চাষীকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাও নেই। থাকার মধ্যে একজন চৌকিদার ও গাঁয়ের যুবকেরা। ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের একমাত্র বাড়তি সুবিধা থানার পাইক জয়রামের সাহায্য।

জিজ্ঞেস করে জয়রাম, কোথায়—কার জমিতে?

জবাবে বিরুপাক্ষ বললে, কারুর একার জমিতে নাকি হে? গোটা বিলের মাঠ জুড়ে একলপ্তে যে কয়েক শ' বিঘা জমি রয়েছে তার পাকা ধান নষ্ট করে ফেলছে বন-শুয়োর।

—আপনি গাঁয়ের ছেলেদের ডাকেন নাই, বিরুখুড়ো?

বিরুপাক্ষের জবাবের জন্যে আর অপেক্ষা করে না জয়রাম। তাড়াতড়ি ঘরে ঢুকে সড়কিটা হাতে নিয়ে বাইরে এসেই আবার বললে, চলেন—চলেন বিরুখুড়ো।

ছুটছে বিরুপাক্ষ, ছুটছে জয়রাম। যেতে যেতে হাঁক দিয়ে ডেকে চলেছে গ্রামের যুবকদের—বিলের মাঠে শুয়োর পড়েছে। শিগগির বেরিয়ে পড়ো সবাই। লাঠি, সড়কি, বল্লম যে যা পারো হাতে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ো। চলো সবাই বিলের মাঠের দিকে। শুয়োর পড়েছে মাঠে—বন-শুয়োর।

হাঁক-ডাক শুরু হলো গ্রামের মধ্যে। বন-শুয়োরের ভয় ডাকাতের ভয়ের চাইতেও বেশি। গ্রামে ডাকাত পড়লে কিছু লোকের ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া, ডাকাতদের নজর প্রধানত গাঁয়ের সম্পদশালী ব্যক্তির বাড়ির দিকে। তাও আবার সোনা-দানা, পয়সা-কড়ি ছাড়া ডাকাতেরা গৃহস্থের অন্য কোন বস্তু

প্রায় ছোঁয় না বললেই চলে। কিন্তু শুয়োরের কাছে ধনী-দরিদ্র বিচার নেই। কমল বনে মত্ত হস্তীর মত পাকা ধানের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ে এই প্রাণীগুলো।

দলবল নিয়ে বিরুপাক্ষ ও পাইক জয়রাম যখন বিলের মাঠে এসে হাজির হয় তার আগেই দক্ষিণ পাড়ার চৌকিদার রমজান আলী তার দলবল নিয়ে শুয়োর তাড়াতে নেমে পড়েছে মাঠে। কিন্তু সেই হিংস্র দাঁতালো শুয়োরের দলের মুখোমুখি দাঁড়ানো খুবই মুশকিল। মুখে বিচিত্র শব্দ করতে করতে শুয়োরের দল তেড়ে আসছিল রমজানদের দিকে। হাতের অস্ত্র চালিয়েও কোন ফল হচ্ছিল না। অবশেষে বিরুপাক্ষ ও জয়রামের দল হৈ—হৈ করে এসে মাঠে নামতেই একটু থম্‌কে দাঁড়ায় শুয়োরগুলো। বিপদের গন্ধ পায় তারা। মানুষে মানুষে ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। মানুষের ব্যূহের মধ্যে আটকে পড়ে সেই হিংস্র পশুগুলো। আত্মরক্ষার তাগিদে তারা হয়ে ওঠে মরীয়া।

মাঠের মধ্যে মানুষে পশুতে লড়াই। মাঠের বাইরে উঁচু আলের ওপরেও দলে দলে মানুষ। তাদের হাতে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টা। বাদ্যযন্ত্রের শব্দে পশুগুলোকে ভয় পাইয়ে দেবার প্রচেষ্টা। গোটা এলাকা জুড়ে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। শুয়োরের মুখের বিচিত্র শব্দ, মানুষের মুখের হাঁক-ডাক, চিৎকার-চেঁচামেচি, আর সেই সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের বেসুরো শব্দে ভারি হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। গাছের পাখী পালায় গাছের ডাল ছেড়ে, কাছাকাছি মেটে বাড়ির বেড়ার আড়াল থেকে চাষী বৌ ছল্‌ ছল্‌ চোখে দেখতে থাকে জমির পাকা ফসল ধ্বংসের হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে সেই লড়াই।

অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয় হিংস্র পশুরদল। প্রাণভয়ে পালাতে থাকে তারা মাঠ ছেড়ে। সামাল-সামাল রব ওঠে মাঠের যোদ্ধাদের মধ্যে। এই সামাল রব কেবলমাত্র মাঠের কাছের বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের উদ্দেশ—বন-শুয়োর মাঠ ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে। সাবধান হও সবাই। শুয়োরের গোঁ। জঙ্গলের দিকে না গিয়ে দু'একটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়তে পারে গৃহস্থের বাড়ির কাছাকাছি। ধারালো দাঁতে সামনে যা পাবে সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে যাবে। এমনকি গৃহপালিত পশুকেও রেহাই দেবে না। কাজেই সাবধান।

দরজা বন্ধ হয় গৃহস্থের গোয়াল ঘরে। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে টেনে নিয়ে,বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চাষী বৌ। কিন্তু এতেও স্বস্তি নেই তার। দুশ্চিন্তায় তার শুক্‌নো মুখ আরও শুকিয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তা ক্ষেতের

ফসলের জন্যে। তার চাইতেও বেশি চিন্তা ছেলেমেয়েগুলোর বাপের জন্যে। সড়কি, বল্লম হাতে থাকলেও যে-কোন সময় দাঁতালো শুয়োরের আক্রমণে লোকটার একটা কিছু ভালো-মন্দ ঘটে গেলে সর্বনাশ। একেবারে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এই অপোগণ্ডগুলোর হাত ধরে।

শেষপর্যন্ত মানুষেরই জয়। লক্ষ-কোটি বছর ধরে এমনি যুদ্ধে মানুষই জিতে আসছে। পরাজিত হতে হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কত জাতের হিংস্রপশু। কিন্তু তারও আগে বোধহয় মানুষই হার মানতো পশুর কাছে। কিন্তু তবুও মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাই তো জীবজগতে মানুষই এই পৃথিবীর অধীশ্বর।

গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেল বন-শুয়োরের দল। মাঠের শস্যক্ষেতে পড়ে রইলো তাদের কিছু সঙ্গী-সাথীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। হাসি ফুটলো ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বীর যোদ্ধাদের মুখে। পেরেছে তারা শুয়োর তাড়াতে। কিন্তু তাতে রক্ষা করতে পেরেছে কি জমির ফসল? বন-শুয়োরের আবির্ভাবে জমির ফসল যতটা নষ্ট হয়েছে তার চাইতে বেশি নষ্ট হয়েছে শুয়োর তাড়াতে গিয়ে জমির মধ্যে মানুষের দাপাদাপিতে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত থানার পাইক জয়রাম একটা আলের ওপর বসে বিশ্রাম করছিল। তার পাশে বসেছিল রমজান আলী ও বিরূপাক্ষ। কারুর মুখেই কথা নেই। সেইমুহূর্তে নিঃশব্দে বসে থেকে বিশ্রামটুকু উপভোগ করছিল তারা।

সহসা সেখানে এসে হাজির হয় গ্রামের একেবারে নীচুবর্ণের একদল মানুষ। রমজান ও বিরূপাক্ষকে পাশ কাটিয়ে তারা এসে দাঁড়ায় জয়রামের একেবারে কাছে। তারপর আভূমি নত হয়ে জয়রামকে প্রণাম জানিয়ে একজন বললে, যদি অনুমতি দেন তা'হলে একটা কথা বলি গো, কত্তা।

চমকে জয়রাম তাকায় লোকগুলোর মুখের দিকে। তাদের গাঁয়েরই লোক। মুখচেনা।

লোকটি আবার বললে, ঐ মরা জানোয়ারগুলোকে আমরা নিয়ে যাবো?

—কেন, কী করবে? জয়রামের বদলে প্রশ্ন করে বিরূপাক্ষ।

লোকটি একটু সময় বিরূপাক্ষর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়রামকে বললে, খাবো গো, কত্তা। একটু ভালো-মন্দ খাবো দু'একটা দিন। গরিব মানুষ আমরা। মাংস তো আর চোখে দেখতে পাই না।

লোকগুলোর ধরণ-ধারন দেখে সেই মুহূর্তে লজ্জা করছিল জয়রামের। ওরা তাকেই দলের পাণ্ডা বলে মনে করছে। তাই বুঝি বিরুপাক্ষ ও রমজানের মত বয়স্ক মানুষকে একরকম উপেক্ষা করে তার অনুমতি প্রার্থনা করছে। আর এর কারণও সম্ভবতঃ তার গায়ের এই পাইকের পোশাক। পাইক বলে কথা। এতো আর গাঁয়ের চৌকিদার নয়। এ হচ্ছে পাইক—থানাদারের একেবারে নিজের লোক।

কথাটা ভাবতে গিয়ে একরকম নিজের অজান্তেই মনটা খুশি হয়ে ওঠে জয়রামের। সে হচ্ছে গিয়ে বাসুদেবগঞ্জ থানার পাইক। চৌকিদারের মত পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না তাকে। এমনকি এলাকার দফাদারের কাছেও না। তার যতকিছু জবাবদিহি একমাত্র থানাদারের কাছে।

এমনি ধরনের ভাবনা-চিন্তা সত্ত্বেও নিজেকে কিন্তু সামলে নেয় জয়রাম। তাড়াতাড়ি রমজানের দিকে তাকিয়ে সে বললে, ও চাচা, এরা মরা শুয়োর-গুলো চাইছে। বলেন তো ওরা নিয়ে যাক্।

জয়রামের কথায় রমজানের বদলে বলে ওঠে বিরুপাক্ষ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিয়ে যাক্। ওগুলো দিয়ে কী হবে? ওরা মুচি-মেথর। ওরাই এগুলোর সদ্ব্যভার করুক। কথার শেষে অনুমতি দিয়ে ঐ মুচি-মেথরদের কৃতার্থ-করার ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকায় বিরুপাক্ষ।

মানুষটা ভারি আহাম্মক তো—বিরুপাক্ষর কথায় বিরক্ত জয়রাম মনে মনে বলে ওঠে। অনুমতি চাইলাম রমজান চাচার। আর মাঝখান থেকে উনি এলেন অনুমতি দিতে!

বিরুপাক্ষর কথার কোন জবাব না দিয়ে জয়রাম আবার তাকায় রমজানের দিকে। বললে, তা'হলে মরা জন্তুগুলো ওদের নিয়ে যেতে বলি, চাচা?

এতক্ষণে খেয়াল হয় বিরুপাক্ষর। বুঝতে পারে থানার পাইক জয়রাম তার অনুমতির কোন দাম দেয় না। তাই সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে গোমড়া মুখে চুপ্ করে থাকে। সামান্য হেসে রমজান জয়রামের দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, যাক না নিয়ে। মানুষগুলো খেয়ে বাঁচুক।

জয়রাম অনুমতি দিতেই আনন্দে হৈ-হৈ করে ওঠে লোকগুলো। একমুহূর্তও আর দেরি না করে তারা নেমে পড়ে মাঠে।

বাড়ির দরজার গোড়ায় ছেলের জন্যে সাগ্রহে দাঁড়িয়েছিল এলোকেশী। মায়ের মন। তাই পুত্রের জন্যে সর্বদাই শঙ্কা। পাশে দাঁড়িয়েছিল তরঙ্গ। ক্লান্ত-শ্রান্ত জয়রাম বাড়ি ঢুকতেই হাসি ফুটে ওঠে এলোকেশীর মুখে। মায়ের

মুখের মিষ্টি হাসিই পুত্রের কল্যাণ কামনার মন্ত্র। তরঙ্গ ভারিক্কি চালে এগিয়ে এসে জয়রামের হাত থেকে সড়কিখানা নিতে নিতে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে, বাব্বাঃ, গোটাকয়েক বন-শুয়োর তাড়াতে এমন চকচকে সড়কি! ডাকাত তাড়াতে তো কামান লাগবে গো।

—তুই চুপ্ কর্ তো। মেয়েকে ধমকে ওঠে এলোকেশী, জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে কেলান্ত ছেলেটা ঘরে ফিরলো। কোথায় একটুকুন পাখার বাতাস করবে। তা' নয়, কেবল মস্করা। নে, পাখা নিয়ে এসে বাতাস কর্ দাদাকে।

মায়ের ধমকানিতে চাপা হাসি হেসে পাখা আনতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তরঙ্গ বলে ওঠে, যা বলেছ, মা। যুদ্ধ তো নয়, লড়াই গো লড়াই। গোটাকয়েক শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে ফিরেছে তোমার বীর পুত্তুর।

ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ঠেস্ দিয়ে বসে জয়রাম। পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা চালাতে চালাতে তরঙ্গ মুচকি হেসে বললে, আচ্ছা দাদা, যুদ্ধে তোমাদিগের জিত হয়েছে তো? নাকি দাঁতালো শুয়োরের ভয়ে মাঠ ছেড়ে সবাই চোঁ—চাঁ দৌড়?

—তুই এবার থামবি, তরি? বলে ওঠে এলোকেশী, ছেলেটার কানের কাছে বক্‌বক্ না করে ওকে একটু নিশ্চিন্দে বিশ্রাম করতে দিবি?

তরঙ্গ আর কিছু না বলে কৃত্রিম গম্ভীর মুখে আরও জোরে জোরে জয়রামকে বাতাস করতে থাকে।

পাইকের কাজ জোটার পরে ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসীদের জন্যে এই শুয়োর তাড়ানোই প্রথম বড় কাজ জয়রামের। কাজেই সে ভেবেছিল থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ এখবর শুনে নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দিয়ে উৎসাহিত করবে। কিন্তু পরের দিন থানায় যেতেই থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে যে কথা শোনালো তাতে দারুণ দমে গেল জয়রাম। মনে মনে বললো, মানুষ এত নীচ হতে পারে!

বাসুদেবগঞ্জ থানা। থানা বলতে পাশাপাশি-খানকয়েক মাটির ঘর। মাথার ছাউনী খড়ের। ঘরগুলোর কোনটা কয়েদখানা, কোনটা ব্যবহার হয় পাইক, বরকন্দাজ ও হরকরাদের ওঠা-বসার জন্যে। কয়েদখানার ঘরটা যেমনি ছোট তেমনি অন্ধকার। ঘরের চালের প্রায় কাছাকাছি একটি মাত্র ছোট ফোঁকড়। ঐ ফোঁকড়টিই কয়েদখানার আলোবাতাসের একমাত্র পথ। একখানা ঘরে থানার নায়েবের দপ্তর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে পাইক-বরকন্দাজ—

হরকরাদের মধ্যে অনেকেই মরে-হেজে গেলেও থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পালের মত পাইক কামু বৈদ্য এখনও টিঁকে আছে। আজও সবাই তাকে আগের মত কামু পাইক বলেই সম্বোধন করে। বলতে গেলে পুণ্ডরীকের দক্ষিণহস্ত এই কামু পাইকই থানার সবচাইতে পুরানো কর্মী। বাকিরা সবাই প্রায় নতুন। এমনকি থানার পুরানো নায়েব গণেশ সরকারও আর বেঁচে নেই। তার জায়গায় এখন নতুন নায়েব পাঁচকড়ি ঘোষ। চেহারায় পাঁচকড়ি গণেশ সরকারের একেবারে বিপরীত। গণেশের ছিল মাথাজোড়া টাক। মাথার চুলের ঘাটতি সে পূরণ করেছিল দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল দিয়ে। পাঁচকড়ির দাড়ি-গোঁফের বালাই কোনকালেই নেই। যাকে বলে মাকুন্দ, সে ঠিক্ তাই। এদিকে মাথার লম্বা চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। ইচ্ছে করলে ঐ চুলে সে অনায়াসেই বিনুনী বাঁধতে পারে। মাঝবয়সী পাঁচকড়ি কাজকর্মে প্রায় গণেশের মতই পটু। খুন ডাকাতি প্রভৃতি কঠিন অপরাধের তদন্তে তার মাথা আশ্চর্য রকমের সাফ। গণেশ সরকারের মত পাঁচকড়িও তার ঘরে মাদুরের ওপর জলচৌকি নিয়ে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে তদন্তের লেখাপড়া করে। গণেশের মত তারও চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে কাগজপত্র, মাটির দোয়াত আর পাখির পালকের লম্বা কলম। তবে গণেশ সরকারের মত ক্লান্তি বোধ করলে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে নিমীলিত চোখে পালকের কলমের উল্টো দিক্ দিয়ে নিজের কানে সুড়সুড়ি দেবার অভ্যেস নেই পাঁচকড়ির। তার বদলে কানের ভাঁজে কলম গুঁজে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে কুম্ভকর্ণের মত সে নাক ডাকতে থাকে। এমনিতে শান্ত প্রকৃতির মানুষ পাঁচকড়িকে এই সময় কেউ বিরক্ত করলে দারুণ ক্ষেপে ওঠে! এমনকি থানাদার পুণ্ডরীক পালও এইসময় তাকে বিরক্ত করে না। কেউ কিছু বললে হেসে জবাব দেয়, থাক্ না এখন। বেচারা ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। হয়তো আবার সারাটা রাতই প্রদীপ জ্বেলে লেখাপড়া করবে। গণেশ সরকার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতো চার বেহারার পাল্কীতে চেপে। পাঁচকড়ির বয়স কিছু কম বলেই হয়তো সে পাল্কীর বদলে ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করে। তাই থানার সামনে সর্বদাই বাঁধা থাকে দুটো ঘোড়া—বড়টা খোদ থানাদার পুণ্ডরীকের, আর ছোটটা পাঁচকড়ির।

জয়রাম থানায় ঢুকে হাতের লম্বা সড়কিটা একপাশে রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই পাইক কামু বৈদ্য বলে ওঠে, এত দেরি করে এলি? বেলা পানে তাকিয়ে দেখ তো।

লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, হ্যাঁ খুড়ো, বড়ই দেরি হয়ে গেছে আজ। আসলে ব্যাপার কি জানো খুড়ো, কাল সারাটা দিন দেহখানার ওপর দিয়ে বড়ই ধকল গেছে। তাই আজ সকালে বিছানা ছাড়তেই প্রায় একপ্রহর।

কামু পাইক প্রবীণ মানুষ। সেই সুবাদে থানার প্রত্যেকেই তাকে খানিকটা সমীহ করে। বিশেষ করে জয়রামের বাপ জনার্দনের আমলের মানুষ সে। তাই জয়রামও বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে কামুকে।

কামু বললে, হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। তোদের ঘুঘুডাঙ্গার ক্ষেতে নাকি শুয়োর পড়েছিল কাল।

—হ্যাঁ খুড়ো, বলতে থাকে জয়, দু'দশটা নয়, মস্তবড় একপাল আর সবগুলোই প্রায় ডাগড়া দাঁতালো। মাত্র আট-দশটা মারতে পেরেছি। বাকিগুলো সব পালিয়ে গেল জঙ্গলে।

জয় থামতেই কামু বললে, সঠিক জানিনা, তবে এই ব্যাপারে কিছু বলতেই বোধহয় পালমশাই তোর তালাস করছিল।

পালমশাই মানে থানাদার পুণ্ডরীক পাল। কামুর কথায় মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে জয়ের। মনে মনে ভাবে, তার এই শুয়োর তাড়ানোর কাজে খুশি হয়ে তাকে বাহবা দিতেই বোধহয় পালমশাই তাকে খুঁজেছিল। তাই আর দেরি না করে জয় এসে হাজির হয় থানাদারের ঘরে।

নিজের ঘরে লম্বা ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিল পুণ্ডরীকাক্ষ। তার শরীরের সেই শক্ত বাঁধুনি ইদানীং অনেকটাই শিথিল। মাথার চুল অধিকাংশই সাদা। চোখের দৃষ্টিও অনেকটা শান্ত। আগেকার মতই তার নাকের নীচের অংশটাকে ঢেকে রেখেছে ঝাঁটার মত একজোড়া গোঁফ। তবে তার অধিকাংশই সাদা। গলায় কণ্ঠির মালা আর নাকের ওপর রসকলিটি আগের মতই আছে। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রসকলির দৈর্ঘ যেন খানিকটা বেড়েছে। তাছাড়া, থেকে থেকে 'হরেকৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারণ করার অভ্যেসটিও অটুট।

ধুতির ওপর জরি লাগানো থানাদারের লাল কুর্তা গায়ে চাপিয়ে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে একটা লম্বা তুলোট কাগজের লেখা পড়ছিল পুণ্ডরীক। পাশে একখানা মস্তবড় পাখা হাতে দাঁড়িয়ে তাকে হাওয়া করছিল থানার যুবক হরকরা ছিদাম গায়েন। জয়রামের পায়ের শব্দে পুণ্ডরীক চোখ তুলে তাকায় তার দিকে। তারপর হাতের কাগজটা দু'হাতে মুড়তে মুড়তে জয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, হরেকৃষ্ণ। বুঝলে হে ছোকরা, ভালো কাজ করে

শিরোপা পাবার দিনকাল আর নাই। কোম্পানীর রাজত্বে এখন সবকিছুই উল্টা।

জয়রাম কিছু বুঝতে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে পুণ্ডরীকের মুখের দিকে। বলতে থাকে পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ। এই তোমার কথাই ধরো। কাল লোকজন জড়ো করে শুয়োর তাড়িয়ে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করলে, আর আজই কিনা তোমার নামে অভিযোগ।

—অভিযোগ? একেবারে আকাশ থেকে পড়ে জয়রাম।

—হ্যাঁ অভিযোগ, জবাব দেয় পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ। তবে আমার এখানে নয়, বাহাদুরপুরের জমিদার কাছারিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে তুমি নাকি শুয়োর তাড়াবার অছিলায় ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের কোন কোন লোকের জমির ফসল ইচ্ছে করে নষ্ট করেছো।

—সেকি? বিস্ময়ে প্রায় বোবা হয়ে যায় জয়। মানুষ এতটা নীচে নামতে পারে? কিন্তু তার বিরুদ্ধে ঘুঘুডাঙ্গার কে এমন অভিযোগ করলো? কে হতে পারে? গাঁয়ের কারুর সঙ্গেই তো তার অসদ্ভাব নেই। তবে হ্যাঁ, নরহরি কবিরাজ লোকটি তেমন সুবিধের নয়। তবে তারই দলের লোক উত্তর চৌকির চৌকিদার বিরুখুড়ো নিজেই তো দলের সঙ্গে ছিল। তা'ছাড়া ছিল রমজান চাচা ও গাঁয়ের অন্য মানুষ।

জয়রামকে চুপ্ করে থাকতে দেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে পুণ্ডরীক আবার বললে, হরেকৃষ্ণ। শোন জয়, দিনকাল মোটেই ভালো না। তোমার বয়স অল্প। তাই কারুর উপকার করতে গেলেও বেশ ভেবে-চিন্তে করবে। যাক্‌গে, চিন্তা করো না। আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে নায়েব-দেওয়ান মুকুন্দলাল। তার কাছেই নাকি গাঁয়ের কেউ এসে অভিযোগ করেছে। আমি বলে দিয়েছি, এসব একেবারেই মিথ্যা। সত্যিই যদি এমন কিছু ঘটতো তা'হলে গাঁয়ের চৌকিদার দু'জনের মধ্যে কেউ কিম্বা খোদ্ পঞ্চায়েত প্রধান অম্বিকা বাড়ুয্যে নিশ্চয়ই চুপ্ করে থাকতো না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে ওঠে জয়রামের। থানাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাইক-বরকন্দাজদের ঘরের দাওয়ায় চুপ্ করে বসে থাকে। পুণ্ডরীকের ওপর কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে ওঠে তার। পুণ্ডরীক তাকে স্নেহ করে। তাই তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সে বিশ্বাস করেনি।

জয়রামকে উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে বরকন্দাজ বদরুদ্দীন এগিয়ে এসে তার ঘাড়ে হাত রাখে। জয় চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকাতেই বদরুদ্দীন একটু হেসে বললে, এত অল্প ত মন খারাপ করতে নাই

যে, জয়। বয়স কম বলেই মনে তোর দাগা লেগেছে। আরে বাপু, গাঁয়ের চৌকিদারই বলো, আর থানার পাইক-বরকন্দাজ এমনকি খোদ্ থানাদারই বলো, আমাদের নামে এসব ঘটনা তো হতেই পারে। যার স্বার্থে ঘা লাগবে সে-ই এমন অভিযোগ করবে। তাই বলে এ নিয়ে মাথা ঘামালে কি চলে? নে—নে, মন খারাপ করিস্ না। চল্, কামুদাদার কাছে যাই। কামুদাদা তো তোদের গাঁয়ের প্রতিটি লোকের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে-ই বলতে পারবে কে সেই লোক যে নাকি তোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছে। নে—ওঠ্ এবার।

উঠে দাঁড়ায় জয়। মনে মনে বলে, যা হবার তা' তো হয়েছে। এখন আর এসব জেনে কী হবে?

চার

জয়রাম পাইকের কাজ পাওয়ার পর থেকে এলোকেশীর সংসারের হাল খানিকটা ফিরেছে। এখন আর তাকে অন্যের বাড়ির কাজ করতে হয় না। হয় না, ধান ভানতে, চিঁড়ে কুটতে কিম্বা তুলো পিঁজতে। নিজের সংসারের পেছনেই এখন তার দিন কাটে। জয়রাম পাইকের কাজের বাবদ জমিদারের কাছ থেকে যে জমি পেয়েছে তার ফসলেই এই তিনটি প্রাণীর খাওয়াপরা চলে যায় কোনমতে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে জয়রাম তার নিজের বিরুদ্ধে জমিদার কাছারিতে সেই অভিযোগের কথা বাড়ির কাউকে না বললেও একদিন কথায় কথায় সখেদে বলে ফেলেছিল রমজানকে। বলেছিল, না চাচা, গাঁয়ের আর কোন ব্যাপারেই আমি থাকবো না। ভালো করতে গেলে লোকে যদি মন্দ ভাবে তা'হলে ভালো-মন্দ কিছু না করাই তো ভালো। তাতে আর যা হোক্ কেউ তো কাছারিতে গিয়ে নালিশ করবে না।

জয়রামের কথায় একটু ম্লান হেসে রমজান বললে, দুঃখ পেয়েছিস, নারে?

রমজানের কথার ধরনে জয়রাম বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, জমিদার কাছারিতে আমার নামে নালিশের কথা শুনেছ নাকি, চাচা?

তেমনি ম্লান হেসে জবাব দেয় রমজান, শুনবো না কেন? সবই কানে আসে। তুই বুঝি ভেবেছিস তুই না বললে আমি জানতে পারি না? আরে বাপু, সবই জানতে পারি আমি।

—কিন্তু কৈ, তুমি তো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো নাই, চাচা।

—তুই যখন বলিস নাই তখন আর নিজে থেকে জিজ্ঞেস করতে যাই কেন? আজ বললি বলেই বললাম।

কথাটা বলেই একটু সময় চুপ্ করে থাকে রমজান। তারপর আবার বলতে থাকে, শোন জয়, এসব নিয়ে মন খারাপ করে কোন লাভ নাই। দেশ-গাঁয়ে হালচাল বদলে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি গাঁয়ের একজনের উন্নতিতে গাঁশুদ্ধ সবাই খুশি হতো। এখন বাইরে সবাই খুশির ভাব দেখালেও ভেতরে জলেপুড়ে মরে। এই যে তুই থানার পাইক হয়েছিস, এই যে তোর নিজের একটুকরো জমি হয়েছে এতে কি ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের সবাই খুশি হয়েছে ভেবেছিস? মোটেই না। সারাজীবন তুই পরের জমিতে খাটাখাটানি করলেই অনেকে খুশি হতো। এই জন্যেই এত শ্রম করে ক্ষেত থেকে শুয়োর তাড়ালেও তোর নামে নালিশ।

রমজান থামতেই বলে ওঠে জয়রাম, তাই তো ভেবেছি ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের কোন ব্যাপারেই আর থাকবো না।

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রমজান বললে, তুই অবশ্য তা' পারিস। তুই তো আর আমার মত গাঁয়ের চৌকিদার নোস্। তুই থানার পাইক। গাঁয়ের দায়িত্বও তোর ওপর নয়। পঞ্চায়েতের কাছে তোকে জবাবদিহিও করতে হবে না। তবে তাতেও কি তুই রেহাই পাবি? অন্য কোন গাঁয়ে পাইকের কাজ করতে গিয়েও তো তোর নামে নালিশ হতে পারে। যাক্‌গে ওসব। সোদ্দা কথা নিজের ইমান নিজের কাছে। ইমান বজায় রেখে কাজ করে যবি। তাতে যে যা বলে বলুক।

গ্রীষ্মের দুপুর। আগের দিন রাতে সামান্য জ্বর হয়েছিল বলে জয়রাম থানায় যায়নি। যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যেতে দেয়নি এলোকেশী। বলেছিল, দু'দিন একটুকুন বেশ্রাম নে। শরীলটা একটু ভালো হোক্ তারপর যাস্। আরে বাপু কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

জবাবে বলেছিল জয়রাম, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, মা। না গেলে থানাদার পুণ্ডরীক পাল বড়ই গালমন্দ করে। সেদিন আমাদের তিনু হালদার থানায় আসেনি। পরের দিন পালমশাই তাকে এমন বকাঝকা করলে যে বেচারা তিনু কেঁদেই ফেললো।

—বলিস কিরে! বলে উঠেছিল এলোকেশী, বুড়ো বয়সে মনিষ্যিটার স্বভাব-চরিত্তির পাল্টে গেছে নাকি? তোর বাপের আমলেও তো ঐ লোকটাই ছিল থানাদার। তখন তো শুনতাম লোকটা নাকি খারাপ ছিল না।

জয়রাম বলেছিল, তা' জানি না। তবে আজকাল কাজে কেউ কামাই করলে বড়ই চটে যায়।

—তাই বলে জ্বর-জারি নিয়েও কাজে যেতে হবে ?

—না মা, বলেছিল জয়রাম, তেমন বেশি জ্বর তো হয় নাই। একটু গা-গরম কেবল।

—আরে বাপু, অল্পতে সাবধান হলে আর বেড়ে ওঠার ভয় থাকে না। কথা শোন আমার। দু'টো দিন বেশ্রাম কর।

—কিন্তু মা—।

ইদানীং এলোকেশীর নিজের স্বভাবেও খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। অল্পতেই বিরক্ত হয়। তাই ছেলের কথায় কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে জয়ের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে যেতে বলেছিল, কথা যখন শুনবি না তখন যা ইচ্ছা কর্। আমি তো কেবল সারাটা জেবন চেঁচিয়েই গেলাম। কেউ শোনে না আমার কথা। বেঁচে থাকতে তোর বাপও শোনেনি, তুইও শুনবি না। চৌকিদারীর কাজে দেহপাত করে শেষমেস মনিষ্যিটা না খেতে পেয়ে মরলো, আর তুইও পাইকের কাজে দেহপাত করতে উঠেপড়ে লেগেছিস।

জয়রাম বুঝতে পারে এলোকেশী ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে। পরিণামে হয়তো আজ সারাদিন জলটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করবে না। তাই সে মত পাল্টে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, বেশ তো, যখন বলছো তখন না হয় থানায় যাবোই না আজ।

ঘরের দাওয়ায় একখানা মাদুর বিছিয়ে পরনের ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে পড়েছিল জয়রাম। সামান্য জ্বর, তবুও ভাত বন্ধ। একটু আগে এলোকেশী ছেলেকে খাওয়াবে বলে এক ধামা মুড়ি নিয়ে এসেছিল। জয় মাত্র দু'মুঠো খেয়ে বিকৃত মুখে বলেছিল, বড়ই বিস্বাদ লাগছে। খাবো না আর। অনেক পীড়াপীড়ি করেও ছেলেকে আর খাওয়াতে না পেরে শেষে মুড়ির ধামা নিয়ে ফিরে গিয়েছিল এলোকেশী।

উঠোনের ঝাঁকড়া বকুল গাছের নীচে তরঙ্গর ব্রতের আসন। পুণ্য পুকুর ব্রত। সারাটা বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত করে আসছে সে। গাঁয়ের কুমারী মেয়েরা এই ব্রতের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি বর্ষার আগমন কামনা করে। একহাত লম্বা একহাত চওড়া একটা পুকুর কাটা হয়েছে উঠোনে। পুকুরের পাড়ে লাগানো হয়েছে ছোট ছোট কলাগাছ ও হলুদগাছ। ব্রতের ঝক্কি তো কম নয়। গোবরজল দিয়ে পুকুর পাড় নিকোতে হয়েছে তরঙ্গকে। বৈশাখের

প্রখর তাপে শুকিয়ে ওঠা পুকুরে নতুন করে জল ঢালতে হয়েছে। অবশেষে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে একখানা ডুরে শাড়ি পরে দশ বছরের তরঙ্গ পুকুরের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে হয়ে বসে একটা ফুল দিয়ে পুকুরের জল নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে ব্রতকথা—

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা
কে যায় গো দুপুরবেলা
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী······

ব্রতকথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় তরঙ্গ। দাওয়ায় শুয়ে বোনের ব্রতকথা শুনছিল জয়রাম। তরঙ্গ থেমে যেতেই জয়রাম চোখ মেলে তাকায়। ওাক, ব্রতকথা ভুলে তরঙ্গ আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে? জয়রাম বোনকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, কিন্তু তার আগেই চেঁচিয়ে ওঠে তরঙ্গ, দাদা—দাদা, ওদিকে এত ধোঁয়া কীসের?

—ধোঁয়া! ধড়মড় করে উঠে বসে জয়রাম। গ্রামাঞ্চলে এই চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে এমনি ধোঁয়ার অর্থ একটাই—ঘরে আগুন লাগা।

উঠোনে এসে দাঁড়ায় জয়রাম। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে আকাশের সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, তরিরে, কাদের যেন কপাল পুড়ছে। হয় মুসলমান পাড়ায়, নয় তো কুমোর পাড়ায়। কথার শেষে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না জয়রাম। গায়ের ধুতির খুঁট কোমরে জড়িয়ে বাইরের দরজা দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে যায় সেই ধোঁয়া লক্ষ্য করে।

হতভম্ব তরঙ্গ চিৎকার করে বারণ করে জয়কে, যেওনা—যেওনা দাদা। তোমার জ্বর। যেও না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? যেতে যেতে জয়রাম ঘাড় ফিরিয়ে কেবল বললে, মাকে বলিস, তরি। আমি আগুন নেভাতে চললাম।

অনুমান মিথ্যে নয় জয়ের। কুমোর পাড়াতেই আগুন লেগেছে, একটা দু'টো ঘর নয়, প্রায় গোটা পাড়াতেই ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে সেই সর্বনাশা আগুন।

জয়রাম সেখানে উপস্থিত হবার আগেই গাঁয়ের যুবকেরা এসে কাজে লেগে পড়েছে। জলের বড়ই অভাব। নদী অনেকটা দূরে। কাছে-পিঠের পুকুর প্রায় জলশূন্য। কাজেই বাধ্য হয়ে সেই পাঁকশুদ্ধ জল মাটির কলসী ভরে হাতে হাতে নিয়ে এসে আগুনে ঢালা হচ্ছে। আগুনের বিস্তৃতি বন্ধ করতে বাঁশ দিয়ে

পিটিয়ে আধপোড়া খড়ের চাল নামিয়ে ফেলা হচ্ছে নীচে। গোটা এলাকা জুড়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। চিংকার চেঁচামেচি। আগুনের তাপে খুঁটির বাঁশ ফট্‌ ফট্‌ করে ফাটছে। ধোঁয়ায় ধোয়াময় চারিদিক। পাড়ার বাসিন্দা স্ত্রীলোক ও শিশুরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে হায়হায় করছে। অসহায় চোখে আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে নিজেদের সর্বস্ব পুড়ে যেতে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের। হাউ-হাউ করে কাঁদছে কেউ। কেউ বা সব হারানোর দুঃখে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভয় পেয়ে তারস্বরে চিংকার করছে কাকের দল। একজন মাঝ বয়সী লোক তার জীবিকার একমাত্র বস্তু কাঠের চাক্‌খানা আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে হাত-পা পুড়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। ' দু'জন যুবক তাড়াতাড়ি পুকুর থেকে ঠাণ্ডা পাঁকমাটি তুলে এনে লোকটির পোড়া জায়গায় প্রলেপ দিচ্ছে। একখানা বাঁশ হাতে জয়রাম খড়ের চাল টেনে নামাতে ব্যস্ত। একটু দূরে আর একখানা বাঁশ হাতে দক্ষিণ চৌকির চৌকিদার রমজান। একসময় রমজান চিংকার করে সাবধান করে জয়রামকে, হুঁশিয়ার, আগুনের অত কাছে যাস্‌ না, জয়। খড়ের চালে বাঁশের ঘা মারতে মারতে তেমনি চেঁচিয়ে জবাব দেয় জয়রাম, ঠিক্‌ আছে চাচা। তোমার বয়স হয়েছে। তুমি এবার সরে যাও, চাচা। আমরা যা করার করছি।

বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রমজান। কিন্তু তবুও সরে গিয়ে বিশ্রাম করতে মন চাইছিল না তার। অতীতের মানসিকতা সে এখনও পরিহার করতে পারেনি। গাঁয়ের চৌকিদার সে—একমাত্র রাজপ্রতিনিধি। এমন দৈব-দুর্বিপাকে গাঁয়ের মানুষের সাহায্যে তাকেই তো এগিয়ে আসতে হবে আগে। দেহের সবটুকু শক্তি নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে এদের মঙ্গলের জন্যে। একালের উত্তর চৌকির চৌকিদার বিরুপাক্ষর মত একবার মাত্র এসে মুখ দেখিয়ে সরে পড়লে রমজানের চলবে না।

হঠাৎ পেছনে কান্নার রোল। জয়রাম ঘাড় ফিরিয়ে দেখে এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে কেবল বলে চলেছে, আমার কালী—আমার কালী। ওরে তোরা কে আছিস গো, আমার কালীকে বাঁচা। গোয়ালঘরে বাঁধা রয়েছে গো আমার কালী।

বৃদ্ধার কথায় সেইমুহূর্তে কেউ কান দিচ্ছে না। ততক্ষণে বৃদ্ধার গোয়াল-ঘরের চালে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

হঠাৎ সেই বৃদ্ধা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেই আগুনের দিকে ছুটে যেতেই কয়েকটি যুবক জোর করে তাকে টেনে ধরে ধমকে বলে ওঠে, ওকি দিদিমা,

পুড়ে মরতে চাও নাকি ? শিগ্‌গির সরে যাও এখান থেকে।

সত্তর-আশির কোঠায় বৃদ্ধার বয়স। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে দেহটা। মুখের চামড়ায় শত-সহস্র ভাঁজ। দাঁত নেই একটিও। পরনের ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। ফোঁক্‌লা মুখে কাঁদতে কাঁদতে অসহায় কণ্ঠে সে বলতে থাকে, ওরে, ও শত্তুরেরা, তোরা আমাকে ছাড়—ছেড়ে দে। আমার কালী ঐ ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছে। আমায় ডাকছে। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আমাকে।

—কী করে ঐ আগুনের মধ্যে যাবো দিদিমা ? আর একটি যুবক ধমকে ওঠে বুড়িকে, গিয়ে মরবো নাকি ?

—তবে আমাকে যেতে দে দাদা, অনুনয়ের সুরে বলতে থাকে বৃদ্ধা, মরি তো আমার কালীর সঙ্গেই মরবো। দে দাদা, যেতে দে।

বৃদ্ধার কান্নায় মনটা যেন কেমন করে ওঠে জয়রামের। যুবকদের দিকে তাকিয়ে যে চেঁচিয়ে ওঠে, তোরা ধরে রাখ্‌ দিদিমাকে। যেতে দিস না আগুনের মধ্যে। আমি আসছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বাঁশখানা ফেলে দিয়ে জয়রাম দৌড়ে যায় পুকুরের দিকে। পাড় বেয়ে তরতর করে, নেমে গিয়ে পুকুরের সেই কাদাগোলা জলে একটা ডুব দিয়ে আবার দৌড়ে ফিরে আসে। বিস্মিত রমজান কিছু জিজ্ঞেস করতে যায়, কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে বুড়ির সেই গোয়াল ঘরে প্রবেশ করে জয়রাম।

আতঙ্কে গলা শুকিয়ে ওঠে রমজানের। এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে পড়তে থাকে ঢেঁকির পাড়। চিৎকার করে ওঠে সে, বেরিয়ে আয়—বেরিয়ে আয় জয়। এখনই খড়ের চাল ভেঙে পড়বে।

অবশেষে একসময় টলতে টলতে বেরিয়ে আসে জয়রাম। ধোঁয়ায় প্রায় শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল তার। দড়ি ধরে গরুটাকে টানতে টানতে বাইরে এনেই সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ি তার আদরের কালীর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে জয়রামের অচৈতন্য দেহটা।

গায়ে জ্বর নিয়ে আগুনের সঙ্গে লড়াই। তার ওপর এঁদো পুকুরের জলে স্নান। সবশেষে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার মত অবস্থা এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। শরীরের ওপর এমনি ধকলের জের বেশ কয়েকদিন ধরে চললো জয়রামের। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলে না কয়েকটা দিন। রমজান প্রতিদিন আসে ছেলেটার

খবর নিতে। অবশেষে একদিন এসে হাজির হয় থানার হরকরা ছিদাম গায়েন। মাঝবয়সী ছিদামের চেহারা শুকনো প্যাঁকাটির মত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়। থানাদার পুণ্ডরীক তার এই হরকরাটিকে মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করে 'চৈতের কই' বলে ডাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাঁয়ের ডোবা-পুকুরে জল থাকে না। তখন জিওল মাছের মধ্যে কই মাছের দুর্দশাই হয় সবচাইতে বেশি। অল্প জলে ঠিকমত ছোটাছুটি করতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাথার আকৃতি ঠিকই থাকে, কিন্তু শুকিয়ে ওঠে দেহটা।

পুণ্ডরীক পালের 'চৈতের কই' ছিদামকে ডেকে দাওয়ায় বসায় জয়রাম। সবে আগের দিন অন্নপথ্য করেছে সে। দুর্বলতা কাটেনি তখনও। ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে জয়রাম, বলো ছিদামদাদা, থানার খবরাখবর বলো।

—আর খবরাখবর! মুখে-চোখে একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলতে থাকে ছিদাম, থানাদার পালমশাই খুব গরম হয়ে উঠেছে।

ছিদামের কথায় ভুরু কুঁচকে ওঠে জয়রামের। সেই মুহূর্তে তার মনে হয় তার নিজের থানায় অনুপস্থিতির জন্যেই বোধহয় পুণ্ডরীক পাল খাপ্পা হয়ে উঠেছে। তাই সে বললে, কী করবো বলো, ছিদামদাদা। শরীরটা এখনও দুর্বল। বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছি। নইলে এভাবে ঘরে বসে থাকতে কার ভালো লাগে, বলো? পালমশাইকে বলো, দু'এক দিনের মধ্যেই আমি থানায় যাবো।

জয়রাম থামতেই বলে ওঠে ছিদাম, আরে না—না, তোমার জন্যে নয় গো। তুমি যে বিছানায় পড়ে আছো তা' তো পালমশাই জানে। তাই তো আজ আমাকে ডেকে বললে, ছিদাম, ছেলেটা অসুখে ভুগছে। একবার খবর নে। আমি তো তাই এলাম তোমার খবর নিতে।

ইতিমধ্যে একহাত ঘোমটা টেনে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে এলোকেশী। সঙ্গে তরঙ্গ। এলোকেশীর একহাতে একখানা ছোট্ট রেকাবিতে খানকয়েক বাতাসা, অন্য হাতে একগ্লাশ জল—অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা। আর তরঙ্গকে এলোকেশী সঙ্গে এনেছে ছিদামের সঙ্গে কথা বলার সুবিধার জন্যে। পরপুরুষের সঙ্গে তো সোজাসুজি কথা বলা চলে না।

এলোকেশী এগিয়ে এসে বাতাসার থালা ও জলের গ্লাশ ছিদামের সামনে নামিয়ে রাখতেই ছিদাম একটু ঘুরে বসে বলে ওঠে, পেন্নাম হই গো মা জননী। আমি এয়েছি থানাদার পালমশাইয়ের হুকুমে আপনার ছেলের খবর নিতে।

ঘোমটার আড়াল থেকে ছিদামকে উদ্দেশ করে এলোকেশী তরঙ্গকে বললে,

ও তরি, ওনাকে বল্ তোর দাদা আর একটু সুস্থ হলেই থানার কাজে যাবে। উনি যেন পালমশাইকে বলেন ছেলেটার ওপর রাগ না করতে।

এধরনের কথোপকথনে তৃতীয় ব্যক্তি তরঙ্গ কেবল উপলক্ষ্য। এলোকেশীর চাপা কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শুনতে পায় ছিদাম। শুনতে পাওয়ার মত কণ্ঠেই কথাটা বলে এলোকেশী।

এলোকেশী থামতেই জবাব দেয় ছিদাম, না গো মা জননী। পালমশাই আপনার ছেলের ওপর রাগ করে নাই। আপনার ছেলে সেদিন নিজের জেবন বেপম্ন করে যে কাজ করেছে তাতে পালমশাই খুব খুশি।

—ও তরঙ্গ, তেমনি চাপা কণ্ঠে বলে চলে এলোকেশী, ওনাকে বল্, তোর দাদার শরীল তো এখনও দুব্বল। ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে পালমশাই যেন ওকে ভারি কাজকম্মে না লাগান।

জব'ব দেয় ছিদাম, আপনি চিন্তা করবেন না গো মা জননী। আমরা যখন আছি তখন আপনার ছেলের এতটুকুন কষ্টও হবে না।

তরঙ্গকে নিয়ে এলোকেশী সেখান থেকে সরে যেতেই জয়রাম ঘনিষ্ঠস্বরে আবার জিজ্ঞেস করে, তা'হলে পালমশাই শুধু শুধু গরম হয়ে উঠলো কেন, দাদা?

—শুধু শুধু? বিস্মিত কণ্ঠস্বর ছিদামের, শুধু শুধু হবে কেন গো? মানী লোকের যদি মান না থাকে তবে সে গরম হবে না? থানাদার বলে কথা! সেই থানাদারকে বাহাদুরপুরের কাছারিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যদি অবমান করে তা'হলে কি সে ঠাণ্ডা থাকতে পারে?

—কেন, কী হয়েছে? কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে জয়রাম, কে তাকে অপমান করলে?

—কে আবার? খোদ্ দেওয়ান কেষ্ট দত্ত, বলতে থাকে ছিদাম, দেশ-গাঁয়ে কোথায় ঠগী নেই, বলো? ফি মাসেই তো ঠগীর হাতে দু'দশটা মানুষ খুন হয়। এ তো আর আজ নতুন নয়। জন্ম থেকেই তো এসব দেখছি শুনছি। এই নিয়ে দেওয়ান মশাই নাকি আমাদিগের পালমশাইকে কড়া কথা শুনিয়েছে। আর ফিরে এসে সেই থেকেই পালমশাই খুব গরম। আমাদের ওপর হুকুম ঠগীর খবর এনে দিতে হবে। এবার বলো তো দাদা, ঠগীর দেখা পাই কোথায়?

বাতাসা-জল খেয়ে একসময় উঠে পড়ে ছিদাম। যাবার আগে সে জয়রামকে আবার আশ্বাস দেয় যে থানায় ফিরে গিয়ে জয়রামের অসুখের কথা সে

সবিস্তারে বর্ণনা করবে পালমশায়ের কাছে।

জয়রাম যেদিন আবার থানায় যাতায়াত শুরু করলে তার দিন কয়েক পরেই থানাদার পুণ্ডরীক পাল থানার পাইক-বরকন্দাজদের জানিয়ে দিলে যে সেদিন রাতে কারুরই আর বাড়ি ফেরা হবে না। বিশেষ একটা কাজে সেদিন সবাইকেই উপস্থিত থাকতে হবে।

কী সেই বিশেষ কাজ? এই মুহূর্তে ঐ প্রশ্নের জবাব কেউই দিতে পারে না। এমনকি পুণ্ডরীকের প্রিয়পাত্র কামু পাইকও নয়। থানার অন্যান্য পাইক-বরকন্দাজদের প্রশ্নের জবাবে সে কেবল বললে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না রে। তবে কয়েকদিন ধরে আমাদের রুক্মিনী যখন পালমশাইয়ের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লেগেছে তখন বুঝতে পারছি একটা কিছু হতে চলেছে।

রুক্মিনী বিরজু গোয়ালার স্ত্রী। পদবী গোয়ালা হলেও বিরজুর চেহারা এদেশের গোয়ালার মত নয়। ছিপ্ছিপে বেঁটে খাটো চেহারার বিরজু বাংলা-ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হলেও তার কথার মধ্যে যে খানিকটা অবাঙালীর টান আছে তা' যে কোন লোকের কানেই ধরা পড়ে। বিরজু খোঁজী দলের লোক। ওর স্ত্রী রুক্মিনীও তাই। বাসুদেবগঞ্জ থানা এলাকায় রুক্মিনী-বিরজুর খুব নামডাক। একালের গোয়েন্দার মতই কাজ করতো সেকালের এই খোঁজীরা। জাত গোয়েন্দা ছিল তারা। গোপনে অপরাধীর খবরাখবর জোগাড় করা থেকে শুরু করে আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ্ ইত্যাদির সাহায্যে অপরাধীকে সনাক্ত করতে এদের জুড়ি কেউ ছিল না সেকালে। এরা থানাদারের অধীনে তো নয়ই, এমনকি সরাসরি খোদ্ জমিদারের অধীনেও নয়। তবে জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কর রসস্তী চাকরাণার জমিজমা লাভ করে জমিদারের এলাকায় বাস করতো বলে এরা ছিল জমিদারের আজ্ঞাবহ। সেই সুবাদে অপরাধ দমনে থানাদার এই খোঁজীদের সাহায্য নিতো।

খুবই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক রুক্মিনী। এলাকার বাসিন্দাদের অন্দরমহলে ছিল তার অবাধ যাতায়াত। সেই সুযোগে দামী খবরাখবর জোগাড় করে সে তা' পৌঁছে দিত জমিদার কাছারিতে।

অমাবস্যার নিঝুম রাত। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। মেঘহীন অন্ধকার আকাশে কেবল সামান্য কিছু তারার ফুলঝুরি। ঐ তারা ক'টির আলো ছাড়া বিশ্বসংসারে কোথাও আর আলো আছে বলে মনে হয় না। রাতের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই গভীর রাতে গ্রাম্য মেঠো

পথে একদল পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছে থানাদার পুণ্ডরীক। লোকগুলোর পায়ের শব্দ ও সেই সঙ্গে পুণ্ডরীকের ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। মুখ বন্ধ করে পুণ্ডরীকের ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে তারা। বরকন্দাজদের হাতে গাদা বন্দুক, আর পাইকদের হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি।

পাশাপাশি হাঁটছিল কামুপাইক ও জয়রাম। থানাদারের হুকুম সত্ত্বেও চলতে চলতে জয়রাম কামুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আচ্ছা কামুদাদা, আমরা কোথায় চলেছি?

খানিকক্ষণ কোন জবাব দেয় না কামু। তারপর তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বললে বোধহয় ঠগীর আস্তানায়। রওনা হবার আগে পালমশাইয়ের কথাবার্তায় যেন তাই মনে হলো।

—কোন্ গাঁয়ে? আবার জয়রামের প্রশ্ন।

জবাব দেয় কামু, তা' বলতে পারবো না। থানাদার নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। বোধহয় রুক্মিনীই খবরটা দিয়েছে।

রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোন গ্রামেই না ঢুকে দলটি সোজা এগিয়ে যায় রাস্তা ধরে।

অবশেষে একটি ছোট গ্রামের কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে পুণ্ডরীক। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে গোটা দল। একটানা হেঁটে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা। বসে বিশ্রামের সুযোগ না পেলেও হাঁটা বন্ধ হতেই তারা অনেকটা খুশি।

ঘোড়ার পিঠে বসে সেই ঘন অন্ধকারের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, এটাই তো দিয়াড়া গ্রাম, কি বলো কামু?

পুণ্ডরীকের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে এসে ঘাড় উঁচু করে জবাব দেয় কামু, তাই তো মনে হচ্ছে, পালমশাই। আগের ঐ বড় গ্রামটা তো ছিল রসুলপুর। কাজেই পরের এটা অবশ্যই দিয়াড়া।

কামুর সমর্থনে সন্দেহের নিরসন হয় পুণ্ডরীকের। এবার সে বরকন্দাজ বদরুদ্দীনকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, আমরা এবার গাঁয়ে ঢুকবো বদরুদ্দীন। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—আমি তৈরি, পালমশাই। জবাবের শেষে বদরুদ্দীন নিজের সঙ্গে আনা কাপড়ের থলিটাকে একবার হাত দিয়ে অনুভব করে। থলিটার গায়ে

চাপ্ চাপ্ রক্ত। পুণ্ডরীকের নির্দেশে গোটা দলটি এবার প্রবেশ করে দিয়াড়া গ্রামের মধ্যে।

বদরুদ্দীন মিঞা থানায় বরকন্দাজের কাজ করলেও জাত-ব্যবসা ছাড়েনি। বদরুদ্দীনের বাপ ছিল এ অঞ্চলের একজন নামকরা ওঝা। সেই সূত্রে বদরুদ্দীনও কিছু ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র জানতো। থানার কাজের অবসরে নিজের গ্রামে ওঝাগিরিও করতো বদরুদ্দীন।

গ্রামের মধ্যে ঢুকতেই শুরু হয় কুকুরের চিৎকার। গভীর রাতে একে একটা ঘোড়া, তার ওপর আবার একদল আগন্তুক। কাজেই গ্রামের রাতের পাহারাদার কুকুরগুলোর পক্ষে ভয় পেয়ে চিৎকার করাই স্বাভাবিক।

কুকুরের চিৎকারে দাঁড়িয়ে পড়ে দলটি। কুকুরগুলোকে আর চিৎকার করার সুযোগ দেয়া চলে না। তাদের রাতের এই অভিযান প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদের উদ্দেশ্যই যে বানচাল হয়ে যাবে।

দলটি দাঁড়িয়ে পড়তেই সঙ্গের গাদা বন্দুকটি জয়রামের হাতে তুলে দিয়ে রক্তমাখা থলি হাতে এগিয়ে যায় বদরুদ্দীন। দু'হাতে থলিটি উঁচু করে ধরে নিজের মুখের কাছে এনে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়। তারপর সেই থলির ওপর বার তিনেক ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়া শেষ করে একাই আরও কয়েক পা এগিয়ে যায়। অবশেষে থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কয়েক টুকরো হাঁসের মাংস বের করে ছুঁড়ে দেয় কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে।

দলটি কিন্তু আর নড়াচড়া করে না। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে স্থির হয়ে। সকলের দৃষ্টিই অন্ধকারের দিকে। সেই ঘুটঘুটি অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু বোঝা যায় কুকুরগুলো নড়াচড়া করছে অন্ধকারের মধ্যে। মাংসের গন্ধে ঘুর ঘুর করছে রাস্তার ওপর।

অদ্ভুত কাণ্ড। থেমে যায় কুকুরের চিৎকার। মাংসের লোভেই হোক্ কিম্বা বদরুদ্দীনের মন্ত্রপুত মাংসের গন্ধেই হোক একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায় জানোয়ারগুলো। আর কোন চিন্তা নেই। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত কুকুরগুলোর চিৎকার করার আর ক্ষমতাই থাকবে না। মন্ত্রের জোরে সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছে বদরুদ্দীন। অবশেষে বদরুদ্দীনের ইঙ্গিতে দলটি আবার প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলে গ্রামের পথ ধরে।

দিয়াড়া গ্রামের প্রায় শেষপ্রান্তে মস্তবড় একটা জঙ্গল। তার পরেই শুরু হয়েছে ধু-ধু মাঠ। জঙ্গলের ঠিক আগে একটা বড় পুকুর। আর সেই পুকুরের গায়ে জঙ্গল ঘেঁষে খানকয়েক মাটির চালাঘর। সেইদিকে

তাকাতেই থানাদার পুণ্ডরীকের চোখে পড়ে একটা আলোর রেখা। সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে ওঠে পুণ্ডরীক। খোঁজী রুক্মিনী তা'হলে ঠিক্ খবরই দিয়েছে। সেই আলোর রেখা চোখে পড়তে দলের অন্যান্যরাও বিস্ময় বোধ করছিল। এত রাতে কীসের আলো ঐ চালাঘরের মধ্যে? জয়রাম কামুকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে যায়। কিন্তু তার আগেই কামু ফিস্ ফিস্ করে বললে, বোধহয় ওটাই ঠগীদের আড্ডা।

—ঠগীদের আড্ডা? প্রশ্নটা বোধহয় একটু জোরেই হয়েছিল জয়রামের।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে তাকে সাবধান করে দেয় কামু। চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, চুপ্, পালমশাই শুনতে পেলে মুশকিল হবে।

সাবধানের মার নেই। পুণ্ডরীক নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে। তারপর ঘোড়াটাকে একটা ছোট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দৃঢ় অথচ চাপা কণ্ঠে দলের সবাইকে নির্দেশ দেয়, টু শব্দটি করবে না কেউ। বেড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে চলো সবাই ঐ চালা ঘরের দিকে। তোমাদের প্রথম কাজ হবে নিঃশব্দে ঐ চালাঘরগুলোকে ঘিরে ফেলা। একটা লোকও যেন পালাতে না পারে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। চালাঘরগুলোর আরও কাছে যেতেই ঘরের মধ্যে বেজে ওঠে ঘণ্টা। সাধারণ ঘণ্টা নয়, পুরুতঠাকুরের ঘণ্টা। এত রাতে কী চলছে ঐ ঘরের মধ্যে? কোন পূজোআর্চা নাকি? এইসময় আবার কীসের পূজো? দলের অনেকের মত জয়রামের মনেও জেগে ওঠে ঐ একই প্রশ্ন। কিন্তু এই মুহূর্তে এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় না কামুকে। পরিস্থিতিও তেমন নয়।

চালাঘরগুলোকে ঘিরে লাঠি ও গাদা বন্দুক হাতে থানার পাইক-বরকন্দাজেরা। কামুকে সঙ্গে নিয়ে যে ঘরে আলো জ্বলছিল সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় পুণ্ডরীক। তারপর একটানে হঠাৎ খুলে ফেলে দরজাটা।

ঘরের মধ্যে চার পাঁচজন লোক। অতি সাধারণ চেহারা তাদের। দেখে মনেই হয় না যে এরাই সেই ভয়ঙ্কর ঠগী যারা নাকি পথচারীকে ভুলিয়ে কোন নির্জ্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে আচম্কা তার গলায় রেশমি কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে তাকে মেরে ফেলে লুঠ করে তার যথাসর্বস্ব। মনেই হয় না যে কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এই মানুষগুলো।

থানাদার পুণ্ডরীককে দেখে লোকগুলো যেন চুপ্‌সে যায়। কী করবে বুঝতে না পেরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল। মুখে তাদের ভয় ও

দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় পুণ্ডরীক। ফাঁকা ঘর। মনেই হয় না কেউ বাস করে এই ঘরে। জিনিসপত্র বলতে কিছুই নেই। ঘরের এককোণে একখানা কালীর পট। একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জলছে সেই পটের সামনে। কলাপাতায় সাজানো রয়েছে কিছু ফলমূল। আর সেই পটের সামনে বসে মা কালীর পুজো করছিল এক অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ পুরুতঠাকুর। গলায় তার ধবধবে পৈতে। বাঁ হাতে ঘণ্টা।

থানাদার ও সেইসঙ্গে একদল পাইক-বরকন্দাজের আগমন টের পেয়ে বন্ধ হয়েছিল সেই বৃদ্ধ পুরুতঠাকুরের কালীপুজো। হাতের ঘণ্টা হাতেই রইলো তার। পুজোর উদ্যোক্তাদের মত সেও তাকিয়ে থাকে পুণ্ডরীকের দিকে। তাদের মত পুরুতঠাকুরের চোখে মুখেও ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার ছায়া।

প্রথমটায় থানাদার পুণ্ডরীকের মনেও সংশয় দেখা দেয়। সত্যিই কি এই লোকগুলো ঠগী? নাকি রুক্মিণী ভুল খবর দিয়েছিল তাকে? এমনিতে তো লোকগুলোকে নিরীহ বলেই মনে হয়।

লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, এই, তোরা কে? এই অসময়ে কীসের কালীপুজো করছিস তোরা?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—। ওদের মধ্যে একজন কিছু বলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত বলতে না পেরে আবার চুপ্ করে। বাকিরাও কোন কথা বলে না।

—এই যে ঠাকুরমশাই, পুরুতঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, এই অসময়ে কীসের কালীপুজো?

পুণ্ডরীকের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসন ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পুরুতমশাই এসে দাঁড়ায় পুণ্ডরীকের সামনে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলে ওঠে, আজ্ঞে না—না-না, বিশ্বাস করেন, আমার কোন দোষ নাই। এই ব্যাটারা একরকম জোর করে আমাকে দিয়ে—।

—আঃ, মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে ওঠে পুণ্ডরীক দোষ-গুণের কথা কে জিজ্ঞেস করছে আপনাকে? আমি কেবল জানতে চাইছি এটা কীসের কালীপুজো।

ঘরের মধ্যে পুণ্ডরীকের পাশে কামু পাইক ছাড়া আর ছিল জয়রাম। বরকন্দাজ বদরুদ্দীন ছিল দরজার মুখে। বোধহয় তারও ঘরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে কালীপুজোর ব্যবস্থা দেখে সে আর ঢোকে নি। বরকন্দাজ হোক্ কিম্বা যাই হোক্ না কেন, মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর পুজোর

জায়গায় তো ঢোকা চলে না।

পুণ্ডরীক যখন পুরুতঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিল জয়রাম তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাকালীর সেই পটের কাছে। হঠাৎ অনেকটা আপন মনেই সে বলে ওঠে, এ আবার কেমন ধরনের কালীপুজো? পুজোয় কোদাল ও কাপড়ের টুক্‌রো লাগে নাকি?

কথাটা কানে যেতেই অভিজ্ঞ থানাদার পুণ্ডরীকের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে যায় মাকালীর পটের দিকে। বাস্তবিকই তাই। পটের একপাশে দু'খানা কোদাল, আর সেই কোদালের হাতলের সঙ্গে ঝুলছে কাপড়ের লম্বা টুক্‌রো।

এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয় পুণ্ডরীক। মানুষের দেহের আড়ালে একদল ভয়ঙ্কর নরপশু এই আপাত-সাধারণ লোকগুলো। এরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠুর ঠগী। অমাবস্যার রাতে এরা এখানে জড় হয়েছে মাকালীর আশীর্বাদ পাওয়ার বাসনায়। গভীর রাতে এই পুজোর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরা মন্ত্রপুত করে নিচ্ছে এদের প্রধান হাতিয়ার—কাপড়ের টুকরো ও কোদাল। এই কাপড় দিয়েই এরা আচম্‌কা নিরীহ পথচারীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাদের হত্যা করে যথাসর্বস্ব লুঠ করে, আর কোদাল দিয়ে মাটি খুড়ে মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে নরহত্যার প্রমাণ লোপ করে।

ঠগীদের হাতে ও কোমরে দড়ি বেঁধে তাদের যখন থানায় আনা হলো তখন পূবদিক প্রায় ফর্সা হয়ে উঠেছে। নরহত্যাকারী এই ঠগীদের সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে জয়রাম সত্যি-মিথ্যা অনেককিছু শুনলেও, তাদের চাক্ষুষ দেখলো এই প্রথম। কিন্তু দেখেও যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই সাধারণ চেহারার নিরীহ মানুষগুলো যে এমনি নিষ্ঠুর কাজ করে বেড়াতে অভ্যস্ত তা' প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় জয়রামের। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। সে নিজের চোখে তাদের হাতিয়ার সেই কাপড়ের টুকরো ও কোদাল পুজো করতে দেখেছে। কেবল তাই নয়, থানায় এসে স্বীকারোক্তিও করেছে তারা। এবার এদের পাঠিয়ে দেয়া হবে চাঁচড় গ্রামের দারোগাই আদালতে বিচারের জন্যে। সেখানে তাদের বিচার করবে আদালতের দারোগা মহম্মদ সুলতান। বড়ই কঠিন লোক এই সুলতান। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

পরের দিন বাড়ি ফিরে এই ঠগীদের কথাই মা এলোকেশী ও বোন তরঙ্গকে বলছিল জয়রাম। রাতের অভিযানে বেড়িয়ে তারা যে কেমন করে

কালীপুজোর আসর থেকে তাদের পাকড়াও করে নিয়ে এসেছিল সেই কাহিনীই সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল সে। শুনতে শুনতে মা-মেয়ের চার চোখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময় ও ভীতির চিহ্ন। পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে সদাই উৎকণ্ঠিত মা এলোকেশী বলে উঠেছিল, কী সব্বনেশে কাণ্ড! ঠগী বলে কথা! ওরা যদি উল্টে তোদের গলায় ফাঁস লাগাতো?

এলোকেশীর আশঙ্কায় হেসে উঠেছিল জয়রাম। হাসতে হাসতে বলেছিল, তুমি বলছো কি, মা? আমাদের দেখেই তো ওরা কেঁচো। থানাদারের সামনে তার পাইক-বরকন্দাজের গায়ে হাত ছোঁয়াবে? এত সাহস ওদের?

—কী জানি বাবা, জবাব দিয়েছিল এলোকেশী, সাবেক কাল তো আর নাই। হ্যাঁ, ছিল তোর বাপের আমলে। পাইক-বরকন্দাজ তো বড় কথা, গাঁয়ের চৌকিদারের ছায়া চোখে পড়লেই চোর-ছ্যাচোরের কাছা খুলে যেতো।

এলোকেশী থামতেই তরঙ্গ বিস্ফারিত চোখে জয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাগো দাদা, ওরা কি দেখতে ঠিক মানুষের মত?

বোনের প্রশ্নে হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল জয়রাম। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলেছিল এলোকেশী, বেটি বুদ্ধির ঢেঁকি। মানুষের মত দেখতে হবে না তো জানোয়ারের মত হবে নাকি রে?

—না মা, বলে উঠেছিল জয়, তোমার কন্যেটি বোধহয় ঠগীদের মানুষের বদলে বনমানুষের মত একটা কিছু ভেবেছে। কি বলিস তরি, তাই না রে?

তরঙ্গ আর জবাব দেয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সলজ্জ-ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ চুপ্ করে থাকে। তারপর চোখমুখ ঘুরিয়ে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কলকল করে ওঠে, বারে, কী এমন ভুল বললাম? আমি কি কখনও ঠগী দেখেছি? পিরথিবীতে ভুত-পেরেত, দত্যি-দানো কত কিছুই তো আছে। ভেবেছিলাম ঠগীও বুঝি তেমন কিছু হবে। কথাটা বলেই তরঙ্গ দুম্-দাম্ পা ফেলে উঠে যায় সেখান থেকে।

দশ ছাড়িয়ে এগারোর কোঠায় পা দিয়েছে তরঙ্গ। মেয়েকে এতটা বয়স পর্যন্ত বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। নেহাত দিনকাল পাল্টেছে। তা'ছাড়া, মেয়েকে পার করার মত সামর্থ্যও তো এতকাল ওদের ছিল না। এলোকেশীর সংসারে যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো পেটের ভাত জোগাড় করাই ছিল কষ্টকর, সেখানে মেয়ের বিয়ের কথা তো এতকাল চিন্তাই করতে পারেনি এলোকেশী। সেদিন তো আর নেই যে কুড়িখানেক টাকা জোগাড় করতে পারলেই দিব্বি একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে

যেতো। এখন তো সব জিনিসই আক্রা। যেমন-তেমন করে একটা মেয়েকে পার করতে হলেও এই বাজারে তিন-চার কুড়ি টাকার কম হয় না। ইদানীং অবশ্যি এলোকেশীর সংসারের হাল একটু ফিরেছে। একটুকু জমি হয়েছে তাদের জয়রামের পাইকগিরির সুবাদে।

একদিন এলোকেশী কথাটা পাড়লে জয়রামের কাছে। ঘরের দাওয়ায় বসে থানা থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত জয়রামকে হাওয়া করতে করতে এলোকেশী বললে, মেঘে মেঘে বেলা তো হলো অনেক। এবার মেয়েটার বে-থা'র একটা কিছু ব্যবস্থা কর্ বাবা।

—কেন মা ? প্রশ্ন করে জয়রাম, গাঁয়ের কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

জবাবে এলোকেশী বললে, না—না, কে আর বলতে আসবে ? আমার নিজেরই আর ভালো লাগছে না। এর পরে আরও দেরি করলে কুলীন বামুনের ঘরের মেয়ের মত চিরকাল হয়তো মেয়েটাকে আইবুড়ো হয়েই থাকতে হবে। কপালে আর বরই জুটবে না।

মায়ের কথায় চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে জয়রামের কপালে। বামুন পাড়ায় এমনি আইবুড়ো মেয়ের তো অভাব নেই যাদের নাকি বিয়েই হয়নি কুলীন পাত্রের অভাবে। তা'ছাড়া, গাঁয়ে আরও কিছু মেয়ে আছে যাদের কেবলমাত্র আইবুড়ো নাম ঘোচাতেই বিয়ে হয়েছিল দূর গাঁয়ের এমন কোন বয়স্ক কুলীন পাত্রের সঙ্গে যার পেশাই কেবল একটার পর একটা বিয়ে করে কিছু যৌতুক লাভ করা। কোন্ কোন্ গ্রামের ক'টা ছাদনাতলায় ক'বার সে বসেছিল তার হিসেব দেয়া হয়তো তার নিজের পক্ষেও মুশকিল। জীবনে হয়তো একমাত্র ঐ বিয়ের রাতটাতেই তার দেখা হয়েছিল স্ত্রীর সঙ্গে। পরবর্তী-কালে সেই মেয়েরা হয় কঠিন সংযমে নিজেদের শৃংখলিত করে বাপের সংসারে জীবন কাটিয়েছে, নয়তো পদস্খলনের অপরাধে তাদের শাস্তি লাভ করে আবার ঐ সমাজের মাতব্বরদেরই গোপন লালসার শিকার হতে হয়েছে।

এই সময় কি একটা কাজে তরঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। সেই দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে মুখটিপে হেসে জয়রাম এলোকেশীকে বললে, তোমার যা একখানা মেয়ে! ওর তো আর যেমন-তেমন বরে মন উঠবে না। তেমন একটি ভালো পাত্রও বা পাই কোথায় ?

—ভালো হোক্, খারাপ হোক্, পাত্তর কি নিজে থেকে আমাদের উঠানে এসে দাঁড়াবে ? বলতে থাকে এলোকেশী, তার জন্যে চেষ্টা-চরিত্তির করতে হয়। তুই আছিস তোর থানার কাজ-কম্ম নিয়ে। আমি একা মেয়েলোক

পাত্তরের সন্ধানে কোথায় যাবো ?

—তা' যা বলেছ মা, জয়রাম বললে, আমাকেই দেখছি একটু উঠে পড়ে লাগতে হবে।

—হ্যাঁ বাবা, জবাব দেয় এলোকেশী, তুই হলি গিয়ে থানার পাইক। পাঁচ-সাত খানা গাঁয়ের লোক তোকে জানে। তোর বোনের কথা শুনলে অনেক পাত্তরের বাপ-দাদাই এগিয়ে আসবে।

এলোকেশীর কথায় একটু ম্লান হাসি ফুটে ওঠে জয়রামের মুখে। তার মা এখনও বসে আছে পুরানো চিন্তা-ভাবনা নিয়ে। তার ধারণা, জয়রামের বাপ জনার্দনের আমলে গাঁয়ের চৌকিদার কিম্বা থানার পাইক-বরকন্দাজদের মানুষ যে চোখে দেখতো তাই বুঝি এখনও অটুট। সমীহ হয়তো এখনও করে। কিন্তু নানা কারণে সেকালের সেই প্রীতি-ভালোবাসার মধ্যে যে ফাটল ধরেছে তার খবর তার মা এলোকেশী রাখে না।

এর পর থেকে জয়রাম সত্যি সত্যি উঠেপড়ে লাগে পাত্রের খোঁজে। অবশেষে মিলেও যায় একটি। ঘুঘুডাঙ্গা থেকে কমলাপুর একদিনের হাঁটা পথ। সেই কমলাপুরের বনবিহারীর ছেলে গোবিন্দ ছেলেটি দেখতে শুনতে চমৎকার। বাপের জমিজমা দেখাশোনা করে। তরঙ্গকে দেখে ওদেরও পছন্দ। অবশ্যি দেনা-পাওনার চাপ একটু বেশি। অনেক বলে-কয়ে বরপণ দেড় কুড়ি টাকা থেকে এক কুড়িতে নামিয়েছে জয়রাম। তবে পাত্রের মায়ের আবদার, কনের পায়ে রূপোর মল ও কোমরে রূপোর গোট দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাতেই রাজি হতে হয়েছে জয়রামকে। বর আসবে পাল্কীতে, আর বরযাত্রীরা গরুর গাড়িতে। সেই খরচও পাত্রীপক্ষকে বহন করতে হবে।

বিয়ের দিন কয়েক আগে এলোকেশী একদিন জয়রামকে বললে, আমার ইচ্ছা গাঁয়ের বামুনদিগের বিয়েতে নেমন্তন্ন করি। তাদের আশীব্বাদে আমার তরঙ্গ সুখী হবে।

একটু চিন্তা করে জবাব দেয় জয়রাম, সে তো অনেক খরচ, মা। আমি কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম পুরুতঠাকুরকে। সে বললে, যারা বামুন নয় তাদের বাড়ির বিয়ের আসরে বামুনরা উপস্থিত থাকলে তাদের নাকি সভাস্থ করতে হয়।

—সেটা আবার কিরে ? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর এলোকেশীর।

জবাব দেয় জয়রাম, তারা তো আর আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খাবে না। তাই তাদের পয়সা-কড়ি ও একটা করে সিধে দিয়ে সভাস্থ করার নিয়ম।

কয়েকমুহূর্ত চুপ্ করে থাকে এলোকেশী। তারপর আবার বললে, তা'হলে থাক্, বাবা। গাঁয়ের বামুনদিগের সবাইকে ওসব দেয়া তো অনেক খরচ-খরচার ব্যাপার। তার চাইতে ভিন্ গাঁ থেকে যারা আসবে তাদের একটু ভালোমত যত্নআত্তির ব্যবস্থা করিস্, বাবা।

—ভিন্ গাঁ থেকে আবার কারা আসবে গো, মা?

—কেন, বরযাত্তিরা।

—ও হাঁ্যা, বলতে থাকে জয়রাম, ওদের নিয়েই তো আমার বেশি দুশ্চিন্তা মা। ওদের উদ্দেশ্যই তো কেবল খুঁত ধরা।

—খুঁত না থাকলে ধরবে কেমন করে?

—তার কি কিছু বলা যায়, মা? অতগুলো লোক দু'তিন দিন থাকবে। তখন যদি ওরা বেঁকে বসে যে জলখাবারে দই-চিড়ে খাবে না, তাদের লুচি-চিনি দিতে হবে, তখন কী হবে?

—তখন না হয় তাই দেব।

—কোত্থেকে দেব মা? বলে ওঠে জয়রাম, তোমাদের কালের সেই টাকায় সাত-আট সের ঘি'য়ের দিন কি আর আছে? আকাশ ছোঁয়া দাম এখন। টাকায় আড়াই-তিন সেরের বেশি ঘি পাওয়া যায় না। এই দিয়ে কি অতগুলো লোকের লুচির ব্যবস্থা করা সহজ?

চিন্তিত মুখে চুপ্ করে থাকে এলোকেশী। কথাটা মিথ্যে নয়। সেই আকালের পর থেকেই দেশজুড়ে কি যেন হলো। জিনিসপত্রের দরদাম কেবল চড়ছেই। কেউ বলে এর জন্যে নাকি দায়ী দেশের জমিদার। কেউ বলে দায়ী ঐ ফিরিঙ্গিগুলো যারা নাকি এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

একসময় এলোকেশী বললে, তা'হলে বাবা যা মন চায় তাই কর্। তবে দেখিস্ গাঁয়ের যেন বদনাম না হয়।

অবশেষে এলো সেই বিয়ের দিন। বরের সঙ্গে এলো একদঙ্গল বরযাত্রী। তারা যথারীতি কনে পক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার সবরকম চেষ্টা করলেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেল না কেবলমাত্র জয়রামের জন্যেই। শত হলেও থানার পাইক। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই ভিন্ গাঁয়ে কোন্ ফ্যাসাদে পড়তে হবে কে জানে?

বিয়ে হয়ে গেল গোবিন্দের সঙ্গে তরঙ্গের। অবশেষে মা এলোকেশীর চোখের জলের বন্যা, প্রতিবেশিনীদের মুখে আঁচল দিয়ে ফুপিয়ে কান্না ও দাদা জয়রামের ছল্ ছল্ চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তরঙ্গ গোবিন্দর সঙ্গে গিয়ে বসলো চার বেহারার পাল্কীতে। পাল্কী চললো কমলাপুরের উদ্দেশে।

পাঁচ

হাড়-কৃপণ বলতে যা বোঝায় চিতলমারী গ্রামের নিবারণ নন্দী ছিল ঠিক্ তাই। ধান-চালের ব্যবসা ছিল নিবারণের। গ্রামের মানুষ বলতো, মরার পরে নিবারণ নাকি যক্ষ হয়ে নিজের ধন সম্পদ পাহারা দেবে অনন্তকাল ধরে। কথাগুলো কানে যেত নিবারণের। শুনে, মনে মনে দুঃখ বোধ করতো সে। কিন্তু তাই বলে পয়সা-কড়ির ওপর তার অতিরিক্ত মায়া-মমতায় এতটুকু ভাটা পড়তো না। এই নিয়ে আকার ইঙ্গিতে কেউ কিছু বললে নিরীহ ভঙ্গিতে সে জবাব দিতো, কোথায় তোমরা আমার পয়সা-কড়ি দেখছো? কোন রকমে টিঁকে আছি—এই পর্যন্ত।

বলতে গেলে নিজের এই কৃপণ স্বভাবের জন্যেই নিবারণ নন্দীর চতুর্থ মেয়ে লাবণ্য বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফিরে এলো বাপের কাছে। উপলক্ষ মাত্র দু'কুড়ি টাকা। টাকাটা বরপণ হিসেবে দেবার কথা ছিল নিবারণের। বিয়ের আসরে তো নয়ই, এমনকি বিয়ের পরেও এই টাকাটা আর দিলে না নিবারণ। এ নিয়ে শ্বশুর-বাড়িতে উঠতে-বসতে খোটা খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো লাবণ্য। ব্যাপারটা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন একদিন অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই লাবণ্য শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসে উঠ্‌লো বাপের বাড়ি। ছুতো পেয়ে গেল লাবণ্যর শ্বশুর। গ্রামময় সে প্রচার করে দিলে যে লাবণ্যর স্বভাব-চরিত্র নাকি ভালো নয়। তাই সে ঘর ছেড়েছে। এই মেয়েকে সে আর কিছুতেই নিজের বাড়িতে ঠাঁই দেবে না। অবশেষে সে মোটা বরপণ ও যৌতুক নিয়ে ছেলে রজনীকান্তের আবার বিয়ে দিলে। লাবণ্য পাকাপাকি রয়ে গেল বাপের বাড়ি।

সেই নিবারণ নন্দী একদিন খুন হলো নিজেরই বাড়িতে। গ্রীষ্মের রাত। ঘরের দাওয়ায় ঘুমিয়েছিল নিবারণ। গ্রীষ্মের রাতে সে বরাবরই বাইরে ঘুমোয়। শেষরাতে বাইরে বেরোতে হয়েছিল লাবণ্যকে। ঘরে ঢুকবার মুখে হঠাৎ তার নজর পড়লো দাওয়ায় শুয়ে থাকা তার বাপের দিকে। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু নজরে না পড়লেও তার বাবার শোবার ভঙ্গিটি যেন কেমন কেমন ঠেকলো তার কাছে। নিবারণ তো কখনও এভাবে হাত-পা

ছড়িয়ে ঘুমোয় না। কৌতূহলী লাবণ্য কাছে যেতেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি চোখে পড়লো তার। বিছানায় রক্তের স্রোত। সেই স্রোত ঘরের দাওয়া ছাড়িয়ে নেমে এসেছে উঠোনে। রক্তের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে নিবারণ। গলায় তার গভীর ক্ষত।

লাবণ্যর চিৎকার-চেঁচামেচিতে সেই শেষ রাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছিল নিবারণের বাড়িতে। সকলের মুখে কেবল একই কথা—কে—কে এমন কাজ করলে? আর, এর পেছনে উদ্দেশ্যই বা কী?

নিবারণের সংসারে পুরুষ বলতে একমাত্র সে নিজে। পাঁচ মেয়ের মধ্যে বড়টি ছেলেবেলায় জলে ডুবে মারা গেছে। মেজটি ছিল অপরূপা সুন্দরী। তার সেই রূপ দেখেই পাশের গাঁয়ের এক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়েছিল। জামাইটি ছিল করিৎকর্মা। বাপ মারা যেতেই বাপের সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল কলিকাতায়। সেখানে বিলিতি সাহেবদের মুৎসুদ্দির কাজ নিয়ে নাকি ভালই আছে। গাঁয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর রাখে নি। তৃতীয়টির বিয়ে হয়েছিল বড় বহেড়া গ্রামে। বরটি ছিল চরিত্রহীন লম্পট। সেই দুঃখে নিবারণের তৃতীয় কন্যা গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বাকি দু'টির একটি লাবণ্য, অন্যটি ছোট। নিবারণের দু'টি স্ত্রী। বড়টি বাঁজা। কন্যা পাঁচটিই ছোট স্ত্রীর। পঞ্চ কন্যাকে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় নিয়ে আসার জন্যেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক, নিবারণের এই ছোট স্ত্রী সারদাবালা চিররুগ্না। আর বড় হেমাঙ্গিনী সংসার সম্পর্কে প্রায় উদাসীন। কাজেই সেই সপ্তদশী স্বামীপরিত্যক্তা নিবারণের চতুর্থ কন্যা লাবণ্যই হয়ে উঠেছিল নিবারণের সংসারের আসল কর্ত্রী।

সেই শেষরাতে হুলুস্থুলু কাণ্ড নিবারণের বাড়িতে। গাঁয়ের লোকের ভিড়, সেইসঙ্গে চেঁচামেচি, হৈ-চৈ। এখানে-ওখানে প্রতিবেশীদের জটলা। আলোচনার বিষয়বস্তু সেই একই—কে খুন করলে নিবারণকে? কেন খুন করলে?

নিবারণের মৃতদেহটাকে ঘিরেও গাঁয়ের মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে রয়েছে তার পরিবার-পরিজনেরা। ঘটনার আকস্মিকতায় নিবারণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যেন বোবা হয়ে গেছে। এমনিতেই সে কথা বলে কম, তার ওপর এই ঘটনায় সে যেন হয়ে উঠেছিল একখানি পাথর। নিবারণের দ্বিতীয়

পক্ষের রুগ্না স্ত্রী বারে বারে জ্ঞান হারাচ্ছিল, আর প্রতিবেশিনীরা তার মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে আবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনছিল।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা, নিবারণ খুড়োর হাতে তো বরাবর একটা সোনার বাজু থাকতো। সেটা কোথায়?

খোঁজ—খোঁজ। খবর গেল অন্দরমহলে, কিন্তু বাড়ির মেয়েরা কেউই বলতে পারলে না বাজুর কথা। এতক্ষণে যেন বোঝা গেল নিবারণের মৃত্যুর কারণ। সোনার ঐ বাজুটাই কাল হয়েছিল তার। ওটার লোভেই কেউ হত্যা করেছে তাকে। কিন্তু কে সেই নৃশংস হত্যাকারী? এই গাঁয়েরই কেউ, নাকি বাইরের কেউ এসে এ কাজ করে সরে পড়েছে?

পরের দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে থানাদার পুণ্ডরীকের সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল চিতলমারী গ্রামের চৌকিদার অর্জুন বৈশ্য। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, শেষরাতে খুন হলো, আর এত বেলায় এলে খবর দিতে?

বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয় অর্জুন, আজ্ঞে, সেই শেষরাত থেকে এতটা বেলা পর্যন্ত গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যে কেবলই জল্পনা-কল্পনা। কারুর একে সন্দ হয়, কারুর ওকে। আমি এখানে খবর দেবার কথা বলতেই তারা বলে, দাঁড়াও গো চৌকিদারভায়া, একটা কিছু ঠিক্ হোক্, তারপর যেও। সেই থেকে দেরি হতে হতে এতটা বেলা।

জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, তা'হলে তোমাদের ধারণা নন্দীমশাইয়ের হাতের সেই সোনার বাজুটার লোভেই সে নিহত হয়েছে, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় অর্জুন। তারপর আবার বললে, সোনার বাজুর লোভেই এই খুন-খারাপী। দিন-কাল যা পড়েছে! মাত্তর তো একখানি সোনার বাজু। তারই তরে একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন।

—কাউকে সন্দেহ হয় তোমাদের?

—কাকে আর সন্দ হবে? বলতে থাকে অর্জুন, বলতে গেলে সন্দ হয় তো অনেককেই, আবার কাউকেই নয়। সত্যি বলতে কি, কেউ তো আর ঐ নন্দীমশাইকে খুন হতে দেখে নাই।

জোড়া ভ্রূযুগল কুঁচকে পুণ্ডরীক আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি তো গাঁয়ের চৌকিদার। গাঁয়ের অনেক খবরাখবরই তো তোমার রাখার কথা। তা, তোমার কাকে সন্দেহ হয়?

একটু সময় চিন্তা করে অর্জুন। তারপর জবাব দেয়, কার কথাই বা

বলি। চোর-ছ্যাঁচোর তো অনেক ক'টিই আছে গাঁয়ে। তবে তারা যে একখানি বাজুর জন্যে মানুষ খুন করবে তা' বিশ্বাস হয় না। তা, চিতলমারীর কেউ না হয়ে ভিন গাঁয়ের কেউও তো হতে পারে।

এতক্ষণে থানাদার পুণ্ডরীক বুঝতে পারে অর্জুনের কাছ থেকে তেমন কোন খবর জোগাড় করা যাবে না। তাই সে আবার বললে, তা'হলে তুমি এবার গাঁয়ে ফিরে যাও অর্জুন। সবাইকে গিয়ে বলো থানার নায়েব তদন্ত করতে গাঁয়ে যাবে। কেউ যেন গাঁ ছেড়ে কোথাও না যায়।

—ঠিক আছে, জবাব দেয় অর্জুন, আপনার হুকুম। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আপনার হুকুম অমান্যি করে গাঁয়ের বাইরে যাবে ?

চিতলমারী গ্রামে রওনা হতে একটু দেরিই হয়ে গেল থানার নায়েব পাঁচকড়ির। অবশ্য এ জন্যে সে নিজে ঠিক্ দায়ী নয়। দায়ী জয়রাম। সেদিন এমনিতেই থানায় এসে পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল জয়রামের। তার ওপর তার নিজের রণপা জোড়া ভেঙে যাওয়ায় অন্য একজোড়া রণপা জোগাড় করতেই দেরি হয়েছিল তার।

ঘোড়ার পিঠে দুল্‌কি চালে খুনের তদন্তে চলেছে থানার নায়েব পাঁচকড়ি ঘোষ। আর তার পিছু পিছু রণপায়ে চেপে চলেছে থানার সর্বকনিষ্ঠ পাইক জয়রাম। ইদানীং পাঁচকড়ির সঙ্গী জয়রাম। ঘোড়ার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। তাই ওস্তাদ রণপায়ী জয়রামকে বেছে নিয়েছিল পাঁচকড়ি।

নিবারণের বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামতেই পাঁচকড়িকে প্রায় ঘিরে ধরে গ্রামের লোকেরা। থানার রাজপুরুষদের সম্পর্কে গ্রামের মানুষের সাধারণ কৌতূহল তো ছিলই, তার ওপর থানার নায়েব এসে তদন্ত করে খুনীকে পাকড়াও করবে এমনি একটা কথাই গ্রামময় রটিয়ে দিয়েছিল চৌকিদার অর্জুন বৈদ্য। তাই গ্রামের অনেকেই এসে হাজির হয়েছিল সেখানে।

ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে নিবারণের বাড়িতে প্রবেশ করে পাঁচকড়ি। সঙ্গে পাইকের পোশাকপরা জয়রাম। চৌকিদার অর্জুনই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল তাদের। পাঁচকড়ি এসে নিবারণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়াতেই অন্দরমহলে এতক্ষণে থিতিয়ে পড়া কান্নার রোল আবার জেগে ওঠে। এ যেন কান্নার মধ্যদিয়েই অন্দরের মহিলারা অভিযোগ পেশ করছে থানার রাজপুরুষদের কাছে।

নিবারণ নন্দীর মৃতদেহ পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ মৃতদেহের কাছে একজোড়া কাদামাখা পায়ের ছাপ্ নজরে পড়ে পাঁচকড়ির। মুখ তুলে সে

জিজ্ঞেস করে অর্জুনকে, এ পায়ের ছাপ্ কার?

অর্জুন চুপ্ করে থাকে। পাঁচকড়ি আবার জিজ্ঞেস করে, মৃতদেহ দেখতে গাঁয়ের কেউ কি কাদামাখা পায়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল?

অর্জুনের বদলে ভিড়ের মধ্য থেকে এবার জবাব দেয় চিতলমারীর পঞ্চায়েৎ-প্রধান দ্বিজদাস পাঠক, আজ্ঞে না। সেই শেষরাতে খবর পাবার পর থেকে আমি এখানেই আছি। মৃতদেহের এত কাছাকাছি কেউই আসে নাই। তা'ছাড়া, বৃষ্টি বাদলার দিন নয়। পায়ে কাদা মেখে কে আসবে এখানে?

গম্ভীর হয়ে ওঠে পাঁচকড়ির মুখখানা। একটু চিন্তা করে সে আবার জিজ্ঞেস করে, কাছাকাছি কোন পুকুর আছে এখানে?

জবাব দেয় দ্বিজদাস, আজ্ঞে না। খুব কাছাকাছি নাই।

—কোন নদী-নালা?

—নদী না'ই, তবে একটা সরু নালা আছে।

—চলুন তো, নালাটা একবার দেখে আসি।

নিবারণের বাড়ির পেছনেই নালাটা। দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির ময়লা জল পড়ে ঐ নালার সৃষ্টি। পাঁকভর্তি ঐ নালার কাছেই পাওয়া গেল আরও কয়েকটা একই রকম কাদামাখা পায়ের ছাপ।

অপরাধীকে পাওয়া না গেলেও তার পায়ের ছাপ যে পাওয়া গেছে এতেই অনেকটা খুশি পাঁচকড়ি। অবশেষে সে দ্বিজদাসকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের গাঁয়ের কুমোরপাড়াটা কোথায়? গোটা কয়েক বড় মেটে হাঁড়ি পাওয়া যাবে সেখানে?

—মেটে হাঁড়ি? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর দ্বিজদাসের।

—হ্যাঁ, মেটে হাঁড়ি, জবাব দেয় পাঁচকড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছোটে কুমোরপাড়ায়। আর পাঁচকড়ি দ্বিজদাসের কাছে সরে এসে নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, এ ব্যাপারে কাউকে আপনাদের সন্দেহ হয়?

দ্বিজদাস একবার নিজের রোমশ-ভুঁড়ির ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে জবাব দেয়, দেখেন, সন্দেহ আর কাকে করবো? চোর-ছ্যাচোর তো সব গাঁয়েই আছে। আমাদের এই চিতলমারীতেও আছে। কিন্তু তাদের কেউ একখানা সোনার বাজুর জন্যে যে এমন একটা কাজ করতে পারে তা' ঠিক বিশ্বাস হয় না।

পাশে দাঁড়িয়ে পাঁচকড়ি ও দ্বিজদাসের কথা শুনছিল জয়রাম। দ্বিজদাস

থামতেই জয়রাম পাঁচকড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, দেখে-শুনে তো মনে হয় গাঁয়ের কেউই একাজ করেছে।

জয়রামের কথায় পাঁচকড়ি ও দ্বিজদাস একযোগে তাকায় তার মুখের দিকে। বলতে থাকে জয়রাম, যে লোক একাজ করেছে সে এখানকার পথ-ঘাট ভালই চেনে। নইলে বাড়ির সামনে বড় রাস্তা থাকতে সে এই খিড়কির পথে নালা পেরিয়ে আসবে কেন? তা'ছাড়া, সে আরও জানতো যে নন্দীমশাই রাতে বাইরে ঘুমায়, আর তার হাতে একটা সোনার বাজু আছে। এসব কথা তো বাইরের কারুর জানার কথা নয়। তবে, লোকটি এই গাঁয়ের কেউ না হয়ে কাছাকাছি গাঁয়েরও হতে পারে।

জয়রামের বিশ্লেষণে মনে মনে খুশি হয় পাঁচকড়ি। তার নিজেরও তাই বিশ্বাস। কিন্তু কেবল বিশ্বাস হলেই তো চলবে না। প্রমাণ চাই। কিন্তু কোথায় প্রমাণ? নরহত্যার মত একটা সাংঘাতিক অপরাধের দায় তো শুধু শুধু কারুর ওপর চাপানো চলে না।

পাঁচকড়ি এবার খবর পাঠায় অন্দরমহলে। সেখান থেকে বেরিয়ে কুণ্ঠিত চরণে তার সামনে এসে দাঁড়ায় সতেরো বছরের লাবণ্য।

লাবণ্য শ্যামাঙ্গী, সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। একমাথা ঘন কালো চুলে মাথার পেছনের খোঁপাটি টান টান করে বাঁধা। কানে টব জাতীয় একজোড়া দুল। দু'হাতে একগাছা করে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু শাখা। পরনের ডুরে শাড়িটির আঁচলে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মুখখানি শুকনো। স্বামী পরিত্যক্তা লাবণ্য সেই শেষরাত থেকে এতটা বেলা পর্যন্ত তার একমাত্র অবলম্বন বাপের জন্যে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চোখের পাতা তখনও ভেজা।

নিহত নিবারণকে সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছিল লাবণ্যই। কাজেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ছিল পাঁচকড়ির। থানার নায়েব এসেছে খুনের তদন্তে। গাঁয়ের মানুষ যারা একবার নিবারণ নন্দীর বাড়ি ঘুরে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল তারাও খবর পেয়ে আবার এসে হাজির হয়েছিল কৌতূহল মেটাতে। বাড়ির উঠোনে মানুষের ভিড়। কয়েকটি যুবক মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বাঁশ কেটে খাটিয়া তৈরি করছিল। বাড়ির পেছন দিকে দু'জন কাঠুরে একটা বড় আমগাছ কেটে মৃতদেহ সংকারের জন্যে কাঠের জোগাড় করছিল। অন্দরমহলে তখনও চলছিল একটানা কান্না।

পাঁচকড়ি মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে লাবণ্যকে, শুনলাম তোমার বাবার মৃতদেহ নাকি তুমিই প্রথম দেখতে পেয়েছিলে। আচ্ছা মা, তখন রাত কত

হবে বলতে পারো ?

জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে লাবণ্য। তার চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে-থাকে।

পাঁচকড়ি আবার বললে, আমার প্রশ্নের জবাব দাও, মা। তোমার বাবাকে যে খুন করেছে তাকে যাতে ধরতে পারি সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

পাঁচকড়ি থামতেই লাবণ্য মুখ তুলে একবার তাকায় তার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার সেই কান্নাঝরা মুখখানা চোখে পড়তেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে জয়রামের। একটু সহানুভূতি, একটু সাহায্য করতে ইচ্ছে হয় মেয়েটাকে। বড়ই অসহায় ওর মুখখানা। লাবণ্য যে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখবর সে শুনতে পেয়েছিল এখানে এসেই। সেই বাপও চলে গেল।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় লাবণ্য, তখন শেষ রাত্তির।

—তার আগে বাইরে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলে, মা ?

মুখে জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নাড়ে লাবণ্য।

একটু সময় চিন্তা করে আবার জিজ্ঞেস করে পাঁচকড়ি, হালে তোমার বাবার সঙ্গে কারুর ঝগড়া-কাজিয়া হয়েছিল বলে শুনেছ ?

—না। জবাব দেয় লাবণ্য।

—কোন অপরিচিত মানুষকে তোমাদের এই বাড়ির কাছে-পিঠে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছ ?

—না।

—কাউকে সন্দেহ হয় তোমাদের ?

—না।

—আচ্ছা, তোমাদের বাড়ির পেছনের ঐ নালাটা ডিঙিয়ে তোমরা কি যাতায়াত করো ?

—আমরা করি না। তবে—।

—তবে কি মা ?

একটু সময় চুপ্ করে থেকে জবাব দেয় লাবণ্য, গাঁয়ের মনিষরা কেউ কেউ বড় রাস্তা ছেড়ে এ পথে যাতায়াত করে বটে।

—আচ্ছা মা, তুমি এবার যাও।

লাবণ্য এবার মুখ তুলতেই জয়রামের চোখে চোখ পড়ে তার। সঙ্গে

সঙ্গে চোখ নামিয়ে গায়ের আঁচলটা আর একটু টেনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চলে যায় অন্দর মহলে।

কুমোরপাড়া থেকে এলো কয়েকটা বড় মাটির হাঁড়ি। পাঁচকড়ি সেই হাঁড়ি দিয়ে উঠোনে নিবারণের মৃতদেহের পাশের ও নালার কাছের সেই পায়ের ছাপ্‌গুলো ভালোমত ঢেকে দিয়ে চিতলমারীর চৌকিদার অর্জুন বৈশ্যকে নির্দেশ দেয়, খুব সাবধান। এই হাঁড়ি তুলে কেউ যেন ছাপগুলো নষ্ট না করে। কড়া নজর রাখবে এদিকে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় অর্জুন। পাঁচকড়ি আবার বললে, যে ক'দিন এগুলো এভাবে থাকবে সেই ক'দিন থানা থেকে পাইকদিগের মধ্যে কেউ রোজ এসে এগুলো দেখে যাবে।

—তাই ভালো। মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে অর্জুন।

চিতলমারী গাঁয়ের আরও কিছু লোককে জিজ্ঞেসাবাদের পরে মৃতদেহ সৎকারের হুকুম দিয়ে পাঁচকড়ি থানায় ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতেই পঞ্চায়েত-প্রধান দ্বিজদাস পাঠক এগিয়ে এসে বিনীত কণ্ঠে বললে, গাঁয়ে এসেছেন। গাঁয়ের একটা মান-সম্মান আছে তো। আমার বাড়িতে আপনাদিগের দুপুরের সেবার সব ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে যদি একবার পায়ের ধুলো দেন—।

দ্বিজদাসের কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে পাঁচকড়ি ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে জয়রামের দিকে তাকাতেই জয়রাম দ্বিজদাসকে বললে, না—না, বাইরে কাজে বেরিয়ে উনি কোথাও খান না।

—তাই নাকি ? আশাহত কণ্ঠস্বর দ্বিজদাসের, আমি যে এদিকে—।

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে একটু সময় চিন্তা করে দ্বিজদাস আবার বললে, ঠিক্‌ আছে। তা'হলে আজ বিকেলেই আপনাদিগের জন্যে নজরানা সমেত একটা সিধে থানায় পাঠিয়ে দেব।

মনে মনে খুশি হয়ে পাঁচকড়ি তার ঘোড়ায় চেপে বসে। রণপায়ে জয়রামও অনুসরণ করে তাকে।

বাসুদেবগঞ্জ থানার সর্বকনিষ্ঠ পাইক কুড়ি বছরের জয়রামের চোখে প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্ন। শ্যামাঙ্গী লাবণ্যের সুশ্রী অথচ মলিন মুখখানা জয়রামের সেই স্বপ্নকে যেন আরও বেশি রঙীন করে তুলেছিল। সাহায্য ও সহানুভূতির আড়ালে সেই রঙীন স্বপ্নই যে পাখা মেলে উড়ে বেড়াতে চাইছিল তা' কিন্তু জয়রাম নিজেও টের পায়নি। চিতলমারী থেকে থানা পর্যন্ত সারাটা পথ

জয়রামের মনটাকে অধিকার করে রেখেছিল যুবতী লাবণ্য। স্বামী পরিত্যক্তা ঐ মেয়েটি আজ কত অসহায়! বাপ নেই, স্বামী থেকেও নেই। এই মুহূর্তে ঐ মেয়েটিকে জয়রাম যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারতো তা'হলে সে দারুণ খুশি হতো। কিন্তু কীভাবে যে তাকে সাহায্য করা সম্ভব তা' কিন্তু জয়রাম বুঝতে পারছিল না। আসলে, যৌবনের ধর্মই এই। যুক্তির চাইতে আবেগের প্রধান্যই সেখানে বেশি। চিন্তার চাইতে অনুভূতির। রণপায়ে চেপে থানায় ফিরে যেতে যেতে লাবণ্যকে সাহায্য করার সেই আবেগময় অনুভূতির স্রোতেই যেন ভেসে চলছিল জয়রাম। অবশেষে থানায় পৌঁছে রণপা থেকে মাটিতে পা দিতেই সে বাস্তবে ফিরে এলো। সারাটা পথ এসব কী ভাবনা ভেবেছে সে? ছি-ছি, লাবণ্য পরস্ত্রী। পরিত্যক্তা হলেও তার স্বামী বর্তমান। তার চাইতেও বড় কথা, সে কি জয়রামের সাহায্য প্রার্থী? তা'হলে সারাটা পথ ঐ মেয়েটা তার মনটাকে অধিকার করে রেখেছিল কেন?

কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে ওঠে জয়রাম। এধরনের ভাবনা-চিন্তা বাস্তবিকই অন্যায়। সংসারে অসহায় মেয়ের তো অভাব নেই। ঐ লাবণ্য মেয়েটার চাইতে অনেক বেশি অসহায় মেয়ে তো তার নিজের গাঁয়েই আছে। কৈ, তাদের জন্যে তো জয়রামের ভাবনা-চিন্তা নেই। তা'ছাড়া, সে নিজে তো থানার পাইক। অন্যকে সাহায্য করার সামর্থ্যই বা তার কতটুকু?

লাবণ্যর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে পাঁচকড়ির পিছু পিছু থানায় প্রবেশ করে জয়রাম। পাঁচকড়ি সোজা এসে দাঁড়ায় থানাদার পুণ্ডরীকের সামনে। তারপর বলতে থাকে চিতলমারী গাঁয়ে তার তদন্তের কথা।

পুণ্ডরীক তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, হরেকৃষ্ণ। আমার তো মনে হয় গাঁয়ের ঐ পাজি-নচ্ছারগুলোর মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে। চিতলমারীর ঐ বদলোকগুলোকে বেঁধে এখানে নিয়ে এলেই ওদের মধ্যে কেউ নির্ঘাৎ অপরাধ স্বীকার করতো।

—না পালমশাই, জবাব দেয় পাঁচকড়ি, তা' কেমন করে হয়? প্রমাণ ছাড়া কেমন করে ওদের ধরে নিয়ে আসবো? কেবল সন্দেহ করে তো কাউকে ধরে আনা উচিত নয়।

জবাব দেয় পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ। আরে রেখে দাও তোমার প্রমাণ, প্রমাণের জন্যে বসে থাকলে কোন কালেই কোন অপরাধী ধরা পড়বে না। তা, এবার

বলো তুমি এরপরে কী করতে চাও ?

পাঁচকড়ি বললে, আমার তো মনে হয় বিরজু-রুক্মিনীকে কাজে লাগাতে পারলে ওরা ঠিক আসল অপরাধীর সন্ধান দিতে পারবে। তাইতো আমি পায়ের ছাপ্‌গুলো মেটে হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে রেখে এসেছি।

—তা' তো বুঝলাম, বলতে থাকে পুণ্ডরীক, কিন্তু বিরজু-রুক্মিনীকে তুমি পাচ্ছো কোথায় ? ওদের তো দেখা পাওয়াই ভার। ওরা যে কখন কোথায় থাকে কে জানে ?

—তা ঠিক, পাঁচকড়ি বললে, তবে আজ না হোক্ দু'দশ দিনের মধ্যে নিশ্চ ই ওদের একবার চিতলমারী পাঠাতে পারবো।

—আর এই দু'দশ দিন ঐ পায়ের ছাপগুলো একেবারে অক্ষত থাকবে বলে মনে করেছ বুঝি ? হরেকৃষ্ণ। কথাটা বলেই একটু বিজ্ঞের হাসি হাসে পুণ্ডরীক।

চিন্তিত কণ্ঠে বলে ওঠে পাঁচকড়ি, সে ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি। ওখানকার চৌকিদার অর্জুন বৈদ্যকে বলে এসেছি ঐ ছাপ্‌গুলোর ওপর নজর রাখতে।

—আরে রেখে দাও তোমার ভীম অর্জুন, হাল্‌কা সুরে বলে ওঠে পুণ্ডরীক, গাঁয়ের চৌকিদারের সেই সেকালের মত কাজের নিষ্ঠা কি আর একালে আছে ? এখন তো কেবল চৌকিদারী চাক্‌রাণের জমিটুকুর দিকেই আসল নজর।

—তা' অবশ্য ঠিকই বলেছেন পালমশাই, জবাব দেয় পাঁচকড়ি, তাই তো ভাবছি যে ক'দিন ঐ বিরজু গোয়ালা কিম্বা তার বৌ রুক্মিনীটাকে ওখানে পাঠাতে না পারছি ততদিন কেবল ঐ চৌকিদারের ওপর ভরসা না করে থানা থেকে দু'একজন পাইক-বরকন্দাজকে ছাপ্‌গুলোর দেখাশোনা করতে পাঠাবো।

পাঁচকড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে থানাদার ও থানার নায়েবের কথোপকথন শুনছিল জয়রাম। পাঁচকড়ির কথায় মনটা তার আনন্দে নেচে ওঠে। যদি তাকেই ঐ চিতলমারী গাঁয়ে পাঠানো হয় তা'হলে বাস্তবিকই সে খুশি হয়। কিন্তু একথা মুখ ফুটে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে তার। তাই সে মুখে কিছু না বলে কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

—হ্যাঁ, এখান থেকেই কাউকে পাঠাও, কথাটা বলে জয়রামের দিকে চোখ পড়তেই আবার বলে ওঠে থানাদার পুণ্ডরীক, অন্য কাউকে কেন, এই জয়রামকেই পাঠাও না। ও তো তোমার সঙ্গে গিয়ে সবকিছু দেখে-শুনে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। পূর্ণ হলো জয়রামের ইচ্ছা। তার ওপর নির্দেশ হলো বিরজু-রুক্মিনীকে খুঁজে বের করে যে পর্যন্ত না ঐ পায়ের ছাপ পরীক্ষার জন্যে তাদের চিতলমারী পাঠানো হয় সে পর্যন্ত তাকে প্রতিদিন ঐ গাঁয়ে গিয়ে ছাপগুলোর রক্ষণাবেক্ষনের তদারকি করে আসতে হবে।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। মাথার ওপর খাঁ-খাঁ রোদ। সেই রোদের মধ্যে তেতে-পুড়ে নিবারণ নন্দীর মাটির দেওয়ালঘেরা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই জয়রামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গাঁয়ের চৌকিদার অর্জুনের। উল্টোদিক থেকে আসছিল অর্জুন। দেখা হতেই অর্জুন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, এই যে ছোট পাইকমশায়, নন্দীমশায়ের বাড়ি পানে চললে নাকি হে? কথার শেষে হাসি ফুটে ওঠে অর্জুনের মুখে।

অর্জুন কথাটা স্বাভাবিকভাবে বললেও জয়রাম সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে না কথার শেষে তার ঐ হাসিটুকু কেবলমাত্র সৌজন্যমূলক নাকি ওর সঙ্গে মিশে রয়েছে কোন বিদ্রূপের ভেজাল। কথাটা মনে হতেই কেমন যেন সংকুচিত হয়ে ওঠে জয়রাম। অন্য কেউ টের না পেলেও জয়রাম নিজে তো বুঝতে পারছে এখানে তার কীসের আকর্ষণ। আর বুঝতে পারছে বলেই এই সংকোচ। পরক্ষণেই তার মনে হয় অর্জুনের ঐ হাসিটুকু বোধহয় বাস্তবিকই নির্ভেজাল। চৌকিদার অর্জুনের এমন সাহস হবে না যে থানার পাইক জয়রামের সঙ্গে সে বিদ্রূপ করে। বয়সে ছোট বলে তাকে ছোটপাইক বলে সম্বোধন করলেও জয়রাম যে খোদ থানাদারের নিজের লোক সে বোধ না থাকার মত বোকা নয় অর্জুন। তাই অর্জুনের কথায় জয়রাম জবাব দেয়, হ্যাঁ দাদা, ওদিকপানেই যাচ্ছি।

—আমিও তো এই মাত্তর বাড়ি ঘুরে এলাম, বলতে থাকে অর্জুন, খোদ্ থানাদারের হুকুম। পায়ের ছাপ্‌গুলো নষ্ট হলে কি আর রক্ষা আছে? তাই সব কাজ ছেড়ে সকাল থেকে তো ওখানেই ঘোরাঘুরি করছি।

অর্জুন থামতেই একটু মুচকি হেসে জয়রাম বললে, থানাদার আবার এলো কোত্থেকে? কাল তদন্তে এসেছিল তো থানার নায়েব।

—ঐ হলো, বলতে থাকে অর্জুন, থানাদার আর থানার নায়েব ফারাক্‌টা কোথায় বলো? তা' ছোটপাইক, এই কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় করে তুমি আবার এ তল্লাটে এলে কেন? আমি যখন আছি তখন কার সাধ্য ঐ পায়ের ছাপ্ নষ্ট করে?

মন-রাখা সুরে জবাব দেয় জয়রাম, তা' যা বলেছ, দাদা। তোমরা যখন

আছো তখন আর ভাবনার কী আছে? কিন্তু থানাদারকে সেকথা কে বোঝাবে? তাই তো আমাকে আবার পাঠালো।

—পাঠিয়েছে তো বেশ করেছে, বলতে থাকে অর্জুন, এই মাত্তর আমি এলাম ওখান থেকে। সব ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো, ছোটপাইক। কাক-পক্ষীও ঐ হাঁড়ির দিকে ঘেঁষবে না। এতটা পথ রোদ্দুর মাথায় করে এলে। এবার চলো আমার বাড়ি। জলটল খেয়ে একটুকুন জিরোবে। তারপর মন চায় তো একবার এখান থেকে ঘুরে গিয়ে সোজা থানায় চলে যাবে।

অর্জুনের কথায় মনে মনে প্রমাদ গণে জয়রাম। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না দাদা, তুমি তো থানাদারকে ঠিক চেনো না। বড়ই কড়া মানুষ। জানতে পারলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। তোমার বাড়ি না হয় আর একদিন যাবো।

—তা' হয় না, অর্জুন বললে, জল পিপাসা পেলে ঐ মরার অশুচের বাড়িতে একটুকুন জলও তো পাবে না। তার চাইতে—।

অর্জুনের হাত এড়াতে জয়রাম বললে, চিন্তা করো না দাদা। জল পিপাসা পায় নাই আমার। তা' ছাড়া দু'এক প্রহর জল না খেয়েও আমি থাকতে পারি। বরঞ্চ ফেরার পথে পারি তো একবার তোমার বাড়ি ঘুরে যাবো।

অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ির পথ ধরে অর্জুন। আর হাঁফ ছেড়ে জয়রামও এগিয়ে যায় নন্দীবাড়ির দিকে।

নন্দীবাড়ির উঠোনের এককোণে একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের ছায়ায় বসেছিল একজন বয়স্ক লোক। নন্দীদের কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। থানার পাইকের পোশাকে জয়রামকে দেখে সসব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে তার দিকে।

জয়রাম বললে, দেখতে এলাম পায়ের ছাপ্‌গুলো ঠিক আছে কিনা।

জবাবে লোকটি বললে, কোন চিন্তা নাই। অষ্ট প্রহর আমরা এদিকে চোখ রাখছি। বলা তো যায় না, কুকুর-বেড়াল এসে হাঁড়ি উল্টে ফেলতে কতক্ষণ?

—আপনি বুঝি এদের কেউ হন? বকুল গাছের নীচে বাঁশের মাচায় পাশাপাশি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে জয়রাম।

জবাব দেয় বয়স্ক মানুষটি, নিবারণের ভগ্নীপোত আমি, নাম আমার শ্রীপতি দত্ত, থাকি বৌনপুর। চেনা আছে তো গাঁখানা? চক্ রসুলপুরের কানা

দীঘির পাশ দিয়ে যে সড়কটা সোজা উত্তুরে—। কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যায় শ্রীপতি। তারপর অপ্রতিভ কণ্ঠে আবার বলতে থাকে, এই দেখো, আমি কাকে কি বলছি। তুমি বাবা থানার পাইক। এ তল্লাটের কোন্ গাঁখানা তোমার চেনা নয়?

—না—না, তা' নয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে জয়রাম, সব তো আর চিনি না। তবে, আপনাদের বীনপুর চিনি। দু'তিন বার গিয়েছি আপনাদের গাঁয়ে।

—তাই নাকি? বলে ওঠে শ্রীপতি। নিজের গ্রামের প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে তাড়াতাড়ি পা তুলে বাঁশের মাচায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে কিছু বলতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যায় সে। তারপর আবার পা নামিয়ে জয়রামকে জিজ্ঞেস করে, তামাক-টামাক চলে তো, বাবা?

—না, চলে না। জবাব দেয় জয়রাম।

—ভালো—ভালো, বলতে থাকে শ্রীপতি, থানার পাইক-ই হও আর বরকন্দাজই হও, বয়স যখন কম তখন নেশা-ভাঙ্ না করাই ভালো। তা বাবা, এক দণ্ড বসো, আমি বাড়ির ভেতর থেকে হুকো-কল্কেটা নিয়ে আসি। অনেকক্ষণ টানিনি তো, তাই বুকটা আই-ঢাই করছে।

শ্রীপতি লম্বা পা ফেলে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর জয়রাম নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে হাওয়া খেতে থাকে।

একটু পরেই শ্রীপতি কল্কে ছাড়া কেবল হুকোটা হাতে নিয়ে এসে জয়রামের পাশে বসতে বসতে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, বুঝলে বাবা, নিবারণ যে এভাবে বেঘোরে মারা যাবে বুঝতে পারি নাই। মাঝে মাঝে বলতাম, নিবারণ, দিন-কাল বড়ই খারাপ। রাত-বিরেতে এভাবে বাইরে ঘুমানো ভালো না। হেসে বলতো, কী আর হবে? কিন্তু দেখ, শেষ পর্যন্ত তাই হলো। কথা বলতে বলতে চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে ওঠে শ্রীপতির।

আগের দিন রাতে বাড়ির কর্তা খুন হয়েছে। এই মুহূর্তে তার এই বয়স্ক ভগ্নিপোতের পক্ষে সেই প্রসঙ্গে কথা বলাই স্বাভাবিক। তাই জয়রাম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে জিজ্ঞেস করে, তা দত্তমশায়, হুকো আনলেন, কল্কে কোথায়?

দুঃখ ভুলে এবার একগাল হেসে শ্রীপতি বললে, আসছে। আসলে ব্যাপার কি জানো বাবা, এখানে এলে ঐ মেয়েটাই আমাকে তামাক সেজে দেয়। বড়ই ভালো ওর তামাক সাজার হাত।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা চন্মন্ করে ওঠে জয়রামের। চঞ্চল হয়ে ওঠে তার চোখজোড়া। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনহরিণীর চোখের মত একজোড়া কাজলকালো সজল চোখ। জয়রামের প্রথম যৌবনের

অনুভূতিপ্রবণ মনের দরজায় প্রথম আলোর রশ্মি যে ঐ চোখজোড়া থেকেই বিচ্ছুরিত হয়ে অতর্কিতে তার যৌবনোন্মেষ ঘটিয়ে তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল একথা স্বীকার করতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে জয়রাম। কিন্তু সঙ্কোচ সত্ত্বেও সেটাই যে সত্যি তা' সে বুঝতে পারে। সেই পায়ের ছাপের দেখাশোনার চাইতে ঐ চোখজোড়ার আকর্ষণই যে তাকে আজ এখানে টেনে এনেছে এটাও তো অস্বীকার করতে পারে না জয়রাম। ব্যাপারটা যতই নিন্দনীয় হোক, নিজের বিশ বছরের যৌবন-দীপ্ত বিবেকের সঙ্গে এনিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে মোটেই উৎসাহবোধ করে না সে। তাই সেই নারী মূর্তিকে একপলক চোখের দেখা দেখার জন্যে মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে জয়রাম। পিশেমশাইয়ের কল্কে হাতে লাবণ্য এখনই এসে হাজির হবে এখানে।

অবশেষে এলো। কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে ডুরে শাড়ি পরা একটি নারীমূর্তি কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে এলো শ্রীপতির দিকে। তবে সে লাবণ্য নয়, তার ছোট বোন দশ-এগার বছরের বালিকা রাধা।

মনে মনে দারুণ নিরাশ হয় জয়রাম। কাকে সে চাইলো, আর কে এলো!

রাধার হাত থেকে কল্কেটা নিয়ে হুকোর মাথায় বসিয়ে বেশ কয়েকবার টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীপতি রাধাকে বললে, ঠিক্ আছে। এবার তুই যা।

ফিরে যাবার জন্যে রাধা ঘুরে দাঁড়াতেই জয়রাম জিজ্ঞেস করে শ্রীপতিকে, এর তামাক সাজার হাতই বুঝি খুব ভালো, দত্তমশায় ?

—আরে না—না, কথার মধ্যে ভলকে ভলকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে শ্রীপতির মুখ দিয়ে, ও নয়, ওর দিদি লাবণ্য। হ্যাঁরে রাধা, তামাক সাজলো কে রে ?

জয়রামের পাইকের পোশাকের দিকে শঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় রাধা, দিদি।

হেসে বলতে থাকে শ্রীপতি, সে তো প্রথম টানেই বুঝেছি রে। ঐ মেয়েটা ছাড়া এমন তামাক আর কে সাজবে ?

দিদির প্রতি এমন পক্ষপাতিত্বে কিশোরী রাধার মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। সে যে কষ্ট করে গরম কল্কেটা হাতে নিয়ে এলো তার জন্যে তার পিশেমশায় একটা কথাও বললে না। তাই সে অভিমান-ভরা কণ্ঠে জবাব দেয়, আমি তো আনতে চাই নাই। দিদিই তো আনছিল, কিন্তু—। কথাটা শেষ না করেই জয়রামের দিকে তাকিয়ে সে চুপ্ করে।

—ওহো বুঝেছি, হুঁকোর ওপর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলতে থাকে

শ্রীপতি, তুমি বাবা বাইরের লোক, তাই মেয়েটা নিজে না এসে একে দিয়ে পাঠিয়েছে।

রাধা চলে যায়। শ্রীপতি আবার বললে, বড়ই ভাল মেয়েটা। কিন্তু ভগবানের বিচার দেখ একবার। সোয়ামীর ঘরে ঠাঁই হলো না। পড়ে আছে বাপের কাছে। সেই বাপও এভাবে চলে গেল। কথার শেষে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে শ্রীপতি।

সেই মুহূর্তে এত কষ্ট করে এখানে আসাটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় জয়রামের কাছে। সে বুঝতে পারে লাবণ্য তার সামনে বেরোবে না। কাজেই আর সময় নষ্ট না করে একসময় সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে ম্লান কণ্ঠে বললে, আমি এবার চলি, দত্তমশায়। ঐ হাঁড়িগুলোর দিকে একটু নজর রাখবেন।

—তা' আর বলতে। কথার শেষে শ্রীপতিও হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলতে থাকে, কোন চিন্তা নাই। তোমাদিগের এই হাঁড়ি ঠিক এভাবেই থাকবে, বাবা। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা তোমাদিগের হুকুম অমান্যি করে এগুলো ছোঁবে? তোমরা বাবা নিশ্চিন্দি থাকো।

নন্দীবাড়ির উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় জয়রাম। পেছন থেকে শ্রীপতি আবার বললে, আবার এসো গো, বাবা। এইটুকুন সময় তোমাকে কাছে পেয়ে বেশ ভালো লাগলো।

জবাবে ম্লান কণ্ঠে জয়রাম বললে, না দত্তমশায়, আমি হয়তো নাও আসতে পারি। থানায় তো আর আমি একা পাইক নই। হয়তো অন্য কেউ আসবে।

শ্রীপতি আর কিছু বলে না। জয়রাম হাঁটতে থাকে। একবার মনে হয় এত তাড়াতাড়ি থানায় না গিয়ে একবার অর্জুন চৌকিদারের বাড়ি ঘুরে গেলে হতো। তাকে কথা দিয়েছিল জয়রাম। কিন্তু পরক্ষণেই মত পাল্টায়। ভালো লাগে না অন্য কোথাও যেতে। তার চাইতে সোজা থানায় যাওয়াই ভালো।

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই বাঁ দিকে একটা এঁদো পুকুর। নন্দীবাড়ির পুকুর ওটা। পুকুরের পাশেই বাগান। একটা কামরাঙ্গা গাছ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পুকুরের জলের ওপর। তারই একপাশে সিঁড়ির ধাপের মত তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঘাট। পুকুরটা এঁদো হলেও তার জলে যে মাছ আছে তার প্রমাণ জলের ওপর জেগে থাকা কঞ্চির ডগা। মাছ চুরি বন্ধ

করতেই পুকুরের এখানে-ওখানে ঐ বাঁশের কঞ্চির ছড়াছড়ি।

গাঁয়ের মাটির রাস্তা ধরে চলতে চলতে হঠাৎ ঐ ঘাটের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়রাম। ঘাটের সেই তালগাছের গুঁড়ির ওপর স্থির হয়ে বসে রয়েছে লাবণ্য। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে জলের দিকে।

পুকুরের ওপারে লাবণ্য, আর এপাড়ে জয়রাম। বুকের মধ্যে তার জেগে ওঠে হাতুড়ির শব্দ। এভাবে এই পরিবেশে একটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকা যে ঘোরতর অন্যায় সেই বোধ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সেইমুহূর্তে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে পারে না জয়রাম। কে যেন তার পা দু'খানাকে বেঁধে রেখেছে। সেই বাঁধন কাটিয়ে সেখান থেকে সরে যাবার সাধ্য যেন তার নেই।

জয়রাম এভাবে কতক্ষণ লাবণ্যর দিকে তাকিয়েছিল তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় জয়রামের দিকে চোখ পড়ে লাবণ্যর। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার কয়েকমুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে জয়রামের দিকে। তার সেই দৃষ্টিতে যেমনি ছিল না কোন পরিচিতের অভিব্যক্তি তেমনি ছিল না কোন অপরিচিতের বিস্ময়। পরিচয়-অপরিচয়ের গণ্ডির বাইরে এক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সে যেন কেবল দেখছিল জয়রামকে। পরক্ষণেই সে মাথা নীচু করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে চলে যায় বাড়ির দিকে।

থানার অন্য কোন পাইক নয়, পরের দিন আবার জয়রামই এসে হাজির হয়েছিল নন্দীবাড়িতে। কেবল সেদিনই নয়, পর পর সাত-আট দিন জয়রামকে আসতে হয়েছিল এখানে। তখনও দেখা নেই বিরজু-রুক্মিনীর। কাজেই এ'কটা দিন চিতলমারী গাঁয়ে ঐ পায়ের ছাপ পাহারা দেয়াই হয়ে উঠেছিল জয়ের অন্যতম কাজ। আর সেই সূত্রে মৃত নিবারণ নন্দীর অন্দরমহলের মানুষগুলোর কাছেও আর অপরিচিত রইলো না জয়রাম। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে জয়ের এই উৎসাহ সেই লাবণ্য কিন্তু প্রায় অপরিচিতই রয়ে গেল। পারতপক্ষে সে প্রায় আসেই না জয়ের সামনে। কেবল একটিমাত্র দিন জয়রাম কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল লাবণ্যর সঙ্গে।

সেদিন বাড়ি ছিল না নিবারণের ভগ্নিপোত শ্রীপতি। তবে সেখানে হাজির ছিল চিতলমারীর চৌকিদার অর্জুন বৈদ্য। নিবারণের বাড়ির উঠোনে সেই বকুলগাছের নীচে বাঁশের মাচায় বসে অর্জুন অনেকক্ষণ গল্প করেছিল জয়রামের সঙ্গে। অবশেষে একসময় অর্জুন চলে যেতেই জয়রাম একা সেই মাচায় বসেছিল চুপ করে।

ঠিক এমনি সময় একবোঝা শুকনো পাটকাঠি নিয়ে উঠোন পেরিয়ে অন্দরের দিকে যাচ্ছিল লাবণ্যর ছোট বোন রাধা। জয়রাম ডাকে তাকে। পাটকাঠির বোঝা নামিয়ে রেখে রাধা কাছে এসে দাঁড়াতে জয়রাম বললে, বড় তেষ্টা পেয়েছে গো। একটু জল খাওয়াতে পারো?

—জল খাবেন? স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করে রাধা, আপনি দাঁড়ান। আমি জল আনছি।

একটু পরেই রাধা চকচকে একটা কাঁসার গ্লাসে একগ্লাস জল এনে জয়রামের হাতে তুলে দেয়। মাটির কলসীর ঠাণ্ডা জল। জয়রাম গ্লাসটা মুখের কাছে তুলতেই উঠোনের কোণে জেগে ওঠে লাবণ্যর কণ্ঠস্বর, খাবেন না—খাবেন না। ও জল খাবেন না।

হকচকিয়ে যায় জয়রাম। গ্লাসটা নামিয়ে বিস্মিত চোখে তাকায় লাবণ্যর দিকে।

লাবণ্য আর কিছু না বলে সোজা চলে আসে সেখানে। চাপা ধমকের সুরে রাধাকে বললে, আমাদের বাড়ির জল আনতে কে বলেছে তোকে?

দিদির কাছে ধমক্ খেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে রাধা বললে, বারে, উনি যে বললে—

—উনি বললে বলেই তুই আনবি? আমাদের মরার অশুচের বাড়ির জল খাওয়ালে পাপ হবে না?

রাধা চুপ্ করে থাকে। জয়রাম কোন কথা না বলে কেবল দু'চোখ ভরে দেখতে থাকে যুবতী লাবণ্যকে। তার কাছে এই মুহূর্তে লাবণ্যর এই সান্নিধ্যটুকুর দাম জলখাওয়ার চাইতে অনেক বেশি।

জয়রামের দৃষ্টির সামনে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে লাবণ্য। গায়ের আঁচলটা টেনে দিয়ে মাথা নীচু করে সে আবার বললে, অশুচ বাড়ির জল খেতে নাই। আমি অন্য জল আনছি।

এতক্ষণে সতর্ক হয় জয়রাম। একটি যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যে শোভন নয় তা' বুঝতে পারে। তাই সে মৃদু হেসে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে বললে, কেন, অশুচ বাড়ির জল খেতে নাই কেন?

তেমনি মাথা নীচু করে জবাব দেয় লাবণ্য, পাপ হয়।

—কার পাপ?

—জেনে-শুনে যে দেয়, তার।

—রাধা তো ছেলেমানুষ। ও তো জানতো না।

—জেনে-শুনে যে খায়, তারও।

সেই মুহূর্তে লাবণ্যর সামনে কোন এক ধরনের বীরত্ব প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে জয়রামের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার কোন সুযোগ না পেয়ে নিয়ম ভাঙ্গার বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে সে বলে ওঠে, আমি এসব নিয়ম মানি না।

—নিয়ম না মানলে সবাই খারাপ বলবে। একঘরে হতে হবে। মৃদু কণ্ঠে বললে লাবণ্য।

জবাব দেয় জয়রাম, হতে হয় হবো। তবে বাসুদেবগঞ্জ থানার পাইক আমি। আমাকে একঘরে করা অত সহজ নয়। কথাটা বলেই জয়রাম গ্লাসের সবটুকু জল ঢক্ ঢক্ করে নিজের মুখে ঢেলে গ্লাসটা রাধার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে লাবণ্যর উদ্দেশে বললে, এই তো খেলাম। পাপ যদি হয় তো হোক্।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে মাথা তোলে লাবণ্য। একটু সময় জয়রামের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যে খুঁজতে থাকে। পরক্ষণেই আর কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে চলে যায় অন্দরের দিকে। গ্লাস হাতে রাধাও অনুসরণ করে তার দিদিকে।

মনটা পাখীর পালকের মত হাল্‌কা বোধ হয় জয়রামের। সেদিন থানায় ফেরার পথে মনে মনে কল্পনার ফানুস ওড়াতে থাকে সে। ঘুরে ফিরে কেবলই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাবণ্যর সুন্দর মুখখানা, তার দুটো হরিণ-চোখের শান্ত সুন্দর দৃষ্টি। মনে মনে ফন্দি আঁটে কেমন করে, কোন অজুহাতে পরের দিন নন্দীবাড়িতে এসে সে দু'টো কথা বলবে লাবণ্যর সঙ্গে। কী ধরনের কথা বলবে তারও একদফা মহড়া দিয়ে নেয় মনে মনে।

জয়রাম থানায় ঢুকতেই তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল থানার নায়েব পাঁচ-কড়ির সঙ্গে। হাসিমুখে পাঁচকড়ি বললে, এই যে, ফিরে এসেছো। তা খবর সব ভালো তো? পায়ের ছাপ্‌গুলো সব ঠিক্ আছে তো?

হালকা সুরে জবাব দেয় জয়রাম, হ্যাঁ ঘোষমশায়, সব ঠিক্ আছে। হাঁড়ি-গুলো যেভাবে রেখে এসেছিলেন ঠিক তেমনিই আছে।

—ভালো—ভালো, নিজের মাথার লম্বা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে পাঁচকড়ি হেসে বলতে থাকে, এই ক'টা দিন অনেক কষ্ট করেছ। রোজ রোজ চিতলমারী যাওয়া। কিন্তু কী করবো বলো? ঐ ব্যাটা-বেটীকে তো এতদিন খুঁজেই পাই নাই। যাক্, আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। বিরজু-

রুক্মিনী দু'জনকেই পাওয়া গেছে। কাল সকালেই ওরা যাবে চিতলমারী।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে জয়রামের। তার সব পরিকল্পনাই মাঠে মারা গেল। আর তো ওদিকে যাবার সুযোগ হবে না। তা'ছাড়া কী উপলক্ষ্যেই বা সে আর যেতে পারে নন্দীবাড়িতে? শুধু শুধু যাতায়াত করলে গাঁয়ের লোকেই বা কী বলবে?

পরের দিন সকালে বিরজুকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচকড়ি নন্দীবাড়িতে এসে উপস্থিত হতেই গ্রামময় রটে যায় তাদের আগমন বার্তা। চিতলমারী গাঁয়ে এধরনের তদন্তের কাজ এর আগে আর কেউ দেখেনি। সারা গ্রামে রটে যায় খোঁজী সম্প্রদায়ের লোক বিরজু নাকি নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র জানে। ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনীরা নাকি তার হাতের মুঠোয়। মন্ত্রের জোরে বিরজু নাকি তাদের ডেকে এনে ঐ পায়ের ছাপগুলো দেখায়, আর তারাই তখন ধরে দেয় আসল অপরাধীকে।

একজন দু'জন করে বেশ বড়সড় একটা ভিড় জমে ওঠে নন্দীবাড়িতে। সবার চোখে-মুখেই কৌতূহল। গাঁয়ের ক'য়েকজন অতি কৌতূহলী স্ত্রীলোকও লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে নন্দীবাড়ির অন্দর ঘেঁষে উঠোনের একপাশে এসে জড়ো হয়। সেই সঙ্গে এসে দাঁড়ায় নন্দীবাড়ির স্ত্রীলোকেরাও।

পাঁচকড়ি ও বিরজুকে ঘিরে জনতার ভিড়। তাই স্ত্রীলোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে বিরজুর কাজকর্ম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। কিশোরী রাধা অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল ভিড়ের দিকে এগিয়ে যেতে। একসময় নিবারণের প্রথমপক্ষের স্ত্রী নতুন থান কাপড়ের আড়ালে মুখ ঢেকে ধমকে ওঠে রাধাকে, এমন বেহায়াপনা কেন করছিস লা? ধিঙ্গী মেয়ে, অতগুলোন পুরুষের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াতে লাজ করবে না?

মেয়েদের ভিড়ে লাবণ্যও এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে তার চঞ্চল চোখজোড়া যেন কাকে খুঁজছিল। একসময় নিরাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে অন্দরের দিকে পা বাড়াতেই রাধা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওকি দিদি, চলে যাচ্ছিস যে? দেখবি না?

—ধ্যেৎ, এর আর কী দেখবো? কথাটা বলেই অন্দরে চলে যায় লাবণ্য।

কাজ শুরু করে বিরজু। উবু হয়ে বসে মাটির হাঁড়ি তুলে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই পায়ের ছাপের দিকে। পায়ের পাতার গঠন-ভঙ্গি, আঙুলের বৈশিষ্ট্য, দু'টো আঙুলের ব্যবধান প্রভৃতি প্রতিটি জিনিস সে

পরীক্ষা করতে থাকে মনোযোগ দিয়ে। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ তার ঐ গম্ভীর ধ্যানস্থ ভঙ্গিটিকে মন্ত্রোচ্চারণ বলে ধরে নিয়ে অলৌকিক একটা কিছু ঘটার প্রতীক্ষায় দুরু দুরু বক্ষে স্থির হয়ে থাকে। কেবল একটা ছাপ্ই নয়, প্রতিটি হাঁড়ি তুলে প্রতিটি ছাপ্ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বিরজু। অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে পাঁচকড়িকে বললে, কাজ খতম ঘোষমশায়। এবার চলেন।

কাজ শেষ, কিন্তু অলৌকিক কিছু ঘটলো না। নিরাশার ছায়া পড়লো অনেকের মুখেই। চৌকিদার অর্জুনকে কাছে টেনে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দ্বিজদাস তার কানে কানে কিছু বলতেই অর্জুন পাঁচকড়ি ও বিরজুর সামনে এসে বিনীত কণ্ঠে বললে, আপনাদিগের নজরানা ও সেই সঙ্গে ফল-মূল, তরি-তরকারির একটা বড় সিধে ঝাঁকায় নিয়ে একটা লোক আপনাদিগের সঙ্গে থানায় যাচ্ছে।

পাঁচকড়ি ও বিরজু দু'জনেই হাসিমুখে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে নন্দীবাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ছয়

ইদানীং গোটা চিতলমারী গ্রামের দৃষ্টি নিবদ্ধ নিবারণ নন্দীর বাড়ির দিকে। না, নিবারণের হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে নয়। সেই রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। অপরাধী এখনও ধরা পড়েনি। তবে বিরজু থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, কুছু চিন্তা কোরবেন না, পালমশায়। অপরাধীকে আমি ধরে দিবই। শালা ছিপায়ে থাকবে কোথায়? রুক্মিণীকে লাগিয়েছি কাজে। ও সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

বাস্তবিকই তাই। রুক্মিণী এখন বহুরূপী। ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ রুক্মিণী কখনও গয়লানীর বেশে, কখনও কাঠ-কুড়ুনীর বেশে, কখনও বা শিকড় বাকড়-ওষুধ-মাদুলি বিক্রেতার বেশ ধরে চিতলমারী সহ আশেপাশের গ্রাম চষে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই—খবর জোগাড় করা। নিবারণ নন্দীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা। গৃহস্থের সদরে-অন্দরে সর্বত্রই অবাধ গতি তার। যুবতী রুক্মিণী লাস্যময়ীর বেশে সদরে হানা দিয়ে তীর্যক চোখের ভঙ্গিতে পুরুষের মনের কথা টেনে বের করতে যেমনি ওস্তাদ তেমনি ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের কল্পিত দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে অন্দরের স্ত্রীলোকদের সহানুভূতি আদায় করে আসল খবর জোগাড় করার বিদ্যায়ও সিদ্ধহস্ত।

মৃত নিবারণ নন্দীর বাড়ির দিকে গোটা গ্রামের বিশেষ নজরের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সপ্তপদী স্বামীপরিত্যক্তা যুবতী লাবণ্য সুন্দরী। শ্যামাঙ্গী হলেও

তার চোখমুখের গড়নের মধ্যে ছিল এমন একটা বিশেষত্ব যা নাকি সহজেই পুরুষের মন আকর্ষণ করে। কাজেই লাবণ্যর কাছে তার পতিগৃহের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার খবরে গ্রামের কেউ কেউ বেশ নড়েচড়ে বসেছিল। এ-ব্যাপারে গাঁয়ের যুবকদের চাইতে কিছু প্রবীণের মধ্যেই সাড়া জেগেছিল বেশি। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবার পরেও যখন তারা লাবণ্যকে কোনমতেই করায়ত্ব করে নিজেদের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারলে না তখন তারা খানিকটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। লাবণ্য কেবল ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতিরই ছিল না, সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। তা'ছাড়া নিবারণ নন্দী হাড় কৃপণ হলেও এসব ব্যাপারে ছিল সর্বদাই সতর্ক।

নিবারণের মৃত্যুতে তার সংসার একরকম অভিবাবকহীন হয়ে পড়তেই গাঁয়ের সেই লোভী মানুষগুলোর মনে আবার জেগে উঠেছিল খানিকটা আশার আলো। এবারে হয়তো কব্জা করা যাবে মেয়েটাকে। কিন্তু কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল! থানার এক ছোকরা পাইক এসে হঠাৎ উদয় হলো। প্রথমদিকে ততটা গা করেনি তারা। ভেবেছিল, নিবারণের খুনের ব্যাপারে থানার পাইক-বরকন্দাজদের ঘন ঘন যাতায়াত তো হবেই। কিন্তু তার পরেও যখন তারা টের পেল যে পাইক জয়রাম মাঝে মধ্যেই যাতায়াত শুরু করেছে নন্দীবাড়িতে তখন খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো তারা। থানার পাইক বলে কথা। খোলাখুলি কিছু বলারও সাহস নেই, আবার সহ্যও করা চলে না। তারা স্পষ্টই বুঝতে পারলে অভিবাবকহীন নিবারণের সংসারে জয়রামের প্রধান আকর্ষণ ঐ মেয়েটা।

অশ্বিনী ঘোষাল গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যে একজন। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। বাড়িতে দু'টো স্ত্রী, আর গোটা বারো ছেলে-মেয়ে। নাতি-নাত্‌নাও প্রায় আট-দশটা। দ্বিতীয়পক্ষের ছোট মেয়েটার বয়স মাত্র একবছর। তা'সত্ত্বেও গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা পথে-ঘাটে অশ্বিনীকে দেখলে একটু সামলে চলে। ডাগর বৌ-ঝিদের দিকে হ্যাংলার মত তাকিয়ে থাকতে অশ্বিনীর এখনও বাধে না। এ নিয়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে অশ্বিনীর অনেকবার ঝগড়াও হয়ে গেছে। একবার তো জল পঞ্চায়েত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। অনেকেরই ধারণা কৈবর্তপাড়ার বুড়ো নিতাই কৈবর্তর বিধবা নাতবউটার জলে ডুবে আত্মহত্যার জন্যে নাকি ঐ অশ্বিনীই দায়ী। তখন অশ্বিনার খুব যাতায়াত ছিল নিতাইয়ের বাড়িতে।

এ জাতীয় কেচ্ছা কেবল চিতলমারী কেন, অল্প বিস্তর সব গাঁয়েই আছে।

এসব নিয়ে গাঁয়ের পঞ্চায়তও তেমন মাথা ঘামায় না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোলে তখন সামলানোই মুশকিল। তার চাইতে না-দেখা, না-শোনার ভান করে চুপ্ করে থাকাই ভালো। এ ধরনের সমস্যার সমাধান থানাদারেরও জানা নেই। এক আছে খোদ্ জমিদার। তেমন জমিদার হলে কখনো-সখনো কিছু ফল ফলতেও পারে। কিন্তু অধিকাংশ জমিদার তো নিজেরাই এ দোষে দোষী। বিশেষ করে এ তল্লাটের জমিদার চন্দ্রনারায়ণ তো একটি রত্ন বিশেষ। এ ব্যাপারে তার তেমন কিছু বাছ-বিচারও নেই। দেখতে-শুনতে একটু ভালো হলেই হলো।

সেই অশ্বিনীই একদিন ধরে বসলো চৌকিদার অর্জুন বৈষ্ণকে। যত্ন করে নিজের দাওয়ায় অর্জুনকে বসিয়ে খাতির করে জল-পান খাইয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা অর্জুন, ঐ পাইক ছোকরাটা নন্দীবাড়িতে এত যাতায়াত করে কেন বলো তো ?

কথাবার্তায় একটু সাদা-সিধে হলেও অর্জুন বোকা নয়। তা'ছাড়া অশ্বিনীকেও সে ভালো করে চেনে। তাই সে মনে মনে হেসে মুখে জিজ্ঞেস করে, কার কথা বলছেন গো ঘোষালমশায় ?

—আরে ঐ যে অল্প বয়সী পাইক ছোঁড়াটা। লোমহীন ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে অশ্বিনী।

একগাল হেসে জবাব দেয় অর্জুন, আপনি ঐ জয়রামের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, অশ্বিনী বললে, সব তো মিটে গেছে। এখন ঐ ছোঁড়া শুধু শুধু ঐ বাড়িতে যাতায়াত করে কেন ?

—কে বললে গো মিটে গেছে, ঘোষালমশায় ? বলতে থাকে অর্জুন, খুনী এখনও ধরা পড়ে নাই। তা'ছাড়া বাড়িতে কোন পুরুষ নাই।

বলে ওঠে অশ্বিনী, আমি তো তাই বলছি। বাড়িতে যখন কোন পুরুষ নাই, তখন ঐ বাইরের ছোঁড়াটা——।

অশ্বিনী কথাটা শেষ করার আগেই মনে মনে আবার একটু হেসে অর্জুন বললে, আপনি তো ঠিক্ কথাই বলেছেন, ঘোষালমশায়। বাড়িতে কোন পুরুষ নাই বলেই তো জয়রাম ঘন ঘন ওখানে আসে। খোদ্ থানাদারের হুকুম যে।

—এ্যাঁ—থানাদার! জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত থানাদারের কথা শুনেই থমকে যায় অশ্বিনী।

অর্জুন আবার বললে, হ্যাঁ গো ঘোষালমশায়। একে তো বাড়িতে কোন পুরুষ নাই। তায় আবার এক সোন্দরী সোমখ কন্যে। তাই তো থানাদারের

হুকুমে পাইক জয়রাম মাঝে মধ্যে এসে তাদের দেখাশোনা করে যায়।

এর পরে আর ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে রা-কাঁড়ার সাহস হয়নি অশ্বিনীর। মনে মনে খুব একচোট হেসে অর্জুন চৌকিদার পান চিবোতে চিবোতে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল অশ্বিনীর বাড়ি থেকে।

কথাটা একদিন বেশ জাঁক করে হেসে অর্জুন বলেছিল জয়রামকে। শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে উঠেছিল জয়রাম। বুঝতে পেরেছিল, চিতলমারী গাঁয়ের মানুষ তার সম্পর্কে-যা-ই ভাবুক না কেন, আসল কথাটা ঠিকই টের পেয়েছে ঐ সাদা-সিধে স্বভাবের চৌকিদার অর্জুন বৈদ্য। কিন্তু বুঝতে পেরেও কিছু করার ছিল না জয়রামের। উপলক্ষ নিঃসন্দেহে লাবণ্য। তার আকর্ষণেই নন্দীবাড়িতে তার যাতায়াত। আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ঐ বাড়ির স্ত্রীলোকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। থানার কাজের ফাঁকে সে আসে ওখানে। একটানা পাঁচ-সাতদিন কোন কারণে আসতে না পারলে অনুযোগ শুনতে হয় লাবণ্যর দুই মায়ের কাছে। আসলে খুব তাড়াতাড়ি এই অভিবাবকহীন পরিবারটির প্রধান বল-ভরসা হয়ে উঠেছিল জয়রাম। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে জয়রামের এই যাতায়াত সে কিন্তু জয়রামের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। ইদানীং লাবণ্যর সেই সংকোচ-জড়তা আর নেই। সে কাছে আসে, কথা বলে, মাঝে মাঝে দু'একটা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেও ছাড়ে না জয়রামের সঙ্গে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজের চারিপাশে সর্বদাই সে এমন একটা অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টি করে রাখে যা ভেদ্ করে একচুলও এগিয়ে যাওয়া বিশ বছরের যুবক জয়রামের পক্ষে সম্ভব হয় না। জয়রাম বুঝতে পারে তার এই প্রথম যৌবনের আবেগাকুল মনটা বাঁধা পড়েছে ঐ স্বামীপরিত্যক্তা লাবণ্যর কাছে। লাবণ্য নিজেও যে তা' বুঝতে পারে নি তা'নয়। এমনকি লাবণ্যর নিজের মনের কথাও আভাসে ইঙ্গিতে টের পেয়েছে জয়রাম। কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। কথায় কথায় লাবণ্য একদিন জোর করে নিজের মুখে হাসি ছড়িয়ে হালকা সুরে বলেছিল, জানো ছোট পাইক, স্বামীর ঘর করা কপালে না জুটলেও আমি কিন্তু সধবা। তাই তো এখনও শাঁখা-সিঁদুর পরি। কথার শেষে হাসিমুখের সঙ্গে তার চোখদুটো যে ছল্ ছল্ করে উঠেছিল তা' কিন্তু সেদিন চোখ এড়ায় নি জয়রামের।

থানায় বসেই খবরটা কানে এসেছিল জয়রামের। শীতের দুপুর। থানার সামনের ফাঁকা চত্বরে বসে জটলা করছিল পাইক কানু বৈদ্য, তিনু হালদার, জয়রাম ও বরকন্দাজ বদরুদ্দীন শেখ। এমনি সময় একটি অল্প বয়সী ছেলে কাছে

এসে দাঁড়াতেই জটলা থামিয়ে কামু গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কী চাই ?

—এজ্ঞে—। কথাটা বলতে গিয়েই থেমে যায় ছেলেটি।

—কী বলতে চাও বলে ফেল। কামু জিজ্ঞেস করে আবার।

বিনীত ভঙ্গিতে ছেলেটি আবার বললে, এজ্ঞে, আমি এয়েছি কমলাপুর থেকে।

গ্রামের নাম শুনেই কানদু'টো খাড়া হয়ে ওঠে জয়রামের। ঐ গ্রামেই তো বিয়ে হয়েছে তার বোন তরঙ্গর।

কামু আবার কিছু জিজ্ঞেস করতে যায়, কিন্তু তার আগেই ছেলেটি বলে ওঠে, কমলাপুরের বনবিহারী অধিকারী একটা খবর পাঠিয়েছে থানার পাইক জয়রাম সামন্তের কাছে।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে জয়রাম, আমিই জয়রাম সামন্ত। বলো, কী খবর ?

—এজ্ঞে আজ তিন-চার দিন গত হলো আপনার বোনাই গোবিন্দকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সেকি ? বিস্মিত জয়রাম উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও। জয়রাম জিজ্ঞেস করে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে কি ? কোথায় গিয়েছিল সে ?

জবাবে ছেলেটি বললে, আমাদিগের কমলাপুর থেকে চার কোশ দূরে মাহুগার হাট। সেই হাটে গিয়েছিল গরু কিনতে। তারপর থেকেই আর খোঁজ নাই তার। এই ক'দিন আমরা চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। খবর না পেয়ে শেষমেশ অধিকারী মশাই আপনাকে খবর দিতে বললে। তাই এলাম।

বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়রাম। তার আদরের একমাত্র বোন তরঙ্গ। খরচাপাতি করে তার বিয়ে দিয়েছিল জয়রাম। গোবিন্দ ছেলেটি সত্যিই ভালো। একালের ছেলে ছোক্‌রাদের মত তরলমতি নয়। এই বয়সেই বেশ রাশভারি স্বভাবের। বাপ বনবিহারীর কাছ থেকে জমি-জমা দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল সে।

জয়রামকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কামু তার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, ওকি, চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

—কী করবো, খুড়ো ? অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে জয়রাম।

কামুর বদলে এবার জবাব দেয় বদরুদ্দীন, এরকম একটা খবর শুনে চুপ্ করে থাকবি নাকি ? তাই কি অধিকারী মশায় তোর কাছে লোক পাঠিয়েছে ?

—হ্যাঁ, পালমশাইকে বলে একবার কমলাপুর যা। বলতে থাকে কামু, গিয়ে দেখ্ ব্যাপারটা কি? হয়তো বাড়িতে রাগারাগি করে কোথাও চলে গেছে। তেমন বুঝলে এখান থেকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা। এই তো, তিনু রয়েছে। ওকেই নিয়ে যা সঙ্গে।

—আজ তো আর তবে বাড়ি ফিরতে পারবো না খুড়ো, জয়রাম বললে, বাড়িতে মা একা রয়েছে।

জবাব দেয় কামু, চিন্তা করিস্ না। আমারা তো আছি। তোর বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দেব আমরা। তুই এবার রওনা হ, ।

থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষের হুকুম নিয়ে জয়রাম রওনা হয় কমলাপুরের উদ্দেশে। সঙ্গে পাইক তিনু হালদার।

পথে যেতে যেতে চিন্তা-ভাবনায় মনটা ভারি হয়ে ওঠে জয়রামের। দেশ-গাঁয়ের যা অবস্থা তাতে যে কোন সময় যে কোন অঘটনই ঘটতে পারে। কথাটা ভাবতেই ব্যথায় বুকটা টন্‌টন করে ওঠে। তার আদরের বোন তরঙ্গ। কে জানে ভগবান ওর কপালে কী লিখেছেন? তবে, তেমন কিছু নাও তো ঘটতে পারে। হয়তো ঐ কামু খুড়োর কথাই ঠিক্। বাড়িতে ঝগড়া করে হয়তো কোথাও চলে গেছে। সেটাই সম্ভব। গোবিন্দ এমানিতে ভালো হলেও একটু একরোখা প্রকৃতির।

না, ঝগড়াঝাটির নাম গন্ধও নেই। কমলাপুরের বোনাই বাড়ি পৌঁছতেই তরঙ্গর শ্বশুর বনবিহারী ছল্ ছল্ চোখে বললে, না-না, গোবিন্দ আমার তেমন ছেলেই নয় যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন সকাল সকাল স্নান-খাওয়া সেরে আমায় এসে বললে, বাবা, মাহুণ্ডার হাটে যাচ্ছি দু'টো গরু কিনতে। আমি বললাম, ভরা অমাবস্তে আজ। পরের হাটে গেলে হতো না? জবাবে বললে, অমাবস্তে বলে কি আজ মাহুণ্ডার হাট বন্ধ থাকবে? যখন বুঝলাম ছেলেটা কথা শুনবে না তখন বললাম, একা যাস্ না। কাউকে বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে যা। 'দেখি' বলে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর থেকেই আর—। কথাটা শেষ না করেই কেঁদে ওঠে বনবিহারী।

তিনুকে বাইরের ঘরে বসিয়ে জয়রাম অন্দর মহলে পা দিতেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে তরঙ্গর শাশুড়ি বলতে থাকে, এসে পড়েছ বাবা? দেখ একবার খোঁজ-খবর করে। আমার গোবিন্দ তো এমন ছেলে নয় যে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে সে অন্য কোথাও গেছে। আজ চার-চারটা দিন ঘরে উনুন জলে নাই। মনের অবস্থা যে কী তা' একমাত্র ভগবান জানে। তোমার বোন—

ঐ কচি বউটার মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না।

জয়রাম আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ঘরের এককোণে ঘোমটার আড়ালে তরঙ্গ বসে আছে আর মাঝে মাঝে তার শরীরটা নিঃশব্দ কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

খোঁজার পালা শুরু হয় আবার। কমলাপুর গ্রাম থেকে মাসুণ্ডার হাট, এই দীর্ঘ চার ক্রোশ পথের দু'পাশের বন-জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরে দ্বিতীয় দিনে একটা বাদাম গাছের নীচে পাওয়া যায় গোবিন্দর বিকৃত মৃতদেহের একটা অংশ। বাকিটা এ ক'দিনে শেয়াল-শকুনের পেটে গেছে। তার গলায় তখনও জড়িয়ে ছিল একখণ্ড কাপড়ের ফাঁস। পাশে একটা মাটির গর্ত। ঠগীরা গোবিন্দকে হত্যা করে তার পয়সা-কড়ি লুটে নিয়েছিল। তারপর দেহটা মাটিতে পুঁতে ফেললেও শেয়াল-কুকুর মাটি খুঁড়ে সেটা টেনে বের করেছিল।

শোক যতই তীব্র হোক্ তারও শেষ আছে। স্বাভাবিক নিয়মে শোকের তীব্রতা একটু কমতেই অকাল বৈধব্যের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে জয়রামের আদরের বো'ন তরঙ্গ সেই যে এসে দাদার সংসারে ঠাঁই নিলে, আর ফিরে গেল না শ্বশুরবাড়ি। তেরো বছরের কৈশোর জীবনেই স্বামীর সংসারে গৃহধর্মের পালা সাঙ্গ হলো তরঙ্গের। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়রাম তাকে আশ্বাস দিয়ে সেদিন বলেছিল, ভাবনা করিস না। তোর দাদার সংসারে তার নিজের যদি একমুঠো ভাত জোটে তা'হলে তোরও জুটবে।

অবশেষে ফলবতী হলো রুক্মিণীর প্রচেষ্টা। এবাড়ি-ওবাড়ি, এগ্রাম-সেগ্রাম ঘুরতে ঘুরতে শেষে বড়বহেরা গ্রামের বসন্ত সর্দারের বাড়ি এসেই যেন সামান্য আশার আলো চোখে পড়ে তার। গ্রামে বসন্তর সুনাম ছিল না কোন কালেই। নেশা-ভাং করে, আর তার খরচ যোগাতে চুরি ডাকাতি করে বলেই গাঁয়ের লোকের সন্দেহ। তবে বসন্ত বুদ্ধিমান। বসার ডালে কোপ দেয় না। নিজের গ্রামে কোন কিছু করে না। যা করে বাইরে। তার এসব কু-কাজের দোসর তারই প্রতিবেশী মাধাই লস্কর।

গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা একে অন্যের খবর রাখে। সেই সূত্রেই রুক্মিণী জানতে পেরেছিল যে বসন্তর বৌ আহ্লাদী নাকি কিসব জটিল রোগে ভুগছে। আর, তারপরেই রুক্মিণী বসন্তর অন্দরমহলে হানা দেয় গাছের শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবজ বিক্রেতার ছদ্মবেশে। প্রতিবেশীদের কাছে সে আরও জানতে

পেরেছিল যে ইদানীং বসন্তর আর্থিক অবস্থা নাকি খানিকটা ফিরেছে।

প্রতিবেশীদের কথা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ-রুক্মিণী পেয়েছিল আহ্লাদীর পরনে নতুন শাড়ি দেখে। যে সংসারে দু'বেলা হাঁড়ি চড়তো না সেই সংসারের স্ত্রীলোকের পরনে নতুন শাড়ি বাস্তবিকই সন্দেহজনক।

রুক্মিণীর মুখে কথার ফুলঝুরি। সেই ফুলঝুরির ছটায় সে মানুষের, বিশেষ করে গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের মাথা অনায়াসেই ঘুরিয়ে দিতে পারে। আহ্লাদীর রোগের কথা শুনে সমবেদনার সুরে সে বললে, আহা, এমন শক্ত ব্যামো নিয়ে সংসারের সব কাজ-কম্মো করছো তুমি?

—না করে উপায় কি গো? ছেলে-মেয়েগুলোর মুখে দু'বেলা ভাত তো তুলে দিতে হবে? ম্লান সুরে জবাব দেয় আহ্লাদী।

—সাচ্ কথা বলেছো, বলতে থাকে রুক্মিণী, কিন্তু এই শক্ত ব্যামো নিয়ে কাজ-কম্মো করলে যে মরে যাবে। তখন কে দেখবে গো তাদের?

আহ্লাদী জবাব দেয় না। সেই মুহূর্তে সে ভাবতে থাকে তার স্বামী বসন্তের কথা। লোকটা একবার তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আগে একবার কবিরাজ-বদ্যির কথা সে বলেছিল বসন্তকে। শুনে লোকটা মুখ ঝামটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুঃখে অভিমানে আহ্লাদী আর কোনদিন ঐ কথা মুখে আনে নি।

রুক্মিণী আবার বললে, আর তোমার ভয় নাই। আমার কাছে এসব ব্যামো একেবারে জল-ভাত। এর চেয়ে কত শক্ত ব্যামো আমি সারিয়েছি। ঐ যে, চাঁচড় গাঁয়ের পেল্লাদ মুকুজ্জের বেটার বৌ। পুরা একসাল ধরে কত কবরেজ-বদ্যি করলো। কিছুই হলো না। বৌটা দিনে দিনে শুকিয়ে কাঠ। কেউ বলে নজর লেগেছে, কেউ বলে ভূতে ধরেছে—। কথাটা শেষ না করেই রুক্মিণী তার মিশি লাগানো কালো দাঁতের সারি বের করে খিল্ খিল্ করে হাসতে থাকে।

কৌতূহল বেড়ে ওঠে আহ্লাদীর। রুক্মিণীকে থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, তারপর—তারপর কী হলো গো?

—তারপর আর কি? হাসির বেগ কমিয়ে জবাব দেয় রুক্মিণী, আমি এলাম, দাওয়াই দিলাম। ব্যাস্, সাতদিনেই বৌটার গায়ে মাংস লাগলো। মাস পুরোবার আগেই তার গাল দু'খানা যেন পাকা আতা।

—ওমা, তাই নাকি? আহ্লাদীর কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। জবাব দেয় রুক্মিণী, ঝুট্ আমি বলি না গো। বিশ্বাস না হয় তো চাঁচড়ের পেল্লাদ মুকুজ্জেকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

প্রহ্লাদ মুখুজ্জে কে তা' না জানলেও চাঁচড় নামে একটা গ্রাম যে তাদের এই-বড় বহেরার কাছাকাছি আছে তা' আহ্লাদী জানে। তাই সে উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তা'হলে বলছো আমার এই ব্যামোও সারবে?

—আলবৎ সারবে। কথার শেষে রুক্মিণী তার ঝোলা থেকে একটুকরো গাছের শুকনো ছাল বের করে আহ্লাদীর হাতে দিয়ে বললে, শিলে বেঁটে সাতটা বড়ি করবে। কিন্তু—। কথাটা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

—ওকি, থামলে কেন গা?

রুক্মিণী আর জবাব দেয় না। কৌতূহলী আহ্লাদী জিজ্ঞেস করে, দামের কথা ভাবছো নাকি গো?

—আরে না-না, হালকা সুরে বলে ওঠে রুক্মিণী, দামের কথা কে ভাবছে? আগে ব্যামো সারবে তারপর তো দাম। হিমালয়ের সাধুর দাওয়াই। দাম চাইতে মানা। একটা মাত্তর কড়ি দিলেও তা'নিতে হবে। আমি ভাবছি অন্য কথা। বড়ি সাতটা তারপর ছোঁয়াতে হবে—।

—কিসে ছোঁয়াতে হবে? জিজ্ঞেস করে আহ্লাদী।

নিরুৎসাহ কণ্ঠে জবাব দেয় রুক্মিণী, সেটা জোটানোই তো মুশকিল। অনেকেই তা' পারে না, তাই দাওয়াইতে কাজও হয় না।

অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠে আহ্লাদী, আরে বলই না গো, কিসে ছোঁয়াতে হবে?

হাত-মুখ নেড়ে এবার অদ্ভুত একটা ছড়া কাটতে থাকে রুক্মিণী—

হীরা, পান্না, মণি, মুকত্,
নবাব-জাদার গোঁফ খুবসুরত্।
শের, শেয়াল ঔর কুমীরের দাঁত,
এক কান কাটা বান্দরের হাত।
না জোটে তো, নসীবের ফের,
সোনে-বাজু পরপুরুষের।

বিষয়টি ঠিক্ বুঝতে না পেরে আহ্লাদী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে রুক্মিণীর মুখের দিকে। বলতে থাকে রুক্মিণী, যারা ধনী তারা হীরা, পান্না, মণি, মুক্তা বা নবাব-জাদার সুন্দর গোঁফে এই বড়ি ছুঁইয়ে তারপর খাবে। আর যারা বনে জঙ্গলে থাকে তারা খাবে বাঘ, শেয়াল, কুমীরের দাঁতে বা এক কান কাটা

বাঁদরের হাতে ছুঁইয়ে। এর কোনটাই যাদের জুটবে না, তাদের জোগাড় করতে হবে অন্য কোন পুরুষ মানুষের সোনার বাজু। সেই বাজুতে ছুঁইয়ে খেতে হবে এই বড়ি। তাই তো ভাবছি তুমি এর কোন্‌টা পারবে?

রুক্মিণীর কথায় উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আহ্লাদীর। ম্লান স্বরে সে বললে, এসব জোগাড় করবো কোত্থেকে গো?

—কেন, বলে ওঠে রুক্মিণী, এতবড় একটা গাঁয়ে কারুর হাতে কি একখানা সোনার বাজু নাই?

—থাকলেই কি আর সবাই দেয়? আমাদিগে বিশ্বাস করে কে দেবে?

—বেশ তো, গাঁয়ের স্যাঁকরা বাড়ি যাও। ওদের কাছে আলবৎ দু'একখানা সোনার বাজু পাবে।

আহ্লাদী কোন কথা না বলে কি যেন ভাবতে থাকে। তারপর একসময় আক্ষেপের স্বরে বললে, আমাদিগের নেতাই স্যাঁকরার কাছে একখানা ছিল। কিন্তু এতদিনে কি আর সেখানা আছে? বোধহয় গলিয়ে ফেলেছে। আচ্ছা দেখি একবার খোঁজ-খবর করে।

—হ্যাঁ তাই দেখ। মনের আনন্দ চাপা দিয়ে শেকড়-বাকড়ের ঝোলা বন্ধ করতে করতে কৃত্রিম ম্লান মুখে উঠে দাঁড়ায় রুক্মিণী। যাবার আগে আহ্লাদীকে আশ্বাস দিয়ে যায়, ভাবনা-চিন্তা করো না গো। দু' চার দিন পরে আমি আবার আসবো। তুমি যদি না-ই পারো, তখন আমাকেই জোগাড় করে দিতে হবে। আমার দাওয়াই খাইয়ে তোমার ব্যামো আমি ঠিক্ সারিয়ে তুলবো।

দু'চার দিন নয়, পরের দিন সকালেই গোটা বড় বহেরা গ্রামখানা যেন ভেঙে পড়লো বসন্ত সর্দার ও মাধাই লস্করের বাড়িতে। পাইকের পোশাক পরা কানু বৈদ্য ও জয়রামের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে বসন্ত ও মাধাই। গাঁয়ের মানুষের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা। কেউ সঠিক বলতে পারে না কেন ওরা গ্রেপ্তার হলো। গাঁয়ের চৌকিদার হারাধন শক্ত দড়ি দিয়ে বসন্ত ও মাধাইকে পিঠমোড়া করে বাঁধতে ব্যস্ত। এ সম্পর্কে কানু ও জয়রামকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস নেই কারুর। গাঁয়ের মানুষ হারাধন চৌকিদারের কাছে আভাসে ইঙ্গিতে কেবল এটুকুই জানতে পারলে যে খুনের অপরাধে ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বড় বহেরা গ্রামের একপ্রান্তে যখন গ্রেপ্তারের পালা চলছিল তখন অন্যপ্রান্তে নিতাই স্যাঁকরার বাড়িতেও গাঁয়ের লোকের ভিড়। সেখানে তখন চলছিল খানাতল্লাসী। থানার নায়েব পাঁচকড়ি স্বয়ং পাইক তিনু হালদার ও বরকন্দাজ বদরুদ্দীনের সাহায্যে নিতাইয়ের বাক্স-প্যাঁটরা তন্ন তন্ন করে

খুঁজছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পাওয়া গেল না নিবারণ নন্দীর সেই সোনার বাজু। তাতেও কিন্তু রেহাই পেল না নিতাই। হাতে দঁড়ি বাঁধা অবস্থায় তাকেও যেতে হলো বাসুদেবগঞ্জের থানায়।

থানার মেঝেয় উবু হয়ে বসে তিন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। প্রত্যেকের মুখই ম্লান। প্রৌঢ় নিতাই স্যাঁকরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল টপ্ টপ্ করে।

এবার আসরে নামলো খোঁজী বিরজু গোয়ালা নিজের স্ত্রী রুক্মিণীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে।

থানার লম্বা মাটির দাওয়ায় ঢালা হলো কয়েক ঘড়া জল। বসন্ত, মাধাই ও নিতাইকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে পাঁচকড়ি হুকুম দেয়, এই জলকাদার ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে ঐ শুক্‌নো ডাঙ্গায় গিয়ে দাঁড়াও।

হুকুম শুনে বসন্ত ও মাধাই পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও একটা কিছু বোধহয় অনুমান করে তারা। নিতাই কিন্তু মাথা নীচু করেই থাকে। তার বোধহয় তখন একমাত্র চিন্তা এরপরে সে গাঁয়ে মুখ দেখাবে কেমন করে ?

পাঁচকড়ির হুকুম তামিল হতেই তিন আসামীকে নিয়ে যাওয়া হয় থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষর ঘরে। আর এদিকে কাজে লেগে পড়ে বিরজু।

মেঝের উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি পায়ের ছাপ্ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে বিরজু। নন্দীবাড়ির পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য তার মুখস্ত। সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে থাকে এই তিন ব্যক্তির পায়ের ছাপ।

একসময় বিরজুর মুখে ছড়িয়ে পড়ে সাফল্যের হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে সোজা এসে হাজির হয় পুণ্ডরীকাক্ষর ঘরে। পুণ্ডরীক কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে ওঠে বিরজু, এই যে পালমশায়, আসল লোককে ধরতে পেরেছি।

—কে ? কৌতুহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীকাক্ষ।

আঙুল দিয়ে মাধাইকে দেখিয়ে বিরজু বললে, এই লোকটার পায়ের ছাপের সঙ্গেই মিলে গেছে।

দুর্ভাগ্য মাধাইয়ের। নন্দীবাড়ীর খুনের সঙ্গে বসন্ত ও মাধাই দু'জনেই জড়িত থাকলেও নালা পেরোতে গিয়ে মাধাইয়ের পায়ে কাদা লেগেছিল বলে প্রমাণিত হলো যে সে-ই নিবারণের খুন ও বাজু চুরির জন্যে দায়ী। আবার নিতাই স্যাঁকরার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ হলো যে বাজুখানা তাকে বিক্রি করেছিল বসন্ত। সস্তায় পেয়েছিল বলে ঠিকমত খোঁজ-খবর না নিয়েই সেটা কিনেছিল নিতাই।

অপরাধীর বিচারের জন্যে রয়েছে চাঁচড়ের দারোগাই আদালত। সেখানে রয়েছে অভিজ্ঞ বিচারক দারোগা মহম্মদ সুলতান। তিনজন অপরাধীর মধ্যে কে কতটা দায়ী তা' বিচারের ভার তার ওপর। অপরাধীকে শাস্তি দেবার মালিকও সে, আর সাধারণ ক্ষেত্রে সেই শাস্তিই চূড়ান্ত। অবশ্য জমিদারের রাজধানী বাহাদুরপুরে দেওয়ান কেষ্ট দত্তর নিজস্ব এক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার হয়ে থাকে।

অবশেষে তিনজন অপরাধীকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বিচারের জন্যে পাঠানো হলো চাঁচড়ের দারোগাই আদালতে।

সাত

ভয়ানক চাপা স্বভাবের মেয়ে লাবণ্য। কথায় আছে, মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। লাবণ্যর বেলায় কেবল বুক কেন, তার সর্বাঙ্গ ফেটে চৌচির হলেও তার মুখ দিয়ে একটা কথা বের হয় না। সে জানে তার স্বামীগৃহের দরজা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে কোনদিনই আর তার ঠাঁই হবে না। বিয়ের পরে যে ক'টা মাস সে তার স্বামীর সঙ্গে ঘর করবার সুযোগ পেয়েছিল তার মধ্যেও তার স্বামী রজনীকান্ত লাবণ্যর মনের ওপর কোন ছাপ্ ফেলতে পারে নি। আসলে লোকটা ছিল দেহসর্বস্ব উগ্র প্রকৃতির। লাবণ্য তখন নেহাতই বালিকা। সেই বালিকা বয়সে লোকটার আদর সোহাগের ধরন একেবারেই ভালো লাগতো না বালিকা লাবণ্যর। মুখফুটে কিছু বলতে চেষ্টা করলেও লোকটা ধমক্ দিয়ে থামিয়ে দিত তাকে। বলতো, চুপ কর থাক্। আমার মাগ তুই। যা খুশি তাই করবো। যা করতে বলবো তাই করবি। মনে রাখিস তোর জোচ্চোর বাপ আমার বাপকে ফাঁকি দিয়ে তোর বে দিয়েছে। বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো ঘাড ধরে পাঠিয়ে দেব সেই জোচ্চোর বাপের কাছে। এধরনের কথার পরে মুখ বুজে ঐ লোকটার কথামত চলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার। সারাটা মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও দাঁতে দাঁত চেপে সে চুপ্ করেই থাকতো।

মাঝে মাঝে নিজের বাপ নিবারণের ওপরেও রাগ হতো লাবণ্যর। টাকার অঙ্ক অবশ্য কম নয়—দু'কুড়ি। সে তো অনেক টাকা। তবে তার বাবার যখন টাকা আছে তখন এই টাকাটা দিয়ে দিলে ক্ষতি কি হতো?

নিবারণ অবশ্য বলতো অন্য কথা। বিয়ের কথাবার্তায় পণের প্রসঙ্গ নাকি ওঠেই নি। বিয়ের আসরে বসেই নাকি বরের বাপ্ চাপ্ দিয়ে দু'কুড়ি টাকা আদায়ের মতলব করেছিল। অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নিবারণও বিয়ের পরে টাকাটা দিতে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত দেয় নি। বালিকা লাবণ্যর আবার এও মনে হতো, টাকাটা দিলে শশুরবাড়িতে এই গঞ্জনা হয়তো তাকে শুনতে হতো না, কিন্তু স্বামীর এই অত্যাচারের হাত থেকে কি তার রেহাই মিলতো?

শেষের দিকে শশুরবাড়ির আবহাওয়ায় মনটা একেবারে বিষিয়ে উঠেছিল লাবণ্যর। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতো। জোরে কাঁদার উপায় ছিল না, তাহ'লে মারমূর্তি ধারণ করতো তার দজ্জাল শাশুড়ি। অত্যাচার আর গঞ্জনায় সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। দয়া-মায়া-মমতা বলে কোন পদার্থই নেই এদের। উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, আবার রাতে ঐ লোকটার অত্যাচার। অবশেষে একদিন লাবণ্য বাধ্য হয়েই পালিয়ে এসেছিল শশুরবাড়ি থেকে। তবে সেদিন সে বুঝতে পারে নি যে সেটাই ছিল তার অগস্ত্যযাত্রা।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বাপ-মায়ের স্নেহছায়ায় দিনগুলো তার একরকম কেটে গেলেও মাঝে মাঝে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেত লাবণ্যর। ইতদিনে প্রকৃতি লাবণ্যর ওপর তার নিজের কাজ করতে শুরু করেছে। বালিকা লাবণ্য কৈশোর ছাড়িয়ে পা দিয়েছে যৌবনে। অসম্ভব জেনেও লাবণ্যের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপা রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। অনুচিত জেনেও বসন্তের একটানা কোকিলের ডাকের মধ্যে চোখ বুজে শুয়ে থেকে সে অপেক্ষা করতে থাকে সেই রাজপুত্রের জন্যে যে নাকি সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙ্গাবে। অহেতুক বুঝেও গ্রীষ্মের দুপুরে উদাস করা ঘুঘুর ডাকে কোন এক প্রিয়জন হারানোর বেদনা অনুভব করে তার চোখের কোণে জল জমে ওঠে।

সময় সময় আবার সতর্ক হয়ে উঠে নিজেকে শাসনও করে লাবণ্য। ছি-ছি, এসব সে কী ভাবছে, কী কল্পনা করছে? এসব অন্যায়, এসব পাপ। এতে যে মরার পরে নরকেও তার স্থান হবে না। স্বামীসুখ বঞ্চিতা হলেও একদা তার যে বিয়ে হয়েছিল তা' তো মিথ্যে নয়। হিন্দু মেয়ের দু'বার বিয়ে হবার তো উপায় নেই। এতে যে তার পিতৃপুরুষেরও নরকবাস। না-না, এভাবে সে সকলের অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে না। সে আর ভাববে না—এধরনের কথা একেবারেই ভাববে না। কিন্তু কেমন করে নিজের অজ্ঞাতে এসব ভাবনা যে এসে হাজির হয় তাও সে বুঝতে পারে না। নিজের ওপরই রাগ

হয়। কঠিন সংযমে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সংসারের কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চেষ্টা করে।

মাঝে মাঝে অশ্বিনী ঘোষালের মত গাঁয়ের দু'চারজন অসচ্চরিত্র বদ লোকের নজরের মধ্যে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে লাবণ্য। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে ওঠে। বুক কেঁপে ওঠে তার। মনে পড়ে তার সেই স্বামীনামক ব্যক্তিটির কথা। তার মনে হয়, মানুষের চেহারা নিয়ে জন্মালেও ওরা কেউই মানুষ নয়। ওরা কেউই ভালোবাসতে জানে না, ভালোবাসাতেও না। নোংরা পাশবিক প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নেই ওদের মনে।

অবশেষে এলো তার জীবনের প্রচণ্ড দুঃখের দিন—সংসারে তার একমাত্র অবলম্বন বাপ নিবারণের মৃত্যু। আর সেই দুঃখের দিনেই তার দেখা হলো ছোট পাইক জয়রামের সঙ্গে।

জয়রামের চোখে সেদিন কী দেখতে পেয়েছিল লাবণ্য? নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা? তাই-কি সেদিন সে চমকে উঠেছিল? তাই কি একপ্রহর ধরে চেষ্টা করেও সেদিন সে নিজের বুকের কাঁপুনি থামাতে পারেনি? তারপর থেকেই শুরু হলো যুদ্ধ। নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ লাবণ্যর। না-না, এ হতে পারে না। তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের চোখের দৃষ্টির সঙ্গে থানার এই ছোট পাইকের চোখের দৃষ্টির যতই কোন না মিল থাক্, এত বড় পাপ সে কিছুতেই করতে পারে না। বিবাহিতা হিন্দু নারীর অন্য কোন পুরুষকে কেবলমাত্র ভালবাসাও মহা পাপ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যতই সে চেষ্টা করে জয়রামের কথা না ভাবতে, তাকে এড়িয়ে চলতে, ততই যেন জয়রাম চেপে বসে তার মনের মধ্যে। নিজেকে অসহায় বলে মনে হয় লাবণ্যর কাঁদতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু কাঁদবো বললেই তো সংসারে কাঁদা যায় না। তার জন্যে যে অন্যের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন সে তাদের কী বলবে? বলতে পারবে কি যে ঐ জয়রামকে নিয়ে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হেরে যাবার আশঙ্কায় আমি এভাবে কাঁদছি? না, তা' পারবে না লাবণ্য। মরে গেলেও না।

এদিকে ধীরে ধীরে জয়রাম হয়ে উঠেছে লাবণ্যর মায়েদের প্রিয়পাত্র, তার ছোট বোন দু'টির আপনজন। এই পরিস্থিতিতে জয়রামকে এড়িয়ে থাকাও আর সম্ভব নয়। একদিন তো লাবণ্যর বড়মা হেমাঙ্গিনী লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'ওকি লাবি, ঐ ছেলেটা এবাড়িতে এলে তুই এভাবে লুকিয়ে বেড়াস্ কেন লা? অমন সোনার টুকরা ছেলে—এতটুকুন বয়সেই থানার

পাইক—আমাদের কত বল-ভরসা। কোথায় একটুকুন কাছে যাবি, দু'টো কথা বলবি। তা' নয়, কেবল এড়িয়ে চলা। তুই কি গরু চুরি করেছিস যে থানার পাইকের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াস্?

এর কী জবাব দেবে লাবণ্য? কেমন করে সে ঐ প্রৌঢ়া রমণীকে বোঝাবে যে সাধারণ গরুচুরি হলে সে এভাবে পালিয়ে বেড়াতো না। এ যে তার চাইতে অনেক বড় ব্যাপার—মানুষের মন চুরি।

লাবণ্যর নিজের মা সারদাবালা নিজের অসুখ-বিসুখ নিয়েই সর্বদা বিব্রত। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পরে সে প্রায় বিছানা নিয়েছে। তবুও সেও মাঝে মাঝে রোগ-যন্ত্রণায় উঃ-আঃ করতে করতে লাবণ্যকে বলে, ছেলেটা আসে। আমি তো কিছু দেখতে শুনতে পারি না। দিদি আর তুই আছিস। ছেলেটার যেন অযত্ন না হয়। কথার শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে আক্ষেপের সুরে আবার বলে, নিজের পেটে তো আর ছেলে ধরতে পারলাম না!

অবশেষে পদ্ধতি পাল্টাতে বাধ্য হলো লাবণ্য। বুঝতে পারলে, এভাবে এড়িয়ে চললে ফল উল্টোই হবে। তার চাইতে সহজভাবে মেলামেশা করাই ভালো। তার ছোট বোন দু'টো যে ভাবে চলে সেও সেভাবেই চলবে। তাই সে গোটা ব্যাপারটাকে হাল্‌কাভাবে নিয়ে জয়রামের কাছাকাছি আসতে শুরু করলো। কিন্তু সর্বদাই একটা আবরণ দিয়ে নিজেকে এমন ভাবে ঘিরে রাখে যা ভেদ্ করা জয়রামের পক্ষে সম্ভব হয় না।

লাবণ্যর এজাতীয় আচরণে প্রথম প্রথম বিস্মিত হতো জয়রাম। তার এই স্বাভাবিকতাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে হতো। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতো, একি লাবণ্যর আত্মরক্ষার কোন কৌশল, নাকি আত্মদানের কোন পদ্ধতি? সরলতার আড়ালে এ কী কঠিন খেলা শুরু করেছে সে? কাছে এসেও কেন দূরে থাকতে চাইছে? তা'হলে কি সে তার স্বামীকে এখনও ভুলতে পারছে না। তাই কি সে আড়ালে মাঝে মধ্যেই তাকে শোনায়, বুঝলে ছোট পাইক, আমি কিন্তু এখনও সধবা।

পাংশুটির 'মাঝি বাড়ি' বলতে একমাত্র লোচনদাস মাঝির বাড়িটিকেই বোঝায়। মস্তবড় আটচালা বাড়ি লোচনদাসের। অবশ্য বাড়িটি তৈরি করিয়েছিল লোচনদাসের বাবা ভগবানদাস। ইচ্ছে ছিল বৃদ্ধ বয়সে ভগবানদাস নিজের এই গ্রামেই এসে থাকবে। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। গাঁয়ের বামুন-কায়েতদের বিরোধিতায় সে আর ফিরে আসেনি পাংশুটিতে। আর,

এই বিরোধিতার একমাত্র কারণ তার জাত।

করিৎকর্মা পুরুষ ভগবানদাস। পাংশুটি গাঁয়ে একমাত্র বসতবাড়িটুকু ছাড়া তার একছটাক জমি-জমাও ছিল না। কাজেই সংসার চালাতে তাকে যেতে হয়েছিল মেদিনীপুর। ভগবানদাসের নৌকা তৈরির নক্সার হাত ছিল চমৎকার। মেদিনীপুর অঞ্চলের তমলুকের কাছাকাছি সমুদ্রতটে স্থানীয় লোকের নৌকা তৈরির যে ব্যবসা ছিল সেখানেই নক্সাকারের কাজ করতো ভগবানদাস। একাই থাকতো সেখানে। আর, তার পরিবার পরিজনেরা থাকতো পাংশুটিতে। নিজের কর্মক্ষমতা ও অধ্যাবসায়ে অল্পদিনেই সে শুরু করলে নিজের নৌকা তৈরির ব্যবসা। গোটা বাংলামুলুকে ভগবানদাসের সুনামও ছড়িয়ে পড়লো। ছোট ডিঙ্গি নৌকা থেকে শুরু করে ধনীর প্রমোদভ্রমণের ময়ূরপঙ্খী, এমনকি দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের ছোটখাটো বাণিজ্যপোতও তৈরি হতো ভগবানদাসের কারখানায়। ধনী ভগবানদাস ততদিনে তমলুক অঞ্চলের বাসিন্দা। কিন্তু তাই বলে সে তার জন্মভূমি পাংশুটিকে ভোলে নি। বৃদ্ধবয়সে আপন গ্রামে বসবাস করবে বলে মস্তবড় বাড়ি বানিয়েছিল। তৈরি করিয়েছিল দেবালয়। গাঁয়ের মানুষের জলকষ্ট দূর করতে কাটিয়েছিল পুকুর।

গাঁয়ের উচ্চবর্ণের মানুষেরা কিন্তু তার এই সৎকার্যকে ভালো চোখে দেখে নি। কী, মাঝির পো'র এত পয়সার দেমাক! কাঠের সঙ্গে কাঠ জুড়ে ডিঙ্গি নৌকা বানিয়ে লোকটা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে! পুকুর খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজ নিঃসন্দেহে পুণ্যের কাজ হলেও এজন্যে গাঁয়ের বামুন-কায়েতদের কাছ থেকে সামান্য একটা মৌখিক অনুমতি নেবার প্রয়োজনও সে বোধ করে নি! বেশ তো, দেখা যাক্, গাঁয়ের কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করে, ঐ মন্দিরে পূজো দেয়।

ব্যাপার দেখে ভগবানদাস তো থ'। ইচ্ছে করলে সে এর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগতে পারতো। গাঁয়ের নিম্নবর্ণীয়দের এক করে উচ্চবর্ণদের বিরোধিতা করতে পারতো। কিন্তু সে পথে যায় নি ভগবানদাস। কী লাভ এসব দলাদলি ঝগড়া-কাজিয়া করে? সে নিজে তো এখন মেদিনীপুরের বাসিন্দা। আর নিম্নবর্ণীয়দের যখন এই গাঁয়েই চিরকাল বাস করতে হবে তখন তাদের সঙ্গে সমাজের উচ্চবর্ণের মাতব্বরদের ঝগড়া বাঁধিয়ে কী লাভ? তার চাইতে তার নিজের পক্ষে এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

পাংশুটির বাড়ি-ঘর পড়ে রইলো ভগবানদাসের। পড়ে রইলো পুকুর,

দেবমন্দির। ইচ্ছে ছিল গ্রামের ভাঙ্গা পথঘাট সারিয়ে তুলবে, কয়েকটা নতুন রাস্তা তৈরি করাবে গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্যে। সে কাজেও আর হাত পড়লো না। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ভগবানদাস চলে গেল মেদিনীপুর।

তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে। ভগবানদাসের মৃত্যুর পরে তার ছেলে লোচনদাস এখন নৌকা তৈরির কারখানার মালিক। বাপের মত তারও আপন গ্রামের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সে ছিল অনেক বাস্তববাদী। গ্রামের মানুষের মঙ্গলসাধন করে পুণ্য অর্জন করাটাকে সে একেবারেই আমল দিলে না। তার বদলে বাড়িখানাকে মেরামত করিয়ে মাঝে মাঝে সপরিবারে গাঁয়ে এসে বসবাস করতে শুরু করলে গাঁয়ের আর পাঁচজন অধিবাসীর মত। ততদিনে কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীষ্মের শুক্‌নো দিনে গ্রামবাসীরা ভগবানদাসের পুকুরের জলই ব্যবহার করতে শুরু করেছে। গাঁয়ের পুণ্যলোভী মহিলারাও পালাপার্বণে তারই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পুজো দিতে শুরু করেছে।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অনেক সময় অনেক কিছুই ভুলে যায়। ধীরে ধীরে ভগবানদাসের সেই অপরাধের কথা গাঁয়ের উচ্চবর্ণদের মধ্যেও অনেকে ভুলে গেছে। পুকুর, মন্দির এখন যেন তাদেরই সম্পত্তি। এগুলোর দেখা শোনার ভার এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। বুদ্ধিমান লোচনদাস এ নিয়ে কখনও টুঁশব্দটিও করে নি। বরঞ্চ গাঁয়ের কেউ কেউ মাঝে মধ্যে এই প্রসঙ্গ টেনে ধনী লোচনদাসকে খুশি করতে চাইলে লোচনদাস বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দেয়, দেখেন, আমার বাবা এককালে গাঁয়ে কি করেছিল না-করেছিল তা' নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমিও আপনাদিগের মত এই গাঁয়েরই মানুষ। ব্যবসাপত্তর করি বাইরে, মাঝে মাঝে মন চাইলে এখানে এসে থাকি। পাঁচজনের সঙ্গে আমার কেবল এইটুকুনই সম্পর্ক।

ভগবানদাসের আমল আর নেই। জাতের বিচার করে নিজের পায়ে কুড়ুলমারা যে নিদারুণ বোকামি তা' এখন গাঁয়ের সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। লোচনদাস ছোট জাতের হলেও তার পয়সা আছে। তাই তাকে কোনমতে পঞ্চায়েত সভায় টেনে আনতে পারলে যে নিজেদেরই লাভ এটা বুঝতে এখন আর অসুবিধা হয় না তাদের। সেই কথা মনে রেখেই একদিন গাঁয়ের মাতব্বরেরা পঞ্চায়েত-প্রধান শ্যাম ভট্‌চাজের নেতৃত্বে এসে হাজির হয় লোচনদাসের বাড়িতে।

গ্রামের এতগুলো মাথাকে হঠাৎ নিজের বাড়িতে উপস্থিত হতে দেখে প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে যায় লোচনদাস। পরক্ষণেই পরনের কাঁপড়ের খুঁটখানা

গলায় জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে তাদের প্রণাম করে বললে, আপনাদিগের পায়ের ধুলায় আজ আমার বাড়ি পবিত্র হলো গো, মশায়রা।

লোচনদাসের হুকুমে বাড়ির ভেতর থেকে মাদুর আসে অভ্যাগতদের বসবার জন্যে। আসে বামুন, কায়েতের জন্যে আলাদা হুঁকো, তামাক ও পান।

লোচনদাসের বিনয়ে অভ্যাগতরা সবাই খুশি। মনে মনে তরা ভাবে, বাপ-ছেলেতে কত তফাৎ। লোচনদাস আসন পিঁড়ি হয়ে একটু দূরে মেঝেয় বসে জোড়হাতে গলবস্ত্র হয়ে বিনীত কণ্ঠে বললে, এবার হুকুম করেন, মশাইরা।

প্রথমেই কাজের কথা না পেড়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাঁ-হাতে হুঁকোর মুখ মুছে সেটা আর একজন বামুনের হাতে দিতে দিতে সমাজপতি শ্যাম ভট্‌চাজ বললে, বাবা লোচন, এবার অনেকদিন পরে এলে, তাই এলাম তোমার একটুকুন খোঁজ-খবর নিতে। বল এবার, তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে, বল।

বিগলিত কণ্ঠে জবাব দেয় লোচনদাস, আপনাদিগের আশীর্বাদে ভালই চলছে, ভট্‌চাজমশায়। কাজের চাপ বড়ই বেশি। আমাদিগের এই পাংশুটি গাঁয়ের জনাকয়েক নক্সাকার, ছুতোর, কামারকে তো আমি আগেই আমার কারখানায় নিয়েছি। এ গাঁয়ে আর তো তেমন ভালো মিস্ত্রি দেখি না। তাই ভাবছি, এবার ফিরে যাবার সময় সন্ধান করে অন্য গাঁ থেকে কিছু লোক নিয়ে যাবো।

—ভালো—ভালো, বলে ওঠে শ্যাম ভট্‌চাজ, তোমার তো বিরাট নৌকা তৈরির কারখানা। ঐ কারখানায় যদি গাঁয়ের কিছু লোকের পেটের অন্ন জোটে তা'হলে তো আনন্দেরই কথা।

মৃদু হেসে জবাব দেয় লোচন, আজ্ঞে কেবল নৌকাই নয়, আমার কারখানায় এখন জাহাজও তৈরি হয়।

—জাহাজ! মাতব্বরেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলতে থাকে লোচন, আপনাদিগের আশীর্বাদে আটচল্লিশ দাঁড়ের জাহাজও তৈরি করি।

প্রৌঢ় সনাতন চক্কোত্তি একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে, সেসব তো শুনি আরাকানী জল-ডাকাতগুলো নাকি বেশি দামে খরিদ করে নিয়ে যায়।

একটু সতর্ক হয়ে ওঠে লোচনদাস। বুঝতে পারে, সুযোগ পেলে এরা তাকে তার বাড়িতে বসে হেনস্থা করতেও ছাড়বে না। তাই সে তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, তা, মিছে বলেন নাই, ঠাকুরমশায়। বাজারে ধান-চাল বিকোয়, খরিদ

করে চোর-সাধু সবাই। তবে আমার তৈরি নৌকা-জাহাজ ব্যাপারী, জমিদারও খরিদ করে। আমার বাবার আমলে তো মুর্শিদাবাদের নবাবের নৌবহরেও কিছু কিছু চালান যেতো। কোম্পানীর রাজত্বে সেসব তো এখন বন্ধ।

আলোচনার ধরনকে স্বাভাবিক করে তুলতে শ্যাম ভট্চাজ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, কেন বাবা লোচন, ইংরাজ কোম্পানী বুঝি তোমাদিগের কাছ থেকে জাহাজ, নৌকা খরিদ না করে নিজেদের দেশ থেকেই ওগুলো আমদানী করে?

—না ভট্চাজ মশায়, জবাব দেয় লোচনদাস, বড় বড় জাহাজ ওদের দেশ থেকেই আসে, আর বাকিগুলো এদেশেই তৈরি করে। হুগলী নদীর পাড়ে কোম্পানী যে কলিকাতা বন্দর বানিয়েছে ওখানেই এক সাহেব, কি যেন নাম তার—গিল—গিলবার্ট এক মস্ত নৌকা-জাহাজ তৈরির কারখানা ফেঁদে বসেছে।

এই সময় রতন দত্ত বলে ওঠে, তা লোচনদাস, মেদিনীপুরে তোমার ব্যবসা তো ভালই চলছে। কিন্তু এই পাংশুট গ্রাম থেকে দলে দলে ভালো মিস্ত্রি নিয়ে গিয়ে গ্রামখানাকে যে একেবারে কানা করে তুলেছ। সারা গ্রাম খুঁজলে এখন একজন ভালো মিস্ত্রি পাওয়া যায় না।

লোচনদাস জবাব দেবার আগেই সনাতন অনুযোগের সুরে বলতে থাকে, যা বলেছেন দত্তমশায়। ঐ যে নিমু কামার, তিন পুরুষ ধরে আমাদিগের বাপ-ঠাকুর্দার কাজ করে আসছে। বাদাবনে শেয়ালরাজা। হাঁপড় টানতে জানে না, তবু মস্ত কামার! সেদিন আমার মনিষটাকে দিয়ে খান কয়েক দা-কুঁড়ুল পাঠিয়েছিলাম মেরামত করাতে। বলে কি জানেন দত্তমশায়? বলে, এখন সময় নাই। সাত দিন পরে নিয়ে আসিস। এবার আপনারাই বলেন, গাঁ থেকে দলে দলে মিস্ত্রি মেদিনীপুরে চালান করেছে বলেই না নিমুর মত কামারের এমন আস্পর্দ্ধা!

সনাতন চক্কোত্তি ও রতন দত্তর কথায় একটু বিব্রত বোধকরে সমাজপতি শ্যাম ভট্চাজ। এভাবে আসল কাজটাই বুঝি মাটি হয়ে যায়। তাই সে কিছু বলতে যেতেই লোচনদাস বলে ওঠে, তা, আপনারাই বলেন মশায়রা, ছুতোর-কামারকে মণটাক ধান দিয়ে সম্বৎসর কাজ করানোর দিন কি আর আছে? গাঁ ছেড়ে বাইরে যেতে ওরা তো চাইবেই। আমার কারখানায় না যাবে তো কলিকাতায় সেই গিলবার্ট সাহেবের কারখানায় যাবে। কে ঠেকাবে ওদের?

লোচনদাস থামতেই সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে শ্যাম ভট্চাজ, রাখো তো এসব কথা। এসব বলতে এখানে আসি নাই। হ্যাঁ বাবা লোচন,

এই পাংশুটি গাঁ তো আমাদেরই পাঁচ জনের। এর ভালো তো আমরা সবাই চাই। তাই বলছিলাম কি, গাঁয়ের পঞ্চায়েতের কাজকর্মের দিকে একটুকুন নজর দাও না। আমরা তো ভেবেছি এবার তোমাকে একজন সদস্য করবো।

শ্যাম ভট্‌চাজের কথা শেষ হতেই নিজের নাকে-কানে হাত দিয়ে বলে ওঠে লোচনদাস, এসব কী কথা বলছেন, ভট্‌চাজ মশায়? আমরা ছোট জাত, আমাদিগের কি ওসবে মানায়? আপনারা বামুন-কায়েতরাই গাঁয়ের শিরোমণি। আপনারা থাকতে আমরা হলো পঞ্চায়েতের সদস্য? তা' কি কখনো হয়, ভট্‌চাজ মশায়? লোকে শুনলে কী বলবে? যখন দরকার হবে বলবেন, আপনাদিগের সেবায় কিছু পয়সা কড়ি খরচ করে বরঞ্চ পুণ্য অর্জন করবো।

অনেক বলে কয়েও যখন লোচনদাসকে সদস্য হতে রাজি করানো গেল না তখন তার ঐ পয়সা-কড়ির অঙ্গীকারেই খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ায় শ্যাম ভট্‌চাজ। তার দেখাদেখি অন্য সবাইও উঠে দাঁড়ায়। একটু শুকনো হেসে শ্যাম ভট্‌চাজ আবার বললে, গাঁয়ের পাশে ঐ বাঁওড়ের জল কচুরিপানায় ঢাকা পড়েছে। বড়ই মশার উপদ্রব। তুমি বাবা লোচন যদি কিছু সাহায্য করো তো ওগুলো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে পারি।

বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয় লোচনদাস, এ আর বেশি কথা কি, ভট্‌চাজ মশায়? ঠিক আছে, কাল সকালেই আমি এককুড়ি টাকা পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে।

এক কথায় এককুড়ি টাকা! কত বড় ধনী হলে এভাবে নগদ এককুড়ি টাকা দিয়ে দিতে পারে? পথে যেতে যেতে সেই আলোচনাই করছিল গাঁয়ের মাতব্বরেরা। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে সনাতন চক্কোত্তি এক সময় মন্তব্য করে, টাকার গরম—বুঝলে হে, টাকার গরম!

সনাতনের কথায় অন্য কেউ সায় দেয় না। আর কিছু না বলে পথ চলতে থাকে সনাতন।

সেবার দুর্গাপুজোর মাস দেড়েক আগেই হঠাৎ লোচনদাস সপরিবারে এসে হাজির হলো গাঁয়ে। ধনী ব্যবসায়ী। লোক-লস্কর জিনিস-পত্র অনেক কিছুই এলো সঙ্গে। সনাতন চক্কোত্তির মত জনাকয়েক ঈর্ষাকাতর ব্যক্তি ছাড়া পাংশুটি গাঁয়ের প্রায় সবাই লোচনদাসের এই আগমনে খুশি। হোক্ ছোট জাত, তবুও গাঁয়ের মানুষ তো। তায় আবার প্রচুর অর্থশালী। ধনী ব্যক্তি গাঁয়ে এলে গাঁয়ের অনেকেই উপকৃত হয় নানাভাবে।

সেদিন জনাকয়েক সঙ্গী নিয়ে লোচনদাস সমাজপতি শ্যাম ভট্‌চাজের

বাড়ি এসে উপস্থিত হতেই শ্যাম বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, একি লোচনবাবাজী যে! এসো—এসো, ঘরে এসো।

সঙ্গীদের নিয়ে লোচনদাস দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। শ্যাম ভট্‌চাজের কথায় একটু হকচকিয়ে যায় প্রথমে। তারপর ম্লান হেসে বললে, বলছেন কি ভট্‌চা'জ মশায়, আমরা আপনাদিগের ঘরে ঢুকবো?

এতক্ষণে খেয়াল হয় শ্যাম ভট্‌চাজের। ধনী হলেও লোচনদাস যে জলচল নয়, একথাটা মনে ছিল না তার। তাই সে কথাটার সরাসরি জবাব না দিয়ে অন্দরের উদ্দেশে হাঁক দেয়, ওগো, বড় মাদুরটা এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে যাও। আমাদের লোচনদাস এসেছে গো।

সঙ্গীসহ লোচনদাস মাদুরে বসতেই একখানা জলচৌকি টেনে একটু তফাতে বসতে বসতে শ্যাম ভট্‌চাজ তার আগের কথার জের টেনে বলতে থাকে, আর জাত-ধর্ম! যা দিনকাল পড়েছে তাতে জাত-ধর্ম আর থাকছে কোথায় বলো? দেশে এখন ম্লেচ্ছের রাজত্ব। ওরা তো এদেশে কেবল রাজত্বই করবে না, আমাদিগের জাত-ধর্ম কেড়ে নিয়ে তবে ছাড়বে।

হতাশার সুরে কথাগুলো বলে একটু সময় চুপ্ করে থাকে শ্যাম ভট্‌চাজ। তারপর সহসা আবার বলে ওঠে, হ্যাঁ হে লোচন, তা' বাবা এত সাতসকালে কী মনে করে?

—আজ্ঞে, একমুহূর্ত দ্বিধা করে লোচনদাস। তারপর আবার বললে, আজ্ঞে, এসেছি একটা প্রার্থনা নিয়ে।

—কী যে বলো! বলে ওঠে শ্যাম ভট্‌চাজ, তোমার মত একজন ধনী লোক আবার কী প্রার্থনা নিয়ে এসেছো আমার কাছে?

—না—না ভট্‌চাজ মশায়, বলতে থাকে লোচনদাস, ধনীই হই আর রাজাই হই, আপনারা বামুন-কায়েতেরা চিরকাল আমাদের মাথায় থাকবেন। আপনারা হলেন গিয়ে সমাজের মাথা।

—বলো—বলো, কী বলতে চাও, বলো। লোচনদাসের বিনয়ে খুশি হয় শ্যাম ভট্‌চাজ।

জবাব দেয় লোচন, আজ্ঞে মেদিনীপুরে আমার কারখানায় প্রতি সনে ধুমধাম করে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজা করি। ঐ ঠাকুরের আশীর্বাদেই তো করে-কর্মে খাচ্ছি। এই তো সেদিন ভাদ্রের সংক্রান্তিতে কারখানায় পুজা হলো। কত লোক প্রসাদ পেল। তাই আমার ইচ্ছা—

—কী ইচ্ছা তোমার?

—আজ্ঞে, এই গাঁয়েরই মানুষ আমি। কিন্তু গাঁয়ের লোকের মুখে কোনদিন একটু প্রসাদ তুলে দিতে পারলাম না। তাই ভাবছি, আপনি এ গাঁয়ের সমাজপতি। আপনি যদি অনুমতি দেন তো গাঁয়ের মানুষজন সবাইকে ডেকে একদিন একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। আমি ছোট জাত, আমি তো আর কিছু ছুঁতে পারবো না। খরচপত্র আমার। আপনারাই ব্যবস্থা করবেন।

একটা বড়সড় ভোজের ব্যবস্থা। মনে মনে খুশি হয় শ্যাম ভট্‌চাজ। এ গাঁয়ে অনেকদিন তেমন কিছু ঘটে নি। এই উপলক্ষে যদি এমনি একটা কিছু হয় তো ক্ষতি কি?

মনের আনন্দ চেপে শ্যাম ভট্‌চাজ বললেন, তা, বেশ তো। গাঁয়ের মানুষকে খাইয়ে যদি তোমার তৃপ্তি হয় তো ভালো কথা। তবে জানো তো, বামুনদের ভোজ খাওয়ালে ভোজন দক্ষিণা দিতে হয়?

—তা আর জানি নে? বলে ওঠে লোচনদাস, আমি তো ভেবে রেখেছি গাঁয়ের সব বামুনদের এক টাকা করে ভোজন দক্ষিণা দেব।

—এক—টা—কা! বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় হয়ে ওঠে শ্যাম ভট্‌চাজের।

জবাব দেয় লোচনদাস, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভট্‌চাজ মশায়। আপনাদিগের মত বামুনদের সেবা করার সুযোগ কি আর যখন-তখন ঘটে? তাই, সুযোগ যদি পাই তো ঐ একটাকাই ভোজন দক্ষিণা দেব।

আর কিছু না বলে চুপ্ করে থাকে শ্যাম ভট্‌চাজ। ঐ একটাকার ধাক্কা সে তখনও সামলে উঠ্‌তে পারে নি। একটাকা মানে প্রায় সোয়ামণ চাল। গাঁয়ে বামুনের সংখ্যা তো নেহাত কমও নয়। পেটপুরে খাওয়া আর সেই সঙ্গে একটাকা দক্ষিণা। সে তো ইলাহী ব্যাপার।

শ্যাম ভট্‌চাজকে চুপ্ করে থাকতে দেখে লোচনদাস আবার বললে, তা'ছাড়া, আরও একটা কথা ভাবছি ভট্‌চাজ মশায়। ভাবছি, তিন রাত্তির যাত্রাগানের ব্যবস্থা করবো। শুনলাম, নবীগঞ্জের ছেলেরা নাকি খুব ভালো গায়। কী যেন একটা পালা—বলো না হে রামচন্দ্র—

মাঝপথে থেমে গিয়ে লোচনদাস সেই রামচন্দ্রকে কনুই দিয়ে ইশারা করতেই তোত্‌লা রামচন্দ্র 'ধ' অক্ষরটির ওপর জোর দিয়ে জবাব দেয়, ধু—ধু—ধুব।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলে ওঠে লোচনদাস, ধ্রুব। ঐ ধ্রুব পালাটি গেয়ে ওরা নাকি খুব নাম করেছে।

সঙ্কোচের বাঁধ সরিয়ে রামচন্দ্র সোৎসাহে আবার বললে, হ্যাঁ, খু-উ-ব ভালো।

বললে পে—পে—পেত্যয় যাবেন না। যেদিন যে গাঁয়ে ঐ পা—পা—পালা গায় তার প—প পরের দিন সারা গাঁয়ে হাঁ—হাঁ—হাঁড়ি চড়ে না।

রামচন্দ্রের কথায় উপস্থিত সবাই হেসে উঠতেই বিব্রত ভঙ্গিতে চুপ্ করে রামচন্দ্র। বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে আর একজন মৃদু হেসে বললে, আজ্ঞে, আমাদের এই রামু বলছে যে পালাটা নাকি এমন দুঃখের যে পরের দিন গাঁয়ের সবাই উনানে জল ঢেলে কেবল চোখের জল ফেলে।

সারা পাংশুট গাঁয়ে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। একঘেয়ে গ্রাম্য জীবনে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনায় চন্মন্ করে ওঠে সবাই। একে ভোজ, তায় আবার যাত্রা। বামুনদের অতিরিক্ত পাওনা পুরো একটা টাকা দক্ষিণা।

খবরটা শুনে রতন দত্ত বললে, লোকটা বুদ্ধিমান বটে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠে সনাতন চক্কোত্তি, বুদ্ধিমান না হাতি। লোকটা আসল ধড়িবাজ। একটু একটু করে এভাবে জাতে উঠতে চায়।

রতন দত্ত ও সনাতন চক্কোত্তির মত লোকেরা যা-ই বলুক না কেন সারা পাংশুটি গাঁখানা যেন সেই বিশেষ দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

আয়োজন সম্পূর্ণ লোচনদাসের। তার বাড়ির সামনের খোলা মাঠে ভোজের ব্যবস্থা। মাথার ওপর হোগলার ছাউনি। গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে আসছে চাল-ডাল-তেল-নুন। আসছে বোঝা বোঝা তরিতরকারি। অন্দরের দিকে তৈরি হয়েছে হেঁসেল। সেখানে রান্না করবে গাঁয়ের বামুনবাড়ির রন্ধন-নিপুণা স্ত্রীলোকেরা। সেই সূত্রে তারাও পাবে একটা করে সিধে। তার মধ্যে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে থাকবে তেল, সিঁদুর, শাড়ি। যেন সারা পাংশুট জুড়ে এক মস্ত মচ্ছবের প্রস্তুতি।

বেলা দ্বিপ্রহর। নিজের বাড়ির সামনে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মালপত্রের তদারকিতে ব্যস্ত লোচনদাস। হঠাৎ বাইরে একটা হৈ-চৈ। পরক্ষণেই গাঁয়ের চৌকিদার হারাণ মণ্ডল একটা মধ্যবয়সী লোককে টানতে টানতে লোচনদাসের সামনে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, শোনেন গো মাঝিমশায়, এই লোকটা কি বলছে শোনেন।

লোচনদাসের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, কালো বেশ মজবুত চেহারা। মুখের তুলনায় চোখদু'টো একটু ছোট। তামাকের ধোঁয়ায় নীচের ঝুলেপড়া ঠোঁটের ভেতরের দিকে লাল রংয়ে সাদা ছোপ্।

কুতকুতে চোখ মেলে লোচনদাস একবার তাকায় লোকটির দিকে। তার মোটা ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। চৌকিদার হারাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে গো এই লোকটা ?

জবাব দেয় হারাণ, ভিন্ গাঁয়ের। অনেকক্ষণ ধরেই আপনার বাড়ির কাছে ঘুর ঘুর করছিল, আর উঁকি-ঝুঁকি মারছিল।

—কিহে, কে তুই ? জিজ্ঞেস করে লোচনদাস।

লোকটি সভয়ে একবার হারাণের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, আজ্ঞে আমি সোনামুখী গাঁয়ের লোক। এয়েছিলাম আপনার বাড়িতে মচ্ছবের খবর পেয়ে।

—তবে রে ! আবার মিছে কথা ? কথার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ গায়ের জোর দিয়ে ঠাস্ করে লোকটার গালে একটা চড় কষাতেই লোকটা ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নেয়।

—আহাহা, মারছো কেন ? তাড়াতাড়ি বলে ওঠে লোচনদাস।

—কেবল কি মারবো, মাঝিমশায় ? ওকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। কথার শেষে হারাণ লোকটির দিকে আবার এগিয়ে যেতেই লোচনদাস তাড়াতাড়ি বাধা দেয় তাকে।

ভাটারমত চোখ দু'টো ঘুরিয়ে বলতে থাকে হারাণ, একটু আগে আমার কাছে কবুল করলে যে ও নন্দর দলের লোক। এয়েছিল খবরাখবর জোগাড় করতে। আর এখন বলছে কিনা এয়েছে মচ্ছবের খবর পেয়ে !

হারাণের কথায় মুখ শুকিয়ে ওঠে লোচনদাসের। এ অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ খানা গ্রামের ত্রাস নন্দ ডাকাত। তা'হলে কি তার বাড়িতে পয়সা-কড়ি আছে খবর পেয়েই দলের এই লোকটাকে নন্দ সুলুক-সন্ধানে পাঠিয়েছে ?

কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েই কি ভেবে থেমে যায় লোচনদাস। নন্দ ডাকাত তার বাড়ি ডাকাতি করতে পারে, এই কথাটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে তার পরের দিনের আয়োজন সব মাটি। বিশেষ করে রাতে কেউই আসবে না যাত্রা গান শুনতে।

লোকটাকে বন্দী করে রাখা হয় লোচনদাসের একটা ঘরে। লোচনদাস নিজে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় বামুনপাড়ায় পঞ্চায়েত-প্রধান শ্যাম ভট্চাজের কাছে পরামর্শের জন্যে।

শ্যাম ভট্চাজ খেয়ে উঠে মুখ ধুতে যাচ্ছিল। তার কানের খাঁজে গোঁজা ছিল একটা খড়কে। হন্তদন্ত হয়ে লোচনদাসের আগমনে খড়কে ব্যবহারের আর সুযোগ পেল না সে। তাড়াতাড়ি যেমন-তেমন করে মুখে জল দিয়ে

গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এসে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এই অসময়ে কী ব্যাপার হে ?

লোচনদাস ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করে অবশেষে বললে, এখন কী করি বলেন তো, ভট্চাজ মশায় ?

গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় শ্যাম্ ভট্চাজ, শোন বাবা লোচন, কাল তোমার বাড়িতে কাজ। নন্দ ডাকাতকে বিশ্বাস নাই। যদি একটা কিছু করেই বসে তা'হলে তোমাকে বিপাকে পড়তে হবে। লোকটা সত্যি বলছে কি মিথ্যা বলছে তা' যাচাই করার সময় নাই। আমার তো মনে হয় বাবা, লোকটাকে বাসুদেবগঞ্জ থানায় পাঠানোই ভালো। পারো তো তুমি নিজেই একবার যাও।

পাইক-বরকন্দাজদের একটা বিরাট দল নিয়ে কোত্থেকে যেন ফিরছিল থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ। পরনে তার থানাদারের পোশাক। থানার চত্বর ঘোড়াটাকে সহিসের জিম্মায় দিয়ে পুণ্ডরীক সবে নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে ঠিক সেই সময় পাংশুটির চৌকিদার হারাণ মণ্ডল সেই লোকটাকে দঁড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনে হাজির হয়। সঙ্গে লোচনদাসের দু'জন লোক।

ভ্রূ-কুঁচকে পুণ্ডরীক পর্যায়ক্রমে দঁড়ি-বাঁধা লোকটি ও হারাণের দিকে তাকাতেই হারাণ আভূমি নত হয়ে তাকে প্রণাম করে বললে, আজ্ঞে পালমশায়, আমি পাংশুটির চৌকিদার হারাণ মণ্ডল। এই লোকটা নন্দ ডাকাতের দলের। আমাদের গাঁয়ের লোচনদাস মাঝির বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল

—মতলব ? হারাণের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে লোকটির দিকে চোখ রাখে পুণ্ডরীক।

থানাদারের সামনে ভয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছিল লোকটা। পুণ্ডরীকের প্রশ্নে একটা ঢোক গিলে বললে, আজ্ঞে-আজ্ঞে—।

—আজ্ঞে কিরে ? লোকটাকে ধমকে ওঠে পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ, সত্যি করে বল্ কেন ঢুকেছিলি ঐ গাঁয়ে ? কে পাঠিয়েছিল তোকে ?

—আজ্ঞে, নন্দ—নন্দ ডাকাত।

—ডাকাতির মতলবে ?

একমুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে মাথা নেড়ে সায় দেয় লোকটি।

—হরেকৃষ্ণ, কবে ডাকাতি হবে ?

—আজ্ঞে, আজ না কাল।

—হুঁ, হরেকৃষ্ণ—। 'ভ্রূ-কুঁচকে কি যেন চিন্তা করে পুণ্ডরীকাক্ষ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে থানায় ঢোকে লোচনদাস। তার পিছে দু'টো লোকের মাথায়

দু'খানা মস্তবড় চুব্‌ড়ি। একজনের হাতে আবার দড়ি বাঁধা একটা হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা।

চিন্তা থামিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ লোচনদাসের দিকে তাকাতেই লোচনদাস আভূমি নত হয়ে তাকে প্রণাম করে বললে, আজ্ঞে আমিই লোচনদাস মাঝি। আমার বাড়িতে কাল একটা ভোজের ব্যবস্থা করেছিলাম, আর তিন রাত্তির যাত্রাগান। আর আজই কিনা নন্দ ডাকাতের দলের এই লোকটা—।

ততক্ষণে লোকদু'টি চুব্‌ড়ি দু'টো নামিয়ে রেখেছে। পুণ্ডরীক সেই ফল-মূলের চুব্‌ড়ি ও কালো কুচকুচে পাঁঠাটির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে খোসমেজাজে লোচনদাসকে জিজ্ঞেস করে, হরেকৃষ্ণ, তুমি কোন্‌ লোচনদাস হে? পাংশুটি গাঁয়ে তো আর একজন মেদিনীপুরের মস্তবড় ব্যবসায়ী লোচনদাস আছে বলে শুনেছি।

—আজ্ঞে, হেসে জবাব দেয় লোচনদাস, আমিই সেই, পালমশায়।

—আরে-আরে, হরেকৃষ্ণ, আসেন-আসেন, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর পাল্টে যায় পুণ্ডরীকের। 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে আরোহণ করে সে। বলতে থাকে, আপনিই সেই লোচনদাস মাঝি! কী আশ্চর্য, আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু পরিচয় হয় নাই। আহা, এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভিতরে এসে বসেন। হরেকৃষ্ণ, তা মাঝিমশায়, এসব আবার আনতে গেলেন কেন?

—কী যে বলেন, জবাব দেয় লোচনদাস, কী আর এমন এনেছি? থানাদারের কাছে কি খালি হাতে আসা চলে? তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা পেয়েছি তা-ই নিয়ে এলাম।

ব্যবস্থা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সতর্ক করে দেয়া হয় পাংশুটি গাঁয়ের কাছাকাছি ঘাঁটিয়ালদের। কেবল তা-ই নয়, থানা থেকে একদল বাছাই পাইক-বরকন্দাজ পাঠানো হয় লোচনদাসের বাড়িতে। তিন-চার দিন তারা ওখানেই থেকে পাহারা দেবে। তাদের দেখাশোনার ভার লোচনদাসের।

একজন গ্রামবাসীর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে থানা থেকে এসেছে পাইক-বরকন্দাজের দল। তাদের হাতে তরবারি, বর্শা এমনকি গাদা বন্দুকও। এমন একটা কথা গ্রামের কেউ ভাবতেও পারে না। সেই অভাবিত ঘটনাই ঘটেছে লোচনদাসের ক্ষেত্রে। গ্রামের মানুষ তো অবাক। শ্যাম ভট্‌চাজের মত মাত্র দু'চার জন যারা নাকি ব্যাপারটা জানে, তারা চুপ্‌ করেই থাকে। আর সনাতন চক্কোত্তির মত মানুষেরা নীচু জাতের এমন সম্মানে জ্বলেপুড়েমরতে মরতে মন্তব্য করে, সেই কথায় আছে না—ছোটলোকের পয়সা হলে ঘরের বৌ রূপার

খাড়ু পায়ে ঘুঁটে দেয়, এ হচ্ছে গিয়ে তাই। পয়সার গরম, বুঝলে হে।

থানার পাইক-বরকন্দাজ দলের সঙ্গে লোচনদাসের বাড়িতে এসে জয়রাম দারুণ খুশি। ভালো খাওয়া-দাওয়া, ভালো থাকার ব্যবস্থার চাইতেও তার খুশির প্রধান কারণ ঐ যাত্রাগান। অনেকদিন ভালো যাত্রাগানের আসরে বসার সুযোগ হয়নি তার।

যাত্রার আসর লোচনদাসের বাড়িতে। গিস্ গিস্ করছে লোক। খবর পেয়ে পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে এসেছে দর্শকেরা। লোচনদাসের বাড়ির ভোজ পাংগুটি গাঁয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও যাত্রাগানের আসরের দ্বার অবারিত। মূল আসরের মাথায় ছোট সামিয়ানা থাকলেও দর্শকদের মাথা খোলা আকাশের নীচে। আসরের চারিদিকে বাঁশের খুটির সঙ্গে বাঁধা প্রায় মশালের আকারের বড় বড় রেড়ির তেলের প্রদীপ। একপাশে বাঁশের তৈরি চিকের আড়ালে মেয়েরা। মূল আসরখানি ঘিরে বসেছে দর্শকেরা। কেবল সামান্য একফালি সরু পথ রাখা হয়েছে অভিনেতাদের যাতায়াতের জন্যে। সামনের দিকে কচি-কাঁচাদের ভিড়। তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে আসর সরগরম। পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মত কয়েকজন যুবক বাঁশের কঞ্চি হাতে তাদের সামলাতে ব্যস্ত। গাঁয়ের মাতব্বরদের জন্যে বিশেষ বসার ব্যবস্থা। তারই একপাশে বিশেষ অতিথি হিসেবে পাইক-বরকন্দাজের দল। এই মুহূর্তে পাহারার আর কোন প্রয়োজন নেই। নন্দ ডাকাত এমন বোকা নয় যে এই বিরাট জনতার চোখের সামনে ডাকাতি করতে আসবে।

মূল আসরের পাশে ঢোল-করতাল-সানাইয়ের কন্সার্ট দল। জোর কদমে চলছে কনসার্ট। অবশেষে সেই সুর থামতেই ঢং করে পড়লো ঘণ্টা। সঙ্গে সঙ্গে কচি-কাঁচাদের চেঁচামেচি—ঐ আসছে—ঐ আসছে। কিন্তু না, শুরু হতে আরও কিছু সময় বাকি। আরও দু'টো ঘণ্টা পড়বে। তারপরেই আরম্ভ।

অবশেষে শুরু হলো যাত্রা—ধ্রুব পালা। তার আগে সখি বেশী বালকদের নাচ ও গান—যাত্রাপালার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

চলছে যাত্রা। মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ। পালার আকর্ষণ তাদের ভুলিয়েছে সময়-জ্ঞান। মাঝরাত ছাড়িয়ে শেষরাত হতে চলেছে। কচি-কাঁচাদের অনেকেই আসরে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

একমনে যাত্রা দেখছে জয়রাম। সেই মুহূর্তে অন্য পাইক-বরকন্দাজদের মত সেও ভুলে গেছে যে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে নন্দ ডাকাতের দলবল রুখতে। এমনকি গাদাবন্দুক হাতে বরকন্দাজ বদরুদ্দীন পর্যন্ত সবকিছু

ভুলে বিবেকের গানের সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে।

ভারি চমৎকার সুরেলা কণ্ঠ বিবেকের। জয়রাম প্রতিটি দৃশ্যেই চাইছিল তাকে। কেবল জয়রাম কেন, অধিকাংশ দর্শকেরই সেটা'ই মনের কথা। যাত্রার বিবেক যে দর্শক তথা জনতার প্রতিনিধি। যাত্রা দেখতে দেখতে দর্শকদের মনের কথা যে ঐ বিবেকই প্রকাশ করে। তাই তো যাত্রাপালায় বিবেক দর্শকদের বড়ই আপনজন।

গভীর বনে নিদ্রিতা মা সুনীতিকে ফেলে রেখে সাধনা করতে চলেছে ধ্রুব। তার পথ আটকায় এসে বালক কৃষ্ণ। মুখে তার করুণ সুরের গান। সেই-গানে অভিভূত দর্শকবৃন্দ। এমনকি সেই মুহূর্তে জয়রামের চোখদু'টোও সজল হয়ে ওঠে। মাথার পাগড়ির কোণ দিয়ে বদরুদ্দীনও চোখের জল মোছে।

ধ্রুব নেই। ঘুম থেকে জেগে উঠে মা সুনীতির বুক-ফাটা কান্না। সুনীতির সেই কান্নার অংশীদার কয়েকশত দর্শক। এবার আর চোখের কোণে কেবল জল জমা নয়। সুনীতির দুঃখে চিকের আড়ালে চোখের জলে বুকভাসে স্ত্রীলোকদের। তারাও কাঁদে সুনীতির সঙ্গে সঙ্গে। অভিনয় আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেই মুহূর্তে।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দর্শকেরা যখন একাগ্র মনে যাত্রা দেখছে, ঠিক সেই সময় দূরে ভেসে ওঠে ঘোড়ার খুরের শব্দ। সর্বনাশ, নন্দ ডাকাতের দল এলো নাকি? তড়াক করে আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পাইক-বরকন্দাজেরা। কিছু বুঝতে না পেরে সাধারণ দর্শকরা অবাক্ চোখে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে জেগে ওঠে চিৎকার, ডাকাত—ডাকাত! মুহূর্তে যাত্রার আসরে শুরু হয় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। চিকের আড়ালে জেগে ওঠে কান্নার রোল। দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। জয়রাম ও অন্য পাইক-বরকন্দাজেরা তাদের হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ছুটে যায় সেই শব্দ লক্ষ্য করে। আসরের অভিনেতারা ততক্ষণে আসর ছেড়ে পলাতক।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জয়রাম। নন্দ ডাকাত কি ঘোড়ায় চেপে ডাকাতি করতে আসে নাকি? কথাটা কামুকে বলতেই কামুও তার গতিবেগ থামিয়ে বলে ওঠে, তাই তো, একথাটা তো এতক্ষণ ভাবি নাই।

বেড়ে ওঠে ঘোড়ার খুরের সেই শব্দ। একটু পরেই অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসে ছ'জন ঘোড়সওয়ার। তাদের চারজনের দেহে মুর্শিদাবাদের নবাব সৈন্যের পোশাক। আর বাকি দু'জন কোট-প্যান্ট পরা ইংরেজ। পাংশুটি গাঁয়ের চৌহদ্দীতে বোধহয় সেই প্রথম ইংরেজের পদধূলি।

ইংরেজ হলেও তারা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেউ নয়। ব্যবসাদার—নীলের ব্যবসা। তারা এসেছিল কুঠি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জায়গা পছন্দ করতে। ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে বন-বাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন তারা দিশেহারা তখন একজন গ্রাম্য-চাষীর সহায়তায় তারা এসে হাজির হয়েছিল বাহাদুরপুরের রাজবাড়ি অর্থাৎ জমিদার বাড়িতে।

অভ্যর্থনার কোন ত্রুটিই হলো না। খবর পেয়ে স্বয়ং জমিদার চন্দ্রনারায়ণ এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের সামনে। রাজকর্মচারী না হলেও ইংরেজ তো বটে। তার ওপর সঙ্গে রয়েছে নবাবী সৈন্য। এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো এখন ওরাই। কাজেই খাতির যত্ন না করলে চলবে কেন?

রাজবাড়িতে পানাহারের ব্যবস্থায় সাহেব দু'জন দারুণ খুশি। প্রথমে ঠিক ছিল রাতটা এই জমিদার বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন সকালে তারা চলে যাবে মুর্শিদাবাদ। কিন্তু পানাহারের শেষে চোখে রং ধরতেই পাল্টে গেল মতটা। মাঝরাতে সাহেবরা বায়না ধরলে যে তারা তখনই মুর্শিদাবাদ রওনা হবে। অনেক বোঝানো হলো তাদের। বলা হলো দীর্ঘ পথের বিপদ-আপদের কথা। কিন্তু তারা অবিচল। শেষে বাধ্য হয়েই দেওয়ান বেষ্ট দত্ত সেই মাঝরাতে তাদের রওনা করে দিলে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে। অবশেষে পাশুটি গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে লোচনদাসের বাড়ির যাত্রার আসরের আলোর রোশনাই চোখে পড়ে তাদের। সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরায় তারা।

ডাকাতের বদলে দু'জন ইংরেজ ও চারজন নবাবী সৈন্য দেখে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে লোচনদাসের। থিতিয়ে উঠে দর্শকদের হুড়োহুড়ি। তাদের মধ্যে যারা পড়িমরি করে ডাকাতের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল তারা আর ফিরে এলো না। যারা তা পারে নি তারাই কেবল পায়ে পায়ে আবার আসরের দিকে এগিয়ে আসে।

যাত্রার আসরের হাল দেখে বিরক্ত বোধ করে সাহেবরা। ভেবেছিল, নাচ-গান দেখে বাকি রাতটুকু পার করে দিয়ে পরের দিন সকালে তারা রওনা দেবে মুর্শিদাবাদের দিকে। কিন্তু কেন যেন হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গেল।

একে ইংরেজ, তায় আবার সঙ্গে নবাবী সৈন্য। কৃতার্থ ভঙ্গিতে হাত কচলে তাদের অভ্যর্থনা করে লোচনদাস। থানার পাইক-বরকন্দাজের দলও তাদের হাতের অস্ত্র নামিয়ে কৌতূহলী চোখে দেখতে থাকে তাদের। হঠাৎ একজন সাহেব ভাঙ্গা বাংলায় বলে ওঠে, যাট্রা বন্ধ কেন? কী হইয়াছে? চালাও যাট্রা।

সাহেবরা যাত্রা দেখতে চাইছে। কাজেই তাড়াতাড়ি আবার শুরু হলো ভাঙা হাট জোড়া লাগাবার প্রচেষ্টা। ধীরে ধীরে আবার জমে উঠলো যাত্রার আসর। পুত্র ধ্রুবর দুঃখে ক্রন্দনরতা মা সুনীতি আলুথালু বেশে আবার হাজির হলো আসরে। যাত্রাপালার ছিন্ন-গ্রন্থি জোড়া লাগে। আবার অভিভূত হয়ে ওঠে দর্শককুল।

একসময় হঠাৎ একজন সাহেব চেঁচিয়ে ওঠে, অমু কাঁহা? অমু লে-আও।

সাহেবের চিৎকারে আবার ছন্দপতন ঘটে। চমকে ওঠে দর্শকবৃন্দ। আসরের অভিনেতারাও অভিনয় বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে সাহেবদের দিকে।

সাহেব আবার চেঁচাতে থাকে, নো—নো, স্টপ্ দিস ননসেন্স। অমু লে-আও। কিছু বুঝতে না পেরে হাত জোড় করে সাহেবদের সামনে এসে দাঁড়ায় লোচনদাস।

সাহেব দু'টি বড়ই রসিক। ধ্রুব পালার দুঃখ বোধহয় স্পর্শ করতে পারে নি তাদের। তাই উসখুস্ করতে করতে তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল তাদের সেই 'অমু'র জন্যে। কিন্তু যখন দেখলে কিছুতেই আর 'অমু' আসে না, তখন একজন বাধ্য হয়েই 'অমু'র জন্যে সোচ্চার হয়ে উঠলো। আর তাতেই আবার ঘটলে ছন্দপতন।

সাহেবদের দোষ নেই। এর আগে তারা বোধহয় যাত্রাপালায় রামায়ণে কোন কাহিনী দেখে থাকবে। কাহিনীর চরিত্রগুলোর মধ্যে অমু অর্থাৎ হ অর্থাৎ হনুমানের সেই লম্ফঝম্পই স্পর্শ করেছিল তাদের স্পর্শকাতর হৃদয়। ধ্রু পালায় তারা বোধহয় সেই হনুমানের প্রতীক্ষাতেই ছিল। অবশেষে তার দেখা না পেয়েই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল তারা।

ধ্রুব পালায় হনুমান! রামায়ণ-মহাভারত একাকার। কিন্তু উপা নেই। বিলিতি সাহেব দেখতে চেয়েছে। কাজেই যাত্রার অধিকারীর নির্দে সাজঘরে চোখেমুখে রং মেখে হনুমান সাজতে বসে গেল একজন অভিনেতা হনুমানের পোশাক-আশাক মজুতই ছিল পরের দিন 'রাবণ বধ' পালার জন্যে কাজেই সেদিক থেকে অসুবিধা হলো না কিছু।

ধ্রুব-মাতা সুনীতির বরাত বাস্তবিকই মন্দ। পুত্রশোকের ব্যথা দর্শকদে মধ্যে সঞ্চারিত করার সুযোগই পেল না বেচারা। প্রথমবারে বাধা পড়ল বিলিতি সাহেবদের আগমনে। দ্বিতীয়বারে হনুমানের আগমনে।

মস্ত লেজওয়ালা হনুমান আসরে এসে যথেচ্ছ লম্ফঝম্প করছে। সেই স যথেচ্ছভাবে বেজে চলেছে বাদ্যযন্ত্র। সাহেবরা তো মহাখুশি। এইনা হলে কিসে

যাত্রা? অবশেষে একসময় থামলো সেই বাঁদর-নাচ। হাততালি দিয়ে সাহেবরা অভিনন্দন জানালে হনুমানকে। আসর ছেড়ে সাজঘরের দিকে যাবার পথে একজন সাহেব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হনুমানকে দু'হাতে জাপটে ধরে তাকে চুমু খেতে শুরু করে দিলে। বেচারা অভিনেতার তো প্রাণান্তকর অবস্থা। সাহেবের মুখ দিয়ে ভক ভক করে বেরোচ্ছে মদের গন্ধ। অবশেষে সাহেব কী দিয়ে সেই মুহূর্তে হনুমানকে পুরস্কৃত করবে বুঝতে না পেরে নিজের লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা মদের বোতল টেনে বের করে বিস্মিত হনুমানের হাতে গুঁজে দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল নিজের ঘোড়ার দিকে! বাকিরাও অনুসরণ করলে তাকে। যাত্রা দেখা তো হলো। আর এখানে থেকে কী হবে? এবার মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হওয়াই ভালো।

লোচনদাসের বাড়ি যাত্রার আসর বেশ ভালই চলছে। দ্বিতীয় দিন হলো 'রাবণ বধ' পালা। দর্শকেরা দারুণ খুশি। যাত্রাপালা একদিন-দু'দিন হলেও এর রেশ গাঁয়ের আকাশে-বাতাসে থেকে যায় অনেকদিন। কেউ বাড়িতে মায়ের তাড়া খেয়ে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে গাঁয়ের প্রান্তে ক্ষেতের নির্জন আইলে বসে নিজেকে ধ্রুব কল্পনা করে সুনীতি রূপী নিজের মায়ের কাল্পনিক মানসিক ব্যথায় মনে মনে তৃপ্তি বোধ করবে। কেউ বা সন্ধ্যায় গরু তাড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ বীরত্বের আবেগে গরুর পিঠে পাচনের প্রচণ্ড বাড়ি মেরে গর্জে উঠবে—ওরে—ওরে পাপিষ্ঠ রাবণ! এভাবেই বেশ কয়েকমাস ধরে গ্রামে টিঁকে থাকবে যাত্রাপালার রেশ।

অবশেষে তৃতীয় দিন যাত্রাপালা 'সাবিত্রী-সত্যবান' চলাকালীন ঘটলো সেই অঘটন। নন্দ ডাকাত তার দলবল নিয়ে সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়লো লোচনদাসের বাড়ির ওপর। ডাকাতির আগে খবর সংগ্রহে কোথাও হয়তো ত্রুটি ছিল নন্দর। সে জানতো না যে বাসুদেবগঞ্জ থানার একদল পাইক বরকন্দাজকে মোতায়েন করা হয়েছিল পাংশুটি গ্রামের লোচনদাসের বাড়িতে।

এবার আর ঘোড়ার খুরের শব্দ নয়। পায়ে হেঁটেই এসেছিল তারা। যাত্রাপালার দর্শকবৃন্দ কিছু বুঝতে পারার আগেই কুড়ি-পঁচিশ জনের দলটি হা-রে-রে-রে শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে এসে ঘিরে ধরেছিল তাদের। প্রত্যেকেরই তেলকুচকুচে সুঠাম চেহারা। ছোট ধুতি মালকোচা দিয়ে আঁটো-সাঁটো ভঙ্গিতে পরা। একহাতে মশাল, আর অন্যহাতে সড়কি কিম্বা রামদা।

কেবল সাহসী নয়, অসীম সাহসী বলতে হয় নন্দ ডাকাতকে। নইলে জেনে শুনে যাত্রার আসরে একদঙ্গল লোকের মাঝে ডাকাতি করতে আসে! আসলে

নন্দ গ্রামের মানুষকে চেনে। সে জানে যে হা—রে—রে—রে হুঙ্কার শুনে যাত্রার দর্শকদের বড় অংশটিই পড়ি-কি-মরি করে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালাবে। যুবকদের মধ্যে যারা একটু বেশি সাহসী তারা হয়তো চেষ্টা করবে ডাকাত দলকে বাধা দিতে। কিন্তু তারা তো অপ্রস্তুত। বড় জোর একখানা সাপ-তাড়ানো লাঠি হাতে তারা আসবে যাত্রা দেখতে। অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই তারা পাবে না হাতের কাছে। কাজেই সেই নিরস্ত্র লোকগুলোকে কাবু করে ধনী লোচনদাসের বাড়ি লুঠ করতে কোনই অসুবিধে হবে না তাদের। এমনি একটা হিসাব করেই নন্দ ডাকাত তার দলবল নিয়ে এসে চড়াও হয়েছিল।

হিসেব পুরোপুরি ভুল ছিল না নন্দর। আকাশ-বাতাস কাঁপানো সেই হা-রে-রে-রে শব্দ শুনেই অধিকাংশ দর্শক পালালো। চিকের আড়ালে মেয়েরা কেউ পালালো, কেউ বা দাঁত-কপাটি লাগিয়ে পড়ে রইলো সেই চিকের আড়ালেই। কেবলমাত্র কিছু সাহসী যুবক হাতের কাছে যা পেলো তা' নিয়েই মুখোমুখি হলো ডাকাত দলের।

রেসের ঘোড়াকে দৌড়তে না দিলে তার পায়ে নাকি বাত ধরে যায়। যাত্রার আসরে গাদা বন্দুক ও লাঠি হাতে বাসুদেবগঞ্জের পাইক-বরকন্দাজদের অবস্থাও এই ক'দিন ছিল তাই। অবশেষে তাদের কাছে এলো কাজের আহ্বান।

ভিড়ের মধ্যে নন্দ প্রথমটায় থানার পাইক-বরকন্দাজদের অস্তিত্ব ঠিক টের পায়নি। যাত্রার আসরটুকু ছাড়া বাকি জায়গাটা ছিল অন্ধকার। তাই হা—রে—রে—রে শব্দ থামিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্। নড়াচড়া করবি না কেউ। বেয়াদপি করবি তো রামদার কোপে কল্লা নামিয়ে দেব।

নন্দর কণ্ঠস্বর থামাতে না থামাতেই যুবকদের মধ্য থেকে জেকে ওঠে পাইক-বরকন্দাজদের চিৎকার, কী বললি রে হতভাগা! তবে দেখ্, কে কার কল্লা নামায়। কথার সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নন্দ ডাকাতের দলবলের ওপর।

এতক্ষণে হুঁস হয় নন্দর। নন্দ ডাকাতের দলবলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ ধরনের জবাব দেবার হিম্মৎ তো গাঁয়ের সাধারণ মানুষের নেই। পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিশে রয়েছে উর্দিপরা থানার পাইক-বরকন্দাজেরা।

একটু ঘাবড়ে যায় নন্দ। এ অবস্থায় ফিরে যাওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ফিরতে চাইলেও ওরা ফিরতে দেবে

না তাদের। মার-মার শব্দে তেড়ে আসছে ওরা। এইমুহূর্তে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

শুরু হয় লড়াই। দলপতি নন্দর ইঙ্গিতে তৎক্ষণে ডাকাতরা তাদের হাতের মশাল মাটিতে ঘসে নিভিয়ে ফেলেছে। মনে আশা, অন্ধকারে ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মরবে।

বিপদে আপনা থেকেই নেতৃত্ব তৈরি হয়ে যায়। কাউকে বলতে হয় না। থানার পাইক-বরকন্দাজদের নেতা কামু বৈদ্য যখন সেই অন্ধকারে দিশেহারা তখন জয়রাম হঠাৎ চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেয়, হুঁশিয়ার, অন্ধকারের মধ্যে ওরা আমাদেরকে বিপাকে ফেলতে চায়। সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওদের মোকাবেলা করো। কেউ বেশিদূর এগিযে যেও না। হুঁশিয়ার।

চিৎকার—চেঁচামেচি—হৈ-চৈ। যাত্রার আসর যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়। ডাকাতদের সড়কির আঘাতে কয়েকটি যুবক আহত হয়ে পড়ে যেতেই জয়রাম আবার চিৎকার করে ওঠে, কোথায় বদরুদ্দীন চাচা, বন্দুকে বারুদ পুরে তৈরি হও।

নন্দ ডাকাত এতটা আশা করেনি। এদের মধ্যে যে বন্দুক হাতে বরকন্দাজ থাকতে পারে তা' সে ধারণাই করেনি। বন্দুকের সামনে লাঠি, সড়কি তো তুচ্ছ। কাজেই এবার অন্ধকারে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

দলপতির ইঙ্গিতে পিছু হটতে থাকে ডাকাতেরা। আর ঠিক সেইমুহূর্তে আকাশের বিদ্যুৎ শিখার মত আলোর ঝলক্ দিয়ে গর্জে ওঠে বদরুদ্দীনের হাতের বন্দুক। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে একটা ডাকাত।

হঠাৎ একখানা সড়কি উড়ে এসে আঘাত করে জয়রামকে। পালাবার মুহূর্তে একজন ডাকাত ছুঁড়ে মারে তার হাতের সড়কি। মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে মাটির ওপর বসে পড়ে জয়রাম। সড়কির ধারালো ফলাটা এসে গেঁথে যায় তার উরুতে। হাত দিয়ে ফলাটা টেনে বের করতেই নেমে আসে রক্তের ধারা। ছুটে আসে কামু, ছুটে আসে বদরুদ্দীন ও অন্যান্যরা। তারা যখন জয়রামকে নিয়ে ব্যস্ত সেই সুযোগে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় নন্দ ডাকাত তার দলবল নিয়ে। কেবল রেখে যায় তাদের একজন আধমরা সঙ্গীকে।

পরের দিন সকাল হতেই দলে দলে গাঁয়ের লোক এসে হাজির হয় রণক্লান্ত সৈনিকদের দেখতে। খবর যায় বাসুদেবগঞ্জ থানায়। শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয় আহতদের। ঘোড়ার পিঠে চেপে খোদ থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পাল এসে উপস্থিত

হয় পাংশুটি গ্রামে। গাঁয়ের যুবকদের ও সেই সঙ্গে থানার পাইক-বরকন্দাজদের সাহসিকতায় তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে গর্বের হাসি।

আট

সড়কির আঘাতটা তেমন হাল্‌কা ছিল না জয়রামের। চকচকে ফলাটা উরুর মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গিয়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যায় গরুর গাড়িতে চাপিয়ে জয়রামকে যখন ঘুঘুডাঙ্গায় তার বাড়িতে আনা হলো তখন এলোকেশী তার ছেলের দিকে হতভম্ব হয়ে কেবল তাকিয়ে রইলো। মুখ দিয়ে একটা শব্দও তার বের হোল না। দাদার অবস্থা দেখে তরঙ্গ কিন্তু এমন কান্নাকাটি শুরু করলে যে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হলো সেখানে। আর তারপরেই শুরু হলো যথারীতি নানা রকম উপদেশ ও মন্তব্য। কেউ বলে পায়ের ঘা'য়ে এটা লাগতে, কেউ বলে ওটা মালিশ করতে। কেউ বলে এগাঁয়ের নরহরি কবিরাজকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে, কেউ বলে ওগাঁয়ের ভজহরি ওঝাকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিচক্ষণ বলে পরিচিতা কেউ চোখ-মুখ ঘুরিয়ে এলোকেশীকে বোঝায়, বুঝলে গো জয়ের মা, ছেলেকে এবার একটু সামলাও। থানায় পাইক হয়েছে বলে তো জেবনটা আর জমিদারের কাছে বাঁধা রাখে নাই। যখন-তখন ওসব ঠগী-ডাকাতের সামনে না যাওয়াই ভালো। একজন তো মুচকি হেসে বলেই ফেললে, বয়স হয়েছে গো তোমার ব্যাটার। এবার দেখেশুনে একটা বে দিয়ে দাও। দেখবে ওসব দস্যিপনা আর পালাতে পথ পাবে না।

কথাটা নতুন নয় এলোকেশীর কাছে। তরঙ্গর বিয়ের পরে পরেই জয়ের বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল এলোকেশী। বলেছিল, তরি নাই। ঘরে আর আমার মন বসে না। এবার দেখেশুনে একটি ছোট্ট পুতুলের মত বৌ ঘরে আনবো।

মৃদু হেসে বলেছিল জয়, পুতুলের মত বৌ কি এখনই তোমার ঘরে আসবে, মা?

একটু ভেবে জবাব দিয়েছিল এলোকেশী, তা বটে। তা' বিয়েটা তো হয়ে যাক্। বৌ না হয় দু'এক সাল পরেই আসবে।

—তাতে তোমার কি লাভ হবে মা? বলেছিল জয়, দু'এক বছর পরেই না হয় বিয়ে করবো। তরির বিয়েতে ধার-কর্জ তো কম হয় নাই। এই

দু'এক বছরে সেগুলো বরঞ্চ শোধ করতে পারবো।

—তখন তো তোর বয়স আরও বাড়বে। মানানসই ডাগর মেয়ে তখন পাবো কোথায় রে?

—খুব পাবে মা, জবাব দিয়েছিল জয়, এদেশে কি ডাগর মেয়ের অভাব?

জয় যাই বলুক না কেন, এলোকেশী কিন্তু তলে তলে মেয়ে দেখা শুরু করে দিয়েছিল। হয়তো সে এতদিনে একটি পাত্রী ঠিক্ করে ফেলতো, যদিনা এই সময় তরঙ্গ হঠাৎ কপালের সিঁদুর মুছে ফিরে আসতো বাপের বাড়ি।

অবশেষে তরঙ্গর ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে আসতেই জয়ের জন্যে একটি ভালো পাত্রীর খোঁজ আবার শুরু করে দিয়েছিল এলোকেশী। এ বিষয়ে মায়ের চাইতে মেয়ের উৎসাহই বেশি। ঘট্‌কী আসে। তরঙ্গ হাত-মুখ নেড়ে নিজেদের চাহিদার বর্ণনা দেয় তার কাছে। শুনে প্রৌঢ়া ঘটকী গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, এ যে দেখছি রাজকন্যের আবদার ধরলে গো! তা' তোমাদিগের এই সংসারে কোন্ দেশের রাজকন্যে আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে, শুনি?

ঘট্‌কীর স্পষ্ট কথায় রেগে ওঠে তরঙ্গ। এ যে দস্তুর মত অপমান! পরনের কালো পেড়ে ধুতির আচল কোমরে গুঁজে 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গিতে ঝগড়া শুরু করে ঘট্‌কীর সঙ্গে। চোখ-মুখ ঘুরিয়ে সে বলতে থাকে, বল্‌ছো কী গো? আমাদিগের এই সংসারটা খাটো কিসে, শুনি? দাদা আমার দেখতে শুনতে রাজপুত্তুরটি। এই ঘুঘুডাঙ্গা গাঁখানা তল্লাস করে এমনি আর একটি পাত্তর জোগাড় করো তো! তা'ছাড়া দাদা আমার থানার পাইক। বুঝেছ হে, আসল পাইক। জমিদারের নিজের লোক! কত ক্ষেমতা তার! এক চোখ রাঙানিতে গাঁয়ের তাবড় তাবড় মানুষগুলো ভয়ে কাঁপে। এই সংসারে মেয়ে দিতে পারলে পাত্রীর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে, জানো?

ঝগড়ায় প্রৌঢ়া ঘট্‌কীও কম যায় না। সেও মুখে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে জবাব দেয়, কেবল পাত্রীর চোদ্দপুরুষ কেন, আমার চোদ্দপুরুষও উদ্ধার হয়ে যাবে, কী বলো? হুঃ, যতসব লম্বা চওড়া কথা! বুঝলে গো, তুমি তো সেদিনের ছুঁড়ি। এই ক্ষেমা ঘট্‌কীর হাত দিয়ে কত বড় ঘরের ছেলে-মেয়ে পার হয়ে গেছে। তা বাপু, রাজপুত্তুর কিম্বা রাজকন্যের জন্যে বায়না কোথাও শুনি নাই।

—কে তোমাকে রাজকন্যের কথা বলছে? বলতে থাকে তরঙ্গ, আমি তো কেবল একটি ভালো পাত্রীর কথা বলেছি।

—যা বলেছ তা-ই তো যথেষ্ট। গায়ের রং হবে দুধে-আলতায়, মাথার চুল হাঁটু ছাড়াবে, মা লক্ষ্মীর মত হবে মুখের গড়ন। স্বভাব হবে শান্ত, তার উপর আবার কাজের মেয়ে হওয়া চাই। এমন একটি মেয়ের জন্তে তো বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে বরাত দিতে হবে গো।

—কেন, এমন মেয়ে কি পাওয়া যায় না?

—যাবে না কেন? তবে সেই মেয়ে তোমাদিগের সংসারের জন্তে নয়, বুঝলে?

—কেন, আমাদিগের সংসারটা খারাপ কিসে শুনি?

—না-না, খারাপের কথা কে বলছে? তবুও যদি উঠতে-বসতে কথা শোনাতে ঘরে একটা বেধবা ননদ না থাকতো। কথার শেষে আর একটুও অপেক্ষা করে না ক্ষেমা ঘট্‌কী। উঠে দাঁড়িয়ে দুম্-দাম্ পা ফেলে বেরিয়ে যায়। আর পুকুরে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে এসে এলোকেশী দেখে যে ঘট্‌কী নেই। ম্লান মুখে চুপ্ করে বসে আছে তরঙ্গ। তার দু'চোখে জলের ধারা।

ক্ষেমা ঘট্‌কী আর কখনও এবাড়িতে না এলেও পাত্রীর খোঁজ-খবর করা বন্ধ হয়নি এলোকেশীর। নওদা গ্রামের একটি পাত্রী প্রায় পছন্দও হয়েছিল। ক্ষেমা ঘট্‌কীর সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে তরঙ্গর উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়লেও এই পাত্রীটিকে তরঙ্গরও অপছন্দ হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাত্রীর বাপ-খুড়োরাই বেঁকে বসলো। ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়রামের আহত হবার খবরে পিছিয়ে গেল তারা। পাত্র থানার পাইক। নিঃসন্দেহে এটা গৌরবের। কিন্তু এ'কাজে জীবনের আশঙ্কাও কম নয়। আজ যে আহত হয়েছে, কাল হয়তো সে নিহত হবে। সারাজীবন বৈধব্যের জ্বালা পোহাতে হবে মেয়েটাকে।

অসুস্থ জয়রাম বিছানায় শুয়ে একদিন তরঙ্গর মুখে কথাটা শুনে মনে মনে হাঁপ ছেড়ে মুখে একটা হাল্‌কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলেছিল, বুঝলি তরি, মেয়েটার বাপ-খুড়োদের বুদ্ধি আছে। মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বে দিয়ে অসময়ে তাকে কোঁড়ের রাঁড়ি করতে চায় নাই।

জয়রামের কথা শেষ হতেই তরঙ্গ ছুটে এসে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধমকের সুরে বলে ওঠে, চুপ্ করো। কী সব অলক্ষুণে কথা বলছো, দাদা? আমাকে কি তোমরা কোন পাইকের সঙ্গে বে দিয়েছিলে? তা'হলে আমি কেন এভাবে কোঁড়ের রাঁড়ি—। কথাটা আর শেষ করতে পারে না তরঙ্গ। বুকের মাঝখান থেকে ঠেলে-ওঠা এক প্রচণ্ড দুঃখের বানে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে তার। হঠাৎ সে জয়রামের মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কান্না চাপা

দিতে ছুটে পালায় সেখান থেকে। জয়রাম কেবল সজল চোখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তরঙ্গর যাবার পথের দিকে।

বাধার পর বাধা। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কেমন যেন নিরাশ হয়ে ওঠে এলোকেশী। তার চাইতেও বেশি চিন্তা তার জয়রামের হাবভাব দেখে। ও কি সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে চায় না?

কথাটা একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতেই বুকটা ধক্ করে ওঠে জয়রামের। মায়ের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে বললে, না মা, বিয়ে করবো না কেন? তবে এত তাড়াহুড়োর কী আছে? সংসারের হাল একটুকুন ফিরুক। তারপর না হয়—।

—দেখতে দেখতে বেলা যে গড়িয়ে যাচ্ছে, বাবা। কথার শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ্ করে থাকে এলোকেশী।

ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের একমাত্র কবিরাজ নরহরির কাছেই চলছে জয়রামের চিকিৎসা। ইদানীং বাপকে মদত দিতে এগিয়ে এসেছে নরহরির ছেলে ভবানী। এগিয়ে এসেছে না বলে টেনে আনা হয়েছে বলাই ভালো। জয়রামের চাইতে কিছু ছোট ভবানী স্বভাবচরিত্রে ইতিমধ্যেই বাপকে টেক্কা দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। চেহারাটি তার বাস্তবিকই ভালো। মাথায় ঘন কালো বাবড়ি চুল। এই চেহারাকে মূলধন করেই সে গ্রামের আনাচে-কানাচে, পুকুরে মেয়েদের ঘাটে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়। গাঁয়ের মাতব্বরেরা দেখেও দেখে না। একে তো নরহরিকে প্রায় সবাই এড়িয়ে চলতে চায় তার গ্রাম্য দলাদলিতে কূটকৌশলের জন্যে। তার ওপর গাঁয়ের একমাত্র কবিরাজকে চটাতে কেউ সাহস করে না। এমনকি গাঁয়ের সমাজপতি অম্বিকা বাড়ুজ্যেও ভয়ে কিম্বা ভক্তিতে নরহরি সম্পর্কে উদাসীন। ব্যতিক্রম একমাত্র ভকু মিত্তির। সুযোগ পেলেই পঞ্চায়েত সভায় সে আক্রমণ চালায় নরহরির ওপর ভবানীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে। নরহরিও আদর্শ পিতার মত পুত্রের পাপ ঢাকতে ভকুর ওপর পাল্টা আক্রমণের জন্যে তূণে শান দেয়।

নরহরির ইচ্ছে ছিল নিজের কবিরাজি বিদ্যে সে দান করে তার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীকে। কিন্তু সেই দান গ্রহণ করার জন্যে যখন ভবানী একটুও উৎসাহ দেখালে না তখন মনটা বাস্তবিকই খারাপ হয়ে উঠেছিল নরহরির। তার সাত পুরুষের বিদ্যে শেষপর্যন্ত বোধহয় মাঠেই মারা যায়। ভবানীকে বললেও কথা শোনে না, গাল-মন্দ পাড়লেও উল্টে গালাগাল দেয়। সেই ভবানী যখন স্বেচ্ছায় বুড়ো বাপকে মদত দিতে এগিয়ে এলো, তখন পরমেশ্বরকে

ধন্যবাদ জানিয়েছিল নরহরি।

ইদানীং বাপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় ভবানী। গৃহস্থের অন্দরমহলে প্রবেশ করে বাপের চিকিৎসা পদ্ধতি লক্ষ্য করার নামে অন্যদিকে লক্ষ্য রাখে সে। বিশেষ করে লোকটি যদি হয় অল্পবয়সী রোগিনী এবং সুন্দরী তা'হলে তো কথাই নেই। সময় সময় বাপের অজ্ঞাতেও সে যাতায়াত করে সেখানে। নরহরি নিজেও কম ঘোড়েল নয়। পুত্রের চালচলনের অর্থ সে বোঝে। কিন্তু বুঝেও চুপ্ করে থাকে এই আশায় যে এভাবে তার নিজের কবিরাজি বিদ্যের খানিকটা অন্ততঃ সে ঢোকাতে পারবে ভবানীর মগজে।

জয়রামের বাড়িতে বাপের সঙ্গে প্রথমদিন এসেই ভবানীর নজর পড়ে বিধবা তরঙ্গর ওপর। মেয়েটা দেখতে ডানাকাটা পরী না হলেও বেশ তরতাজা। বয়সেও নেহাত ছেলেমানুষ। তার ওপর বিধবা। এমনি ধরনের মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তোলা অনেক সহজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঐ তরঙ্গকে নিয়ে। মেয়েটা যেন কেমন। আকার-ইঙ্গিত একেবারেই বোঝে না। নরহরি কবিরাজ যখন জয়রামের বিছানার পাশে জলচৌকিতে বসে ঝোলা থেকে নানাধরনের বটিকা, সালসা ইত্যাদির মধ্য থেকে সঠিক ওষুধটি বেছে নিতে ব্যস্ত থাকে, ভবানীর একটি চোখ তখন সেই ওষুধের স্তূপের দিকে থাকলেও অন্য চোখটির সাহায্যে সে জরিপ করতে চেষ্টা করে তরঙ্গের কৈশোরোত্তীর্ণ যৌবন। জয়রামের রোগের উপসর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদের অছিলায় কিম্বা তরঙ্গের হাতের ঘটি থেকে ঢালা জলে হাত ধোয়ার মুহূর্তে মুখ-চোখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ভবানী বাজিয়ে নিতে চেষ্টা করে তরঙ্গকে। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটা যেন একখানি শক্ত পাথর। হাত না ছোঁয়ালে তাপ-উত্তাপ বোঝার উপায় নেই। আবার বেশিদূর এগোবার সাহসও নেই ভবানীর। থানার পাইকের বোন! কোথা দিয়ে কী ধরনের বিপাকে জড়িয়ে পড়বে তার ঠিক কি? তার চাইতে একটু রয়ে-সয়ে এগোনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

তরঙ্গ ও লাবণ্য। একজন বালবিধবা, অন্যজন স্বামীপরিত্যক্তা সধবা। দু'জনের মানসিক গঠন ও প্রকৃতিও এক নয়। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে লাবণ্য যেখানে জয়রামের চোখের ভাষার সঠিক অর্থটুকু বুঝতে পেরেও তাকে প্রশ্রয় দিতে একেবারেই নারাজ, সেখানে তরঙ্গ কিন্তু ভুল করে বসলো। ভবানীর মুখের মেকি আবরণকে সত্যি বলে ধরে নিয়ে নিজের বৈধব্যজীবনের অনিশ্চয়তার হাত এড়াতে একটু একটু করে তার দিকেই ঝুঁকতে শুরু করলে।

ব্যাপারটা কিন্তু মাতা-পুত্র কারুরই নজরে পড়েনি। সুস্থ হয়ে ওঠার পরে জয়রাম আবার থানায় যাতায়াত শুরু করলে, আর এলোকেশী এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেনি বলে বালবিধবা কন্যার ওপর বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি।

দীর্ঘ একটি মাস পরে জয়রাম যেদিন প্রথম চিতলমারীর নন্দীবাড়িতে এসে হাজির হলো সেদিন একমাত্র লাবণ্য ছাড়া বাড়ির অন্য সবাই এসে ঘিরে ধরলে তাকে। নন্দ ডাকাতের দলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জয়রাম যে আহত হয়েছিল সে খবর তারাও লোকমুখে শুনেছে। কিন্তু শুনেও কিছু করার ছিল না তাদের। এমনকি পাছে কেউ কিছু ভাবে সেই ভয়ে ঘুঘুডাঙ্গায় লোক পাঠিয়ে অসুস্থ ছেলেটার একটা খবর পর্যন্ত তারা নিতে পারেনি। কেবলমাত্র জয়রাম যে একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে, এই খবরটুকুতেই এতদিন তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। অবশেষে জয়রামকে কাছে পেয়ে লাবণ্যর দুই-মা হেমাঙ্গিনী ও সারদাবালা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, ভগমান বাঁচিয়েছে তোমাকে। ভেবে ভেবে আমরা তো অস্থির। এদিকে আমাদের লাবি তো—।

লাবণ্যর বড় মা হেমাঙ্গিনী কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেও কিশোরী রাধা অতশত না ভেবে বলেই ফেলে, জানো পাইকদাদা, তোমার অসুখের খবর শুনে দিদি তো তিন-চার দিন উপোস করেই—।

কথাটা শেষ করার আগেই রাধাকে ধমকে ওঠে সারদাবালা, তুই চুপ্ কর তো। তোকে আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

মায়ের কাছে ধমক খেয়েও কিশোরী রাধা বুঝতে পারে না নিজের অপরাধ। তাই সে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে সারদাবালার মুখের দিকে। সারদাবালা তাড়াতাড়ি আবার বলতে থাকে, হ্যাঁ বাবা, খবরটা শোনার পর থেকে কি উদ্বেগেই যে আমাদের দিন কেটেছে। পরে যখন শুনলাম তুমি অনেকটা ভালো আছো তারপরেই না একটুকুন স্বস্থির হই।

কিশোরী রাধার কথা সংশোধন করে তার মা সারদাবালা যা-ই বলুক না কেন সেই মুহূর্তে ঐ রাধার কথাগুলোই জয়রামের মনটাকে এক বিচিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আশেপাশে তাকিয়েও জয়রাম লাবণ্যকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে বিস্মিত হয়। জয়রামের জন্যে লাবণ্যর এতই যদি দুশ্চিন্তা তা'হলে এইমুহূর্তে অন্য সবার মধ্যে সে অনুপস্থিত কেন?

অবশেষে একসময় পুকুর পাড়ে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয় জয়রামের।

লাবণ্যর মুখের ওপর সেই হাল্কা ভাবটুকু আর নেই। পরিবর্তে কেমন যেন এক শঙ্কামিশ্রিত দৃষ্টি তার কাজল কালো চোখে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জয়রাম মৃদু হেসে লাবণ্যর দিকে তাকাতেই লাবণ্য নামিয়ে নেয় তার চোখজোড়া। পরক্ষণেই জয়রামের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এভাবে ডাকাতদলের সঙ্গে যুদ্ধ না করলেই কি চলতো না? যদি একটা ভালোমন্দ কিছু হতো?

লাবণ্যর এই উৎকণ্ঠায় মনে মনে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি বোধ করে জয়রাম। তার নিজের সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হবার মত লোকের অভাব নেই সংসারে। আছে তার মা-বোন, আছে রমজানচাচা, এমনকি আছে এই লাবণ্যের মা-বোনেরা। কিন্তু লাবণ্যর নিজের এই উৎকণ্ঠাটুকুর স্বাদ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

মৃদু হেসে জবাব দেয় জয়রাম, আমি হচ্ছি গিয়ে থানার পাইক। ডাকাত-ঠেকানো তো আমারই কাজ। নিজের কাজ না করলে গাঁয়ের মানুষের কাছে জবাবই বা কী দেব?

—কিন্তু সেদিন সেই অস্তরটা যদি তোমায় পায়ে না বিঁধে বুকে বিঁধতো?

তেমনি হেসে হাল্কা সুরে জবাব দেয় জয়রাম, আয়ু আছে বলেই তো বুকে বেঁধে নাই। না থাকলে মরতে হতো। এমনি তো কত ঘটনাই ঘটে।

আবার একটু সময় মাথা নীচু করে থাকে লাবণ্য। তারপর মুখ তুলতেই জয়রাম লক্ষ্য করে লাবণ্যর চোখের কোণে দু'ফোটা জল চকচক্ করছে। চাপা কণ্ঠে লাবণ্য বললে, আমার একটা কথা রাখবে ছোটপাইক?

—বলো। জবাব দেয় জয়রাম।

—চোর-ডাকাত ধরে বেড়াও তোমরা। তোমাদিগের উপর ওদের আক্রোশ তো থাকবেই। তাই রাত-বিরেতে একা একা চলাফেরা করো না।

লাবণ্য থামতেই জোরে হেসে ওঠে জয়রাম। হাসতে হাসতেই বললে, আমার বাবার আমল আর নাই যখন নাকি একজন চৌকিদারকে দেখলেই চোর-ডাকাতেরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। দেশে এখন কোম্পানীর রাজত্ব। চৌকিদার তো দূরের কথা, থানার পাইক-বরকন্দাজকেও আজকাল আর কেউ তেমন মানতে চায় না। কিন্তু তাই বলে একা পেয়ে কেউ আমাদের অনিষ্ট করবে তেমন অবস্থাও এখনও দেশে আসে নাই।

—আসে নাই তো আসতে কতক্ষণ?

—তা' যা বলেছ, বলতে থাকে জয়রাম, অরাজকতা তো এখন চারিদিকে

মুর্শিদাবাদের নবাবের নবাবী তো আর নাই। ইংরাজ সাহেবেরা নাকি কলিকাতায় বসে রাজ্য শাসন করে। শাসন না হাতি। গরীব মেরে কেবল খাজনা আদায় করে বেড়ায়। দেশ-গাঁয়ের জমিদারদেরও নজর এখন ঐ খাজনারই দিকে। প্রজার অবস্থা এখন দেখছেই বা কে, বুঝছেই বা কে? কাজেই শাসন বলে দেশে আর কিছু নাই। কেউ কাউকে মানতে চায় না। এই অবস্থায় দু'দিন পরে হয়তো খোদ্ থানাদারকেও আর কেউ মানতে চাইবে না।

জয়রাম থামতেই হঠাৎ বলে ওঠে লাবণ্য, আচ্ছা ছোটপাইক, একটা কথা বলবো?

—বলো।

—তুমি এবার বে করো।

লাবণ্যর মুখে বিয়ের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামের বুকের হৃদ্‌পিণ্ডটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠে দ্রুত বেগে চলতে থাকে। আশ্চর্য এক শিহরণ সে অনুভব করে সারা দেহে। পুকুর পাড়ে লাবণ্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিচিত্র এক অনুভূতিতে বিহ্বল হয়ে সে কোন জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে কেবল তাকিয়ে থাকে লাবণ্যর মুখের দিকে।

লাবণ্য নারী—বিবাহিতা। পুরুষের মনের এই চাঞ্চল্য তার চোখ এড়াবার কথা নয়। এড়ায়ও না। তাই সে তাড়াতাড়ি আবার বলে ওঠে, হ্যাঁ ছোট-পাইক, দেখেশুনে একটি সোন্দরী কন্যেকে বে করো। বয়স তো তোমার কম হয় নাই।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে জয়রাম। লাবণ্যর মুখে সুন্দরী কন্যার কথায় সে হেসে হাল্‌কা সুরে জবাব দেয়, সুন্দরী কন্যা আর কোথায় পাই, বলো?

—সেকি, দেশে-গাঁয়ে সোন্দরী কন্যের অভাব আছে নাকি?

—আছে নাকি তোমার খোঁজে?

লাবণ্যও জবাব দেয় হাল্‌কা চালে, আছেই তো।

—সুন্দরী?

মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে সায় দেয় লাবণ্য।

—ঠিক্ তোমার মত?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটুকু মুছে যায় লাবণ্যর। একটা বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়ে তার সারা মুখে। একটু সময় স্থির হয়ে থেকে অবশেষে ধরা গলায় বললে, না—না ছোটপাইক, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার বউ

যেন আমার মত পোড়াকপালী না হয়।

কথার শেষে আর একটুও দাঁড়ায় না লাবণ্য। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত পায়ে সে চলে যায় বাড়ির দিকে। আর সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাসুদেবগঞ্জ থানার সর্ব্বকনিষ্ঠ পাইক জয়রাম সামন্ত।

নরহরি কবিরাজের গুণধর পুত্র ভবানীর সঙ্গে তরঙ্গর ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি এলোকেশী কিম্বা জয়রামের নজরে না পড়লেও ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ চৌকির চৌকিদার রমজান আলীর নজরে পড়ে। একদিন নয়, একাধিক দিন সে লক্ষ্য করেছে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বাড়ির পেছনের বাঁশ বাগানে দু'টিতে মিলে কথা বলতে। প্রথমে সে ভেবেছিল এসব নিয়ে সে মুখ খুলবে না। মুখ খোলা মানেই পাঁচ কাণ। তাতে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে তার আদরের জয়রামের। তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভালো। যাদের মেয়ে তাদের যখন হুঁস নেই তখন সে এসব লজ্জাকর বিষয়ে মাথা গলাতে যায় কেন? কিন্তু পর পর বেশ কয়েকদিন একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখে মতের পরিবর্ত্তন ঘটে তার।

একদিন রমজান স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা বলেই ফেললে এলোকেশীকে। সূর্য অস্ত যায়নি তখনও। উবু হয়ে দাওয়ায় বসে কুলোয় ধান ঝাড়ছিল এলোকেশী। রমজান এসে সামনে দাঁড়াতেই এলোকেশী উঠে গিয়ে একখানা জলচৌকি এনে দিয়ে বললে, এসে গেছেন ভালই হয়েছে। না এলে খবর দিতে হতো।

উঠোনে জলচৌকি পেতে বসতে বসতে রমজান কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কেন জয়ের মা? কী হলো আবার?

—না, এমন কিছু না, ধান ঝাড়তে ঝাড়তে জবাব দেয় এলোকেশী, আপনি ছাড়া জয়ের কথা আর কাকেই বা বলবো?

—কেন, কী করেছে জয়? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রমজানের।

—না, কিছু করে নাই, বলতে থাকে এলোকশী, এতটা বয়স হলো। এখন যদি বিয়ে না করে তো করবে কবে? এদিকে বিয়েতে ছেলের একেবারেই গা নাই। বললেই বলে, পরে হবে। দেখেন তো আমার শরীলের অবস্থা। এই ক'টা ধান ঝাড়তেই কেলান্ত হয়ে পড়ি। তাই বলছিলাম আপনি যদি বলে-কয়ে ছেলেটার মত করাতে পারেন।

—ও—এই কথা? একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে রমজান। তারপর নিজের কাঁচা-পাকা দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, তা, এই শরীর নিয়ে আপনিই বা ধান ঝাড়তে বসেছেন কেন? তরি কোথায়?

—গেছে একটু কৈবর্তপাড়ায় ওর এক সইয়ের কাছে। ছেলেমানুষ। এই বয়সেই তো সাধ-আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে যদি নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। কথার শেষে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে এলোকেশী।

একটুসময় চিন্তা করে রমজান। তারপর বসা অবস্থাতেই জলচৌকিটা দাওয়ার আরও একটু কাছে টেনে এনে নীচু কণ্ঠে বললে, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি, জয়ের মা।

ধান ঝাড়া থামিয়ে এলোকেশী কৌতূহলী চোখে তাকায়। দ্বিধার সুরে বলতে থাকে রমজান, কী আর বলবো জয়ের মা, আপনার মেয়ে তো আমারও মেয়ের মত। তবে কিনা আমরা মোছলমান, আপনারা হিন্দু। আমাদের ঘরের বেধবা মেয়ে হলে না হয় আবার বে দিতাম, কিন্তু আপনাদের তো তা' হবার নয়। তাই বলছিলাম—।

কথাটা শেষ না করে রমজান থামতেই অধৈর্যকণ্ঠে বলে ওঠে এলোকেশী, কী—কী করেছে তরি ?

—করবে আর কি ? বলতে থাকে রমজান, বয়সের যা ধর্ম। একরত্তি মেয়েটা এই বয়সেই বেধবা। স্বাদ-আহ্লাদ তারও তো আছে। তাই তো ঐ নরহরি কব্‌রেজের বদ ছেলেটার সঙ্গে—।

রমজানের কথা শেষ হবার আগেই প্রায় চিৎকার করে ওঠে এলোকেশী, এ আপনি কী বলছেন ? এভাবে আমার মেয়ের বদনাম ছড়িয়ে—।

—না—না জয়ের মা, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রমজান, আমি বদনাম ছড়াবো কেন ? আপনাদেরকে ভালোবাসি বলেই তো সাদা কথাটা সাদাভাবে বলে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে বলছি।

তরঙ্গের স্বভাব-চরিত্রের ওপর দারুণ আস্থা ছিল এলোকেশীর। ও যে কোনদিন কোন খারাপ কিছু করতে পারে তা' সে ধারণাই করতে পারেনি। তাই রমজানের কথায় খাপ্পা হয়ে উঠে বললে, থাক্—থাক্, আর ভালোবাসার কথা বলবেন না। যথেষ্ট হয়েছে। বিপদের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে কি ভেবেছেন আমার বেধবা মেয়ের নামে এভাবে বদনাম ছড়ালে আমরা তা' সহ্য করবো ?

—হায় আল্লা ! একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে রমজান, এসব আপনি কী বলছেন জয়ের মা ?

—যা বলার ঠিকই বলছি, উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে এলোকেশী, জন্ম

আজ বাড়ি আসুক। তারপর——।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ঢোকে জয়রাম। গায়ে তার পাইকের পোশাক, হাতে সড়কি। এলোকেশীর শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল। তাই সে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, কী—কী হয়েছে, মা? কী হয়েছে চাচা?

রমজান কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে। ছেলেকে দেখে এতক্ষণে প্রৌঢ়া এলোকেশীর অবরুদ্ধ ক্রোধ জলের আকারে তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। চোখে আচল চাপা দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, শোন্— শোন্ জয়, তোর ঐ চাচা তোর বোনের স্বভাব-চরিত্তির নিয়ে কী বলছে একবার শোন্। তরি নাকি কবরেজের ঐ ছেলেটার সঙ্গে—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় এলোকেশী।

স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে জয়রাম। তরঙ্গ সম্পর্কে এলোকেশী যতটুকু বলেছে ততটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তরঙ্গর মত মেয়ে কি তাদের পরিবারের মুখে এভাবে চুণ-কালি মাখাতে পারে? কিন্তু তার রমজান চাচা তো মিথ্যে বলার লোক নয়। তা'ছাড়া, মিথ্যে বলে তার কী লাভ?

জয়রাম চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রমজানকে, সত্যিই কি তুমি নিজের চোখে কিছু দেখেছ, চাচা? তরিকে কি দেখেছ ঐ ভবানীর সঙ্গে—?

জলচৌকি ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রমজান। স্থির চোখে জয়রামের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে বললে, না বাবা, দেখি নাই। আর দেখলেও বোধহয় ভুল দেখেছি। বয়স হয়েছে তো। কী দেখতে হয়তো কী দেখেছি।

কথাটা বলে আর একটুও দাঁড়ায় না রমজান। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়িয়েই আবার ফিরে তাকায়। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে জয়রামকে বললে, শোন্ জয়, তোর মাকে বলিস তরির নামে বদনাম রটিয়ে তোদের বিপাকে ফেলতে আমি আসি নাই।

রমজান চলে যায়। আর, একটু পরেই বাড়ি ঢুকে তরঙ্গ তার মা-দাদাকে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার স্বভাবসিদ্ধ চপল ভঙ্গিতে বলে ওঠে, হয়েছে কি গো? তোমাদিগের সবার গরু মরেছে নাকি যে দাঁতে কাঠি নিয়ে সবাই চুপ্ করে আছো? পথে দেখা হলো রমজান চাচার সঙ্গে। কথাটি না বলে হেঁটে চলে গেল। তোমরা মায়ে-পোয়েও মা দুগ্ গা আর কাত্তিক ঠাকুরের মত থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো?

হঠাৎ তরঙ্গর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে জয়রাম, কোথায় গিয়েছিলি রে

এই সাঁঝবেলা ?

জয়রামের এধরনের কণ্ঠস্বর তরঙ্গর কাছে নতুন। বিশেষ করে শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে বাপের বাড়ি চলে আসার পর থেকে যে কোন সাংসারিক ব্যাপারে তরঙ্গ একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয়ই পাচ্ছিল তার মা-দাদার কাছে। কাজেই জয়রামের কথার ধরনে তরঙ্গের পক্ষে হকচকিয়ে যাওয়ারই কথা।

সেই মুহূর্তে অভিমানে মুখখানা ভারি হয়ে ওঠে তরঙ্গর। ছল্ ছল্ চোখে জয়রামের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে এলোকেশী, শুধু শুধু মেয়েটাকে বকছিস কেন ? কে এসে কী বললো আর তা-ই বিশ্বাস করে বসলি ? ও তো কৈবর্ত্তপাড়ায় ওর সইয়ের কাছে গিয়েছিল।

আদরের বোনের সঙ্গে এমনি স্বরে কথা বলা নিজের কাছেই অস্বাভাবিক লাগে জয়রামের। একটু সময় চুপ্ করে থেকে আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে সে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসে না জয়রামের। তরঙ্গর কথাই ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে। বালবিধবা তরঙ্গ অসহায়। ভবিষ্যৎ বলে ওর আর কিছু অবশিষ্ট নেই। নরহরি কবিরাজের ছেলে ভবানীর স্বভাব-চরিত্র কোনকালেই ভালো নয়। সেই ভবানী হয়তো তরঙ্গর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে। আর বোকা মেয়েটাও হয়তো সেই প্রলোভনে ভুলে গিয়ে ভবানীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে। মা এলোকেশী যতই কেন না মেয়েকে আড়াল করুক, একটা কিছু অবশ্যই ঘটেছে। নইলে শুধু শুধু এমনি একটা অনুযোগ করার মানুষ তো তার রমজান চাচা নয়।

কিন্তু এ জন্যে দায়ী কে ? দায়ী অবশ্যই ঐ ভবানী ছেলেটা। ও-ই ফাঁদ পেতেছে। আর সেই ফাঁদেই ধরা পড়েছে তরঙ্গ। তবে, বাস্তবিকই কি এটা ফাঁদ ? অবশ্যই তাই। একটি বালবিধবার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতানো ফাঁদ ছাড়া আর কি ?

তরঙ্গর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লাবণ্যর কথা মনে পড়ে জয়রামের। তবে কি সে নিজেও লাবণ্যর জন্যে এমনি এক ফাঁদ পেতেছে ? লাবণ্য সম্পর্কে তার নিজের মানসিকতা কি অবৈধ নয় ? সেটা তো কেবল অবৈধই নয়, নিদারুণ গর্হিত। তরঙ্গ বিধবা। তার স্বামীর আসনে বসার মত সংসারে কেউ নেই। কিন্তু লাবণ্য স্বামী পরিত্যক্তা হলেও সধবা। তার স্বামী এখনও বেঁচে-বর্তে আছে। এসব জানা সত্ত্বেও জয়রাম নিজের মনটাকে কেন লাবণ্যর

ওপর থেকে সরিয়ে আনতে পারছে না? অন্যায় সর্বত্রই অন্যায়। তরুণ সম্পর্কে যা অন্যায় লাবণ্য সম্পর্কে কি তা অন্যায় নয়?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে জয়রামের। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে আসে। তারপর শেষ রাতের দিকে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

এর পর থেকে এক আশ্চর্য মানসিক অবস্থার মধ্যে দিন কাটে জয়রামের। ভবানীর সঙ্গে তরুণর অবৈধ প্রণয়ের বিষয়টিকে মন থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে। ভয়, পাছে লাবণ্যর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের কথা সেই সূত্রে মনে পড়ে গিয়ে নিজেকে অপরাধী ভেবে ভবানীর সঙ্গে একই আসনে তাকে বসতে হয়।

সেদিন জয়রাম থানায় এসে উপস্থিত হতেই তাকে ঝড়ের মুখে পড়তে হয়। ঝড় অবশ্য জয়রামের ওপর নয়। থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পালের ঘরের সামনে জোড় হাতে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়েছিল বড় বহেরা গ্রামের চৌকিদার হারাধন। ঘরের মধ্যে ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে তুমুল ঝড় তুলছিল স্বয়ং থানাদার পুণ্ডরীক। আর সেই ঝড়ের দাপটে থানার পাইক-বরকন্দাজেরা ম্লান মুখে বসেছিল এখানে-ওখানে।

তারস্বরে চিৎকার করে কথা বললেও দু'টো বাক্যের মাঝখানে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে স্বভাবসিদ্ধ 'হরেকৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারণ করতে কিন্তু ভুল হচ্ছিল না পুণ্ডরীকের। হারাধনকে লক্ষ্য করে বলছিল পুণ্ডরীক, ভেবেছিস্ কি তোরা? বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমাবি, আর চুরি-জোচ্চুরির খেসারত দিতে হবে আমাকে? দু'টো মাসও হলো না, পাংগুটির সেই গরুচুরির কিনারা করতে না পেরে খেসারত দিতে হলো ছ'টাকা তিন আনা। আবার কিনা দশ মন ধানের খেসারত! আর না, এবার তোদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ধান আদায় করে ছাড়বো। হরেকৃষ্ণ, কোন দয়ামায়া নাই এবার।

—মরে যাবো—মরে যাবো কত্তা, কাঁদো কাঁদো মুখে বলে ওঠে হারাধন, ঐটুকুন চাকরাণার জমিতে যা হয় তাতে দু'বেলা দু'মুঠোই জোটে না। তার উপর খেসারত দিতে হলে একেবারেই মরে যাবো, কত্তা।

—মরবি তো মর্, হরেকৃষ্ণ, রেগে উঠে পুণ্ডরীক বলতে থাকে, রাতের বেলা ঠিক্ মত পাহারা দিলে কি চোরেরা ঐ দু'তিন বিঘে জমির ফসল কেটে নিতে পারতো?

—বিশ্বাস করেন কত্তা, বলতে থাকে হারাধন, গাঁয়ের একেবারে শেষ

সীমায় ঐ জমি। সেদিন সহদেবের জ্বর হয়েছিল। রোঁদে বেরিয়েছিলাম আমি একা। গাঁয়ের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো যেতেই একপহর কাবার। চোরেরা বোধহয় তকে তক্কে ছিল। আমি চলে যেতেই কাম হাসিল করে ওরা পালিয়ে যায়। এখন বলেন কত্তা, আমার কি দোষ?

—না, দোষ সব আমার, ভেংচি কেটে বলে ওঠে পুণ্ডরীক, থানাদার হয়েছি বলে নিজের জমির ফসল যদি কেবল খেসারত দিতেই চলে যায় তা'হলে কি ঘরে বসে ছেলেপুলে নিয়ে আমি কেবল আঙ্গুল চুষবো? আর তোরা সবাই কেবল চুষবি মাছের মাথা? আর ওটি হবে না। হরেকৃষ্ণ, এবার থেকে প্রত্যেককেই খেসারত দিতে হবে। চৌকিদার—পাইক-বরকন্দাজ-হরকরা কেউ বাদ যাবে না।

পুণ্ডরীকের কথায় জয়রামের মুখখানা শুকিয়ে ওঠে। এবছর এমনিতেই সংসারে টানাটানি চলছে। তার ওপর যদি চুরির খেসারত দিতে হয় তো খুবই মুশকিল। তবে ভরসার মধ্যে পুণ্ডরীক নিজে। এর আগেও অনেকবার এমনি ঘটেছে। থানার নায়েব পাঁচকড়ি তদন্ত করেও যখন মাল উদ্ধার করতে কিম্বা চোর ধরতে পারেনি, তখন মুখে অনেক হম্বিতম্বি করেও কিন্তু শেষপর্যন্ত পুণ্ডরীক একাই খেসারত দিয়েছে। তবে এবারের অবস্থা একটু ভিন্ন। দু'এক মণ নয়, দশ মণ ধান। এর সবটার দায় কি এবার একা থানাদার নিজের ঘাড়ে নিতে চাইবে?

হঠাৎ হারাধন বলে ফেলে, এজ্ঞে কত্তা, থানার নায়েবমশাই যদি একটুকুন ভালোভাবে চেষ্টা করতো তা'হলে ধান উদ্ধার না হলেও হয়তো চোরদিগেরকে—।

আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার খাপ্পা হয়ে ওঠে পুণ্ডরীক। চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, কি বললি? নায়েবের কাজের সমালোচনা? ছোটমুখে বড় কথা? মেরে গায়ের ছাল খুলে নেবো রে, হতভাগা।

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠে পুণ্ডরীক। তারপর আবার বলতে থাকে, 'ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল মারার গোসাই!' তিন মাস হলো চুরি হয়েছে। গাঁয়ের চৌকিদার হয়ে চোরের একটা হদিশ পর্যন্ত এতদিনে দিতে পারলি না। আর এখন এসে কিনা বলছিস নায়েবের দোষ?

—না—না কত্তা, তাড়াতাড়ি জবাব দেয় হারাধন, আমি ঠিক সেকথা বলি নাই। আমি—

—থাম্। ধমকে ওঠে পুণ্ডরীক, কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমি থানাদার, আমাকে তো খেসারত দিতেই হবে। কাজেই দশমণের পাঁচমণ ধান দেব আমি, আর বাকি পাঁচমণ তুই। আর কাউকে কিছু দিতে হবে না।

পুণ্ডরীকের কথায় থানার পাইক-বরকন্দাজ মহলে একটা স্বস্তির ভাব জেগে উঠলেও চৌকিদার হারাধন কিন্তু একটা কাণ্ড করে বসে। কয়েক মুহূর্ত পুণ্ডরীকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে তার পায়ের ওপর পড়ে কান্নার সুরে বলতে থাকে, দয়া করেন—দয়া করেন কত্তা, এর থেকে আপনি আমাকে এখানেই মেরে ফেলেন। ধান দিতে না পারলে আমার চৌকিদারী যাবে। ঐ চাকরাণার জমিটুকুন ছাড়া আর একছটাক্ জমিও আমার নাই। মাগ-ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে কত্তা। মেরে ফেলেন—এখনই আমাকে মেরে ফেলেন।

পুণ্ডরীকের চিৎকারে ছুটে আসে থানার পাইক-বরকন্দাজ-হরকরারা। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুণ্ডরীকের পায়ের ওপর থেকে টেনে তোলা হয় হারাধনকে। তারপর একসময় পুণ্ডরীকের মুখের আশ্বাস পেয়ে থানা ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে।

শেষপর্যন্ত কিন্তু অন্য কাউকেই আর ধান চুরির খেসারত দিতে হলো না। বাহাদুরপুরের নায়েব-দেওয়ানের হুকুম মত থানাদার পুণ্ডরীক পাল একাই খেসারত দিলে। অভিযোগকারী দশমণ ধান তুলে নিয়ে গেল থানাদার পুণ্ডরীকের বাড়ি থেকে।

থানার অন্যান্য সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও জয়রামের মনটা কেমন যেন খচ্-খচ্ করতে থাকে। থানাদার বলে ধান চুরির দায় কি পুণ্ডরীকের একার? থানায় কাজের বিনিময়ে তারা প্রত্যেকেই জমিদারের দেয়া জমিজমার স্বত্ব ভোগ-দখল করে। নিয়ম অনুযায়ী চোর ধরাপড়া কিম্বা চোরাই মাল উদ্ধার করতে না পারলে অভিযোগকারীকে খেসারত দিতে হয়। এর দায়িত্ব গাঁয়ের চৌকিদার থেকে শুরু করে থানার হরকরা পর্যন্ত প্রত্যেকের। তবে কেন থানাদার পুণ্ডরীক একা সেই দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে?

নয়

বণিকের মানদণ্ড, শর্বরী পোহালে
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।

রাজদণ্ড হাতে পেলেও ইংরেজ জাতি তার হাতের মানদণ্ডটিকে কিন্তু ফেলে দেয় নি। ব্যবসায়ী জাতি—জাত-ব্যবসা তো ছাড়া চলে না। তাই রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের দিকেও নজর দিতে হয়। ব্যবসার নামে শোষণ করতে হলে শাসন ব্যবস্থা ঠিক্ না রাখলে চলে না।

গভর্ণর থেকে গভর্ণর জেনারেল হয়েছেন ওয়ারেস হেস্টিংস। কত রকম পরিকল্পনা তাঁর মাথায়। দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থার ফলে দেশজুড়ে তখন চলছে অত্যাচার আর অবিচার। খবর আসে হাওয়ায় ভেসে। রাজধানী কলিকাতায় বসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারেরা কি ভাবেন কি করেন তার আভাস ইঙ্গিত কিন্তু হাওয়ায় ভেসে সুদূর গ্রাম বাংলায়ও এসে পৌছে যায়। আসলের সঙ্গে নকল মিশে বিদঘুটে সব গুজব। শাসন-ব্যবস্থার খোল-নলচে পাল্টাবার জন্যে নাকি উঠেপড়ে লেগেছেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। জমিদারি-প্রশাসন ব্যবস্থায় এবার নাকি নাক গলাবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী? হয়তো গলাবে। কিন্তু এনিয়ে গ্রাম বাংলার সাধারণ-মানুষ মাথা ঘামায় না। তাদের কাছে নবাবী আমলের সঙ্গে এই ইংরেজ আমলের বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। তবে কিনা এরা বিদেশী ম্লেচ্ছ। যা-তা খায়, যা-তা আচরণ করে। তা, যা ইচ্ছে ওরা করুক। কেবল গাঁয়ের মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন ধারার ওপর হস্তক্ষেপ না হলেই হলো। নবাবী আমলে দেশের মানুষের ওপর চূড়ান্ত অন্যায় অবিচার হলেও এদেশীয় জীবন ধারার ওপর তেমন একটা হস্তক্ষেপ ঘটেনি। ইংরেজ আমলে তেমনটি না ঘটলেই তারা নিশ্চিন্ত।

ইদানীং জয়রাম তরজর ব্যাপারটা তার মা এলোকেশীর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে মাথা গলিয়ে ঘরের শান্তি নষ্ট করতে সে চায় না। তা ছাড়া লাবণ্যর ব্যাপারটা মাঝে মাঝেই তার মনটাকে খুঁচিয়ে বিব্রত করে তোলে। কিন্তু তাই বলে পাংশুটির নন্দীবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে সে কিছুতেই পারে না। এটা যেন একধরনের নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে। ইদানীং সে স্পষ্টই বুঝতে পারে, লাবণ্য হয়তো চিরকালই থেকে যাবে তার নাগালের

বাইরে। সধবা-বেশের আড়ালে বিধবা-মনের শূন্যতা পূর্ণ করতে লাবণ্য হয়তো কোনদিনই তাকে কাছে ডাকবে না। বেশ তো, তাই হোক্। জয়রাম না হয় এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে। এখন তার একমাত্র চিন্তা মা এলো-কেশীকে নিয়ে। বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্যে মায়ের যখন-তখন এই পীড়া-পীড়িকে যদি সে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখাতে পারে তা'হলেই সে নিশ্চিন্ত।

বর্ষাশেষে শরৎ আসে গ্রাম বাংলায়। দামোদরের পাড়ে কাশবনে দেখা দেয় কাশফুলের সমারোহ। আকাশে টুকরো শরতের মেঘ। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা।

সেই বার্তা এসে পৌছয় ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়েও। এ গাঁয়ে একমাত্র মিত্তির বাড়ি অর্থাৎ ভরু মিত্তিরের বাড়িতেই হয় মা দুর্গার আরাধনা। পুজো মিত্তির বাড়িতে হলেও এটি গাঁয়ের সকলের। এমনকি পুজোর ক'টা দিন রেষারেষি ভুলে নরহরি কবিরাজ পর্যন্ত পাটের ধুতি পরে পুজোর আটচালায় দাঁড়িয়ে ভরুর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। পঞ্চায়েত প্রধান সমাজপতি অম্বিকা বাড়ুয্যে তিনটে দিন পুজোমণ্ডপে বসে চণ্ডীপাঠ করে থাকে। এছাড়া কুমোর, কামার, নাপিত প্রভৃতি গাঁয়ের সাধারণ মানুষেরও নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে ভরুমিত্তিরের পুজোমণ্ডপে। বলতে গেলে পুরুষানুক্রমিক কাজ, কারণ ভরুর বাড়ি এই পুজোও পুরুষানুক্রমিক। কবে নাকি ভরুর ঠাকুর্দা চালু করেছিল এই পুজো। তখন নাকি মিত্তির বাড়ির রমরমা অবস্থা। জমিদার না হলেও প্রায় জমিদারের মত অবস্থা ছিল মিত্তিরদের। তাই এবাড়ির পুজোর নিয়ম কানুনও অনেকটা জমিদার বাড়ির পুজোর মতই। শত অসুবিধে সত্ত্বেও ভরুমিত্তির আজও সেই নিয়ম বজায় রেখে চলেছে।

মূর্তি তৈরির প্রথমপর্বে খড় বাঁধা থেকেই ভরুর মণ্ডপে গাঁয়ের মানুষের ভিড়। অবশ্য ভিড়টা তখন প্রধানতঃ গাঁয়ের বালখিল্যদেরই। দশভুজা মা আসছেন—এই আনন্দেই তাদের ছোট্ট মনগুলো তখন রোমাঞ্চিত। তারপর কুমোর পাড়ার ওস্তাদ কারিগরের হাতে মূর্তিরূপ পরিগ্রহ করলো। একমাটি—দোমাটি—তারপর রংয়ের বাহার। শুরু হলো ছোটদের মধ্যে মূর্তি-গুলো সম্পর্কে আলোচনা। প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের যতটা না মা দুর্গা কিম্বা লক্ষ্মী-সরস্বতী, তার চাইতে অনেক বেশি সিংহ ও অসুর। এক চালের দুর্গা প্রতিমার মধ্যে ঐ অসুর-সিংহই তো সবচাইতে বেশি সক্রিয়। বাকিরা তো সবাই প্রায় পুতুল। অবশ্য গণেশ পুতুলের মত বসে থাকলেও ছোটদের কাছে তার কৌতূহলোদ্দীপক আকর্ষণের প্রধান কারণ তার ঐ গজমুণ্ড।

বোধনের দিন যতই এগিয়ে আসে ততই ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভক্ত। সাধ্য নেই সাধ আছে। পিতৃপুরুষের নিয়মকানুন মানতে গিয়ে সে গলদ্‌ঘর্ম। তিন ক্রোশ দূরের গ্রাম মাটিগাড়ায় কয়েকঘর মালীর বাস। এক সকালে সেখানে এসে হাজির হয় ভক্ত। বৃদ্ধ মালি ভক্তকে দেখেই তার আগমনের কারণ বুঝতে পেরে ফোঁকলা দাঁতে হেসে বললে, এয়েছেন কত্তা, আসেন— আসেন। কিন্তু মুশকিল হলো এবার তো পূজা পড়েছে আশ্বিনের প্রথমে। এত আগে তো অতসীফুল জোগাড় করা শক্ত কত্তা!

প্রতিবছরই এরকম একটা না একটা ওজর আপত্তি তোলে ঐ বৃদ্ধ মালি, আবার সময়মত ঠিক জোগাড়ও করে দেয়। মিত্তির বাড়ির নিয়ম, পূজোয় অতসী ফুল লাগবেই। অন্ততঃ একটি ফুল হলেও তা' চাই।

দুর্গা পূজোয় অতসী ফুলের নিয়ম এখনও কোনক্রমে চালু রাখতে পারলেও শতশিরা পাখার নিয়ম কোনদিনই মানতে পারেনি ভক্ত। একশত শিরা আছে এমন তালপাতার পাখা জোগাড় করা ভক্তর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তাই প্রতিমাকে হাওয়া করার জন্যে আট দশখানা পাখার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে। সব মিলিয়ে ঐ শতশিরাই। তারপর আছে সিংহচর্ম। ভক্তর ঠাকুর্দার আমলের শতশিরা পাখার মত নতুন সিংহচর্মাসনেরও প্রয়োজন। সেকালে নাকি পুরুতঠাকুর পূজো করতেন ঐ আসনে বসে। পূজোর শেষে দেবীর সঙ্গে নাকি ঐ আসন খানিও বিসর্জন দেয়া হতো। বাংলা মুলুকে বাঘ থাকলেও সিংহ কোনকালেই বোধহয় ছিল না। ভক্তর ঠাকুর্দা কী ভাবে প্রতিবছর ঐ আসন জোগাড় করতেন তিনিই জানেন। তবে ভক্তর বাবা সিংহচর্মাসনের বিষয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, ভক্তও তাই করে। ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে যে কয়েক ঘর মুচি বাস করে তারাই প্রতিবছর ছোট্ট একটুকরো রোমশ চামড়া এনে দিয়ে যায়। তারা বলে, এটা নাকি আসল সিংহের গায়ের চামড়া। পুরুতঠাকুরের কম্বলের আসনের নীচে ঐ চামড়াটুকু রেখেই প্রতিবছর নিয়ম রক্ষা করে ভক্ত।

সেদিন গাঁয়ের পথে জয়রামের সঙ্গে দেখা হতেই ভক্ত মিত্তির হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছিসরে জয়? থানার কাজ নেয়ার পর থেকে তোকে তো গাঁয়ে দেখাই যায় না রে?

ভক্তর পায়ের ধুলো নিয়ে একটু সলজ্জ হেসে জবাব দেয় জয়রাম, গাঁয়েই তো আছি, জ্যাঠা। তবে কিনা থানার কাজকর্ম—।

—তা' তো বটেই—তা'তো বটেই, থানার কাজ বলে কথা। তা' বাবা জয়,

পূজো তো এসে পড়লো। তোর নিজের কাজের কথাটা মনে আছে তো? এখন থেকেই খোঁজ-খবর শুরু করে দে। জানিস তো বাবা, ওটা না হলে যে পূজার অঙ্গহানি ঘটবে।

ভক্তর কথাটা কানে যেতেই সহসা মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। জয়রামের পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন, বোধনের আগে আপনি আপনার জিনিস পাবেন।

জিনসটা আর কিছুই নয়—একটা পাখী—নীলকণ্ঠ পাখা। রাজা-রাজড়ার বাড়ির দুর্গাপূজোর নিয়মে ভক্তর ঠাকুর্দা বোধনের অঙ্গ হিসেবে কেন যে নীলকণ্ঠ পাখী পূজো করার বিধি প্রবর্তন করেছিলেন তা' আজও সঠিক বুঝতে পারে না ভক্ত। দেশে-গাঁয়ে পূজো তো কতই হচ্ছে, কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া নিয়মকানুন ক'জনের বাড়িতে চালু? অবশ্য নীলকণ্ঠ পাখী একটা কিছু দামী জীব নয়। বনে-জঙ্গলে এর খোঁজ এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাখীকে জ্যান্ত ধরাই এক সমস্যা। খুব হুঁশিয়ার এই পাখী। মানুষের সামান্য সাড়া পেলেই পালিয়ে যায়।

ভক্ত মিত্তিরের জমিতে যখন মনিষ খাটতো তার আগে থেকেই মিত্তির বাড়ির পূজোয় এই একটা কাজ করে দিতো জয়রাম। তখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার একমাত্র কাজ। তা'ছাড়া পাখী ধরায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল জয়রাম। কাজেই বোধনের আগে বনে জঙ্গলে ঘুরে জয়রাম একটি নীলকণ্ঠ পাখী ধরে এনে দিতো ভক্তকে। সেই নিয়ম জয়রাম আজও চালু রেখেছে। মনিষ খাটার সময় পাখীর খোঁজ করতে সময় পেতো না জয়রাম। তখন প্রতিবছর তার এই কাজটা করে দিতো রমজান চাচা। খোঁজ খবর নিয়ে এসে বলতো, বড়ালের জঙ্গলে দু'টো নীলকণ্ঠ দেখে এয়েছি রে। পারিস তো ধরে নিয়ে আয় গে। বাস্তবিকই তাই। রমজান চাচার খবর মিথ্যে হতো না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গাছে চড়ে সে দিব্বি একটা পাখী ধরে আনতো।

এবারের অবস্থা একটু অন্যরকম। তাই ভক্তর কথায় প্রথমে মুখখানা শুকিয়ে উঠেছিল জয়রামের। কে এবার তাকে দেবে নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজ? তরঙ্গকে নিয়ে সেই ঘটনার পরে রমজান আর জয়দের বাড়িতে আসেনি। জয়রাম নিজেও আর লজ্জায় যায়নি রমজানের কাছে। কিন্তু এখন তো না গিয়ে আর উপায় নেই। জয়রামের জন্যে কে যাবে বন-বাদাড়ে ঘুরে নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজ করতে? এদিকে বনে-জঙ্গলে ঘোরার মত সময়

তার নিজেরও নেই। সারাটা দিন তো থানায় কাটে। কোন কোন দিন রাতেও আর বাড়ি ফেরে না। সঠিক খবর পেলে রাতে না হয় গিয়ে পাখী ধরে আনতে পারে।

যাই যাই করেও দিনকয়েক রমজানের বাড়িমুখো হতে পারলো না জয়রাম। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হতেই রমজান কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করলে তাকে। বললে, আয়—আয়—এসে বোস। কতদিন দেখিনি তোকে। কথার শেষে রমজানের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে।

জয়রাম মেটে বারান্দায় কোণে একখানা আসনে বসে কেবল মাথা নীচু করে থাকে। বলতে থাকে রমজান, হ্যাঁরে জয়, আমি বুড়োমানুষ। আমি না হয় অভিমান করে তোদের বাড়ি যাই নাই, কিন্তু তুই একবার এই বুড়োটার খবর না নিয়ে চুপ্ করে রইলি কেমন করে? এর মধ্যে আমি যদি মারা যেতাম তা'হলেও কি তুই না এসে চুপ্ করে থাকতিস? কথার শেষে কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে আসে রমজানের।

মাথা নীচু করেই মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, ভর সাঁঝবেলা এসব কথা বলো না, চাচা।

জয়রাম কথাটা স্বাভাবিকভাবে বলতে চেষ্টা করলেও সেইমুহূর্তে তার কণ্ঠস্বরের আবেগটুকু কিন্তু কান এড়ায় না রমজানের। ধীরে ধীরে সে আবার বলতে থাকে, জানিস জয়, তোর মার উপর গোঁসা করেছি। যেতে পারি না তোদের বাড়ি। তাই রোজ রাতে বেঁদে বেরিয়ে তোকে একবার দেখার জন্যে তোদের বাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করতাম। জানতাম অত রাতে তুই ঘুমে কাদা হয়ে আছিস। ঘুম ভাঙবে না তোর। তবুও রোজ আশায় আশায় থাকতাম।

রমজান থামতেই হঠাৎ জয়রাম ছুটে এসে তার সবল বাহু দিয়ে রমজানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, আমাদেরকে—আমাদেরকে তুমি মাপ করো, চাচা। আমার মায়ের হয়ে তোমার কাছে আমি মাপ চাইছি।

এতক্ষণে বৃদ্ধ রমজানের কণ্ঠস্বরও কান্নার আবেগে জড়িয়ে ওঠে। শীর্ণ হাত জয়ের মাথার ওপর বুলোতে বুলোতে সে বলতে থাকে, দেখ্ তো—দেখ্ তো পাগলা ছেলের কাণ্ড! থাম্ রে—থাম। শুধু শুধু কাঁদছিস কেন? জয়রামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বৃদ্ধ রমজান নিজেই হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

শেষপর্যন্ত প্রতিবছরের মত সেবছরেও রমজানের সাহায্যে জয়রাম ধরে আনে একটি নীলকণ্ঠ পাখী, এবং তা' বোধনের আগেই।

ভক্ত মিস্তিরের ছেলে নেই। একমাত্র কন্যা পার্বতী বিকলাঙ্গ। গায়ের রং কালো হলেও মুখখানা যেন সদ্য ফোটা একটি পদ্মফুল। ইচ্ছাময়ের বিচিত্র ইচ্ছা! জন্ম থেকেই পার্বতীর একখানা পা সম্পূর্ণ বাঁকা। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে চলাফেরা করে বাড়ির মধ্যে। আর মেয়ের দুঃখ ভুলতেই বোধহয় ভক্ত মিস্তির ডুবে থাকতে চেষ্টা করে গান বাজনার মধ্যে। মেয়ের বিয়ে দেয়নি ভক্ত। বিকলাঙ্গ হলেও এই মেয়েই তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী। বিয়ে দিতে চাইলে এমনি একটি মেয়ের বর জোটানো ভক্তর মত লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভক্ত বলে অন্যকথা। বলে, পাত্র তো ওকে বিয়ে করবে না, করবে আমার সম্পত্তিকে। সুযোগ পেলেই হেনস্থা করবে মেয়েটাকে। তার চাইতে বিয়ে না দেয়াই ভালো। কুলীন বামুনের ঘরের কত মেয়ের তো বিয়েই হয় না। আমরাও কায়স্থ কুলীন। পার্বতী না হয় তেমনি ভাবেই রইলো আমার কাছে।

বোধনের দিন মণ্ডপ পরিক্রমা দেখতে গাঁয়ের মানুষ অনেকেই এসে উপস্থিত হয় ভক্তর পূজামণ্ডপে। একটি নতুন বাঁশের খাঁচায়-বন্দী শিবঠাকুরের প্রতীক জয়রামের ধরে দেয়া সেই নীলকণ্ঠ পাখী। মা দুর্গা সপরিবারে আসছেন বাপের বাড়ি। তাই তো কৈলাশ থেকে শিবঠাকুর পাঠিয়েছেন তাঁর এই প্রতীকটিকে মায়ের এই পিতৃগৃহ ভ্রমণের খুঁটিনাটি দেখবার জন্যে। পূজোর শেষে এই নীলকণ্ঠই তো কৈলাশে ফিরে গিয়ে সবকিছু জানাবে দেবাদিদেবকে। পরিক্রমা-দলের পুরোভাগে গাঁয়ের পাঁচজন এঁয়োস্ত্রী। এদের মধ্যে ভক্তর স্ত্রী ছাড়া পঞ্চায়েত প্রধান অম্বিকা বাড়ুয্যের স্ত্রীও রয়েছে। এমনকি নরহরি কবিরাজের স্ত্রীও আজ গ্রাম্য দলাদলি ভুলে এসে সামিল হয়েছে এই দলে। এঁয়োস্ত্রী দলের পেছনে নীলকণ্ঠ পাখীর খাঁচাটি হাতে নিয়ে পুরুত ঠাকুর। সবশেষে ভক্তর পাশে লাঠি ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে ভক্তর কন্যা পার্বতী।

পূজোমণ্ডপ প্রদক্ষিণের পরে খাঁচা সমেত নীলকণ্ঠ পাখীটিকে এনে রাখা হয় পূজাস্থলে। প্রথমেই হবে শিবের প্রতীক ঐ পাখীটির পূজো। তারপর বোধন। কেবল ঐ একটা দিনই নয়, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবী পূজোর প্রতিটি দিনই হবে ঐ পাখীর পূজো। অবশেষে বিসর্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে নদীতীরে ঐ নীলকণ্ঠকেও নিয়ে যাওয়া হবে। মন্ত্রঃপূত সিদ্ধিজল খাইয়ে দেবীর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজা খুলে পাখীটিকেও ছেড়ে দেয়া হবে। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে শিস দিতে দিতে নীলকণ্ঠ মিশে যাবে

আকাশের ঘন নীলিমায়, হয়তো কৈলাশের পথেই। মৃন্ময়ী দেবীর নদীর জলে অন্তর্ধানের দুঃখের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে থাকবে একটি সুন্দর নীলকণ্ঠ পাখীর নীল আকাশে অন্তর্ধানের দুঃখ। উপস্থিত জনতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে উভয়ের জন্যেই।

ভরুর ঠাকুর্দার আমলে প্রতিদিন তিনটে করে ছাগ বলির সঙ্গে নাকি মোষ বলিও হতো। ভরুর বাবার আমলে মোষ বলি তো নয়ই, এমনকি ছাগের সংখ্যাও কমে গিয়ে সর্বমোট তিনটিতে এসে ঠেক্‌লো। ভরুও কিছুদিন তার সেই বাপের নিয়মই বজায় রেখেছিল। কিন্তু একমাত্র মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে ভরুর স্ত্রী ছাগবলি একেবারেই বন্ধ করে দিতে বলেছিল। ভরু কিন্তু রাজি হয়নি তাতে। পিতৃপুরুষের নিয়ম রক্ষা করতে ছাগের সংখ্যা একটিতে নামিয়ে আনলে ভরু। একমাত্র মহাষ্টমীর দিনই ছাগ বলি হয়। তা'ছাড়া, গাঁয়ের কারুর মানত থাকলে সেই ছাগও বলি হয় ভরুর পুজোমণ্ডপে।

দুর্গাপুজোর ক'দিন থানায় যাবার কড়াকড়ি নেই। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও থানাদার পুণ্ডরীক কিন্তু এসব ব্যাপারে উদার। শক্তি উপাসকদের ওপর কোন বিদ্বেষ নেই তার।

মহাষ্টমীর দিন বলির বাজনা বেজে উঠতেই গাঁয়ের যুবকরা এসে জড়ো হয় মণ্ডপের সামনে। তাদের প্রত্যেকেরই খালি গা। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি।

মহাষ্টমীর দিন ছাগ বলির পরে যুবকদের গায়ে রক্ত মেখে নৃত্য ও হৈ-হুল্লোড়ে জয়রাম বরাবরই এগিয়ে। কিন্তু সেদিন কি যেন হলো তার। এলোকেশীর প্রশ্নের জবাবে জয়রাম বললে, না মা, এবার আর আমি ওসবের মধ্যে থাকবো না।

—কেন রে? ফের জিজ্ঞেস করে এলোকেশী।

জবাব দিতে একটু দ্বিধা করে জয়রাম। তারপর ধুতির সঙ্গে গায়ে কুর্তাটা চাপাতে চাপাতে বললে, না মা, এসব আর ভালো লাগে না।

—তা'হলে ঢাকে কাঠি পড়তেই চল্‌লি কোথায়?

জবাব দেয় জয়রাম, মণ্ডপেই যাচ্ছি ওদের নাচ দেখতে।

মুখে 'ভালো লাগে না' বললেও আসলে কিন্তু তা' নয়। ইদানীং থানার পাইক হিসেবে নিজেকে গাঁয়ের আর পাঁচজন যুবকের চাইতে একটু স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শুরু করেছে জয়রাম। পাইক হিসেবে সে যে ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতা অন্যের নেই। এই ক্ষমতার জন্যেই যে গাঁয়ের আর পাঁচজন তাকে

একটু সমীহ করে সেটা পাংশুটির নন্দীবাড়ির ব্যাপারেই সে টের পেয়েছিল। থানার পাইক জয়রাম ছাড়া অন্য যে কেউ যদি এভাবে ঐ বাড়িতে যাতায়াত করতো তা'হলে তা' নিয়ে গ্রামে একটা সোরগোল উঠতোই। এমনকি ব্যাপারটা হয়তো পঞ্চায়েত পর্যন্তও গড়াতো। নিজের এই স্বতন্ত্র ভাবটুকুর জন্যেই আর পাঁচজন যুবকের মত ভরু মিত্তিরের বাড়ি ছাগ বলি উপলক্ষ্য করে যে হৈ-হুল্লোড় হয় তাতে যোগ দিতে একটু বাধো বাধো ঠেকছিল তার।

বলির বাজনা চলছে। হৃষ্টপুষ্ট ছাগটাকে স্নান করিয়ে পুরুতঠাকুরের কাছে আনা হয়েছে। পুরুতঠাকুর যথারীতি মন্ত্র পড়ে তার মাথায় জল ছিঁটে'চ্ছে—ফুল বেলপাতার অর্ঘ্য সাজাচ্ছে। আর সেই অর্ঘ্য মাটিতে গড়িয়ে পড়তেই ছাগটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে শুরু করেছে সেই ফুল-বেলপাতা। অবোধ পশু। এখনও বুঝতে পারেনি যে এই তার জীবনের শেষ খাওয়া।

হাড়িকাঠ ঘিরে দর্শকেরা। একখানা মাটির সরায় বেলপাতার ওপর খোসা ছাড়ানো একটি কলা। বলির পরে যে রক্ত গড়াবে সেই রক্ত ধরে রাখা হবে ঐ সরায়। বাকি রক্ত ছড়িয়ে দেয়া হবে মণ্ডপের মাটির ভিতের ওপর। বলির মুহূর্তে ঢাকের জোরালো শব্দ ও উপস্থিত দর্শকদের "মা-মা" বলে সম্বধোনে সেই অসহায় পশুর অন্তিম কণ্ঠস্বর কারুর কর্ণগোচর হবে না।

জয়রামকে মণ্ডপে উপস্থিত হতে দেখে যুবকেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—এই যে এয়েছে—এতক্ষণে আসার সময় হয়েছে। একজন এগিয়ে এসে জয়রামের কাঁধে হাত রেখে বললে, কিরে এত দেরি করলি কেন? আমরা কখন থেকে তোর জন্যে হা-পিত্যেস করে বসে আছি।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় জয়রাম, না ভাই, এবার আর আমি এর মধ্যে নেই। এলাম কেবল তোদের হুটোপুটি দেখতে।

বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে একজন, কেনরে? কী হয়েছে এবার? তাই বুঝি খালি গাঁয়ের বদলে কুর্তা পরে এনেছিস?

জয়রাম কিছু জবাব দেবার আগেই আর একজন ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে, থানার পাইক হয়ে এবার বুঝি তোর শিং গজিয়েছে? তাই বুঝি আমাদের সঙ্গে নাচতে আর ভালো লাগছে না তোর?

আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় একটু বিব্রত বোধকরে জয়রাম। তাড়াতাড়ি সে জবাব দেয়, নারে না, সেসব কিছু না। শরীরটা ভালো নয়। তাই—

একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জয়রামের কুর্তার ফিতে খুলতে খুলতে

কৃত্রিম ধমকের সুরে বললে, রেখে দে তো ওসব শরীর খারাপের অজুহাত। আমার নিজেরও তো কাল সাঁঝবেলায় একটুকুন গা-গরম হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি না এসে পারি? সম্বৎসরে এই একটাই তো দিন—

গাঁয়ের যুবকদের প্রস্তুতি দেখে ততক্ষণে জয়রামের সেই স্বাতন্ত্র বোধটুকু উবে গেছে। গাঁয়ের কুর্তাটা খুলে ফেলে ধুতিখানাকে মালকোঁচা দিয়ে পরে নেয় সে। তারপর একটু হেসে দাঁড়ায় দলের মধ্যে।

ঢাকীর ঢাকে বলির বাজনা। কপালে সিঁদুর লেপে নতুন গামছা পরে ছাগ বলির খাঁড়া হাতে কামার। প্রস্তুত ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে ছাগবলির একচেটে অধিকার তার। বিনিময়ে সে পাবে খানিকটা মাংস। মুড়িটা পাবে পুরুত ঠাকুর।

প্রথমে বলি হয় ছাগ। তারপরে চালকুমড়োর ওপর পিটুলি দিয়ে গড়া একটি মানুষ যা বোধহয় অতীতকালের নরবলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সব শেষে একখানি আখ।

ভালয় ভালয় বলি শেষ। ভরুর মুখে তৃপ্তির হাসি। একটা চিন্তা ঘুচলো। গেরস্থের বাড়িতে ছাগবলি একটা চিন্তার ব্যাপার বৈকি। এক কোপে ছাগমুণ্ড ছিন্ন না হলে ঘোর অমঙ্গল। ভরুর বাবার আমলে একবার নাকি তেমন কাণ্ড ঘটেছিল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন ভরুর বাবা। তবে কি পুজোয় কোনরকম ত্রুটি কিম্বা অনাচার হয়েছে? নইলে 'মা' কেন বলি নিলেন না? অবশেষে আবার এলো একটি ছাগ। নতুন করে তৈরি হলো হাড়িকাঠ। এবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো ছাগবলি। কিন্তু তাই বলে ঝঞ্চাট মিটলো না অত সহজে। বলি যখন আটকে গেছে তখন প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আটকে যাওয়া ছাগের মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে তা'দিয়ে করতে হবে যজ্ঞ। এটাই পণ্ডিতদের বিধান। ছেলেবেলায় দেখা এই ঘটনা এখনও মনে আছে ভরুর। তাই পুজোয় নির্বিঘ্নে বলিদানের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে না।

বলি শেষ হলেও বলিদানের বাজনা তো থামেই না বরঞ্চ আরও বেশি উৎসাহে ঢাকী বাজাতে থাকে তার ঢাক। দর্শকদের মধ্যে খালি গা ও মালকোঁচা দিয়ে ধুতিপরা যুবকদের দেখেই অভিজ্ঞ ঢাকী বুঝে নিয়েছিল যে এবার শুরু হবে আর এক ধরনের বলি। এই বলির সঙ্গে পুজোর কোন সম্পর্ক নেই। এটা কেবল ছেলে ছোক্‌রাদের আমোদ।

আখ বলি শেষ হতেই হৈ-হৈ করে যুবকেরা বলির আসরে নেমে পড়।

একজন কামারের হাত থেকে খাঁড়াটা টেনে নিয়ে শুরু করে বীরাষ্টমীর তাণ্ডবনৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেহ দুলিয়ে শুরু করে নাচ। ছাগ বলির দৃশ্য সহ্য করা কষ্টকর বলে স্ত্রীলোকেরা এতক্ষণ দূরেই ছিল। যুবকদের নৃত্য শুরু হতেই তারাও এসে দাঁড়ায় একপাশে।

নাচতে নাচতে হঠাৎ একটি যুবক ছুটে চলে যায় মণ্ডপের পেছনে। আগে থেকেই প্রস্তুতি ছিল। পরক্ষণেই হাত-পা বাঁধা একটা গোসাপকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফেলে হাড়িকাঠের ওপর। উল্লাসধ্বনি জেগে ওঠে দর্শকদের মধ্যে। হাড়িকাঠের ওপর ছটফট করতে করতে গোসাপটা বারে বারে বের করতে থাকে তার জিভ। পরক্ষণেই সেই রক্তমাখা খাঁড়াখানা নেমে এসে ছিন্ন করে তার মুণ্ড।

পশুর রক্তে ব'লির আসর পিচ্ছিল। নাচতে নাচতে যুবকেরা বোধহয় ইচ্ছে করেই পা পিছলে পড়ে যায় তার ওপর। একজন পড়ে গিয়ে আর একজনকেও ফেলে দেয়। তারপর আর একজন—

গোসাপের পরে বলির জন্যে আসে একটা পায়রা। তারপরে মাগুর মাছ। অবশেষে শুরু হয় লেবু—প্রথমে বড় বাতাবিলেবু, তারপরে গন্ধলেবু, সবশেষে ছোট্ট পাতি কিম্বা কাগজি লেবু।

বলি কিন্তু শেষ হয়নি তখনও। লেবুর পরে নানা আকারের সুপারি। ছোট হোক্ বড় হোক্ বলির নিয়ম কিন্তু সেই ছাগ বলির মতই। এক কোপে ছিন্ন করতে হবে। না পারলে প্রায়শ্চিত্ত করতে না হলেও দুয়ো দেবে সবাই।

ঢাক বাজছে দ্রুতলয়ে। মাঝে মাঝে উল্লাসধ্বনি জেগে উঠছে দর্শকদের মধ্যে। রক্তমাখা কাদায় যুবকেরা এক একটি ভূত। নাচের কিন্তু বিরতি নেই। নাচছে জয়রামও। ঢাকের তালে তালে আরতির ঢংয়ে নাচছে সে। হঠাৎ একজন যুবক হাড়িকাঠের ওপর একটি গোলমরিচ রেখে খাঁড়াখানা জয়রামের হাতে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, শেষ বলি গোলমরিচ। বলি দেবে আমাদিগের গাঁয়ের পাইক জয়রাম।

আবার উল্লাসধ্বনি জনতার মধ্যে। মনে মনে শঙ্কিত হয় জয়রাম। এক কোপে দু'ভাগ করতে হবে ঐ গোলমরিচ। না পারলে লজ্জার শেষ থাকবে না। কিন্তু এড়াবার উপায় নেই। খাঁড়া এখন তার হাতে। এই মুহূর্তে এটা হাতছাড়া করা আরও লজ্জাকর।

খাঁড়া হাতে নাচতে নাচতে জয়রাম কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে হাড়িকাঠ। নজর তার ঐ গোলমরিচটির দিকে। পরক্ষণেই হাড়িকাঠের সামনে এসে

দুর্গানাম স্মরণ করে কোপ দেয় গোলমরিচটির ওপর।

—কেটেছে—কেটেছে, চেঁচিয়ে ওঠে একদল দর্শক। পরমুহূর্তেই আর একদল চিৎকার করে ওঠে, কাটে নাই—কাটে নাই। বুকটা কেঁপে ওঠে জয়রামের। সাহস করে হাড়িকাঠের দিকে তাকাতেও পারে না। এদিকে দর্শকেরা ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে হাড়িকাঠের ওপর। পরক্ষণেই একজন যুবক গোলমরিচের খণ্ড দু'টো হাতের চেটোয় রেখে চিৎকার করে ওঠে, এইযে—কেটেছে—কেটেছে। দুইভাগ হয়ে গেছে গোলমরিচ। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আবার জেগে ওঠে উল্লাসধ্বনি।

ঢাকের বাজনা থামে। থামে যুবকদের নাচও। কিন্তু এবার যুবকদের মধ্যে শুরু হয় অন্য এক ধরনের খেলা—একটা আস্তনারকেল নিয়ে কাড়াকাড়ি। উল্লাসধ্বনি দর্শকদের মধ্যে নারকেলটি একবার এর হাতে, একবার ওর হাতে। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কেউ পড়ে যায় পা পিছলে। কেউ বা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপর। হাতের নারকেল ছিট্‌কে পড়ে মাটিতে। ছুটে গিয়ে আর একজন তুলতে যায় সেটা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন সেটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সবশেষে নারকেলটা এসে পড়ে জয়রামের হাতে। বার কয়েক জয়রাম সেটা নিজের দু'হাতে লোফালুফি করে অন্যদের ধোঁকা দিয়ে অবশেষে সেটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। শেষ হয় বীরাষ্টমীর আনন্দ উৎসব।

বিজয়া দশমীর দিন প্রায় সারাটা দিনই জয়রাম ছিল ভরুর পুজোমণ্ডপে। অবশেষে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে একটু রাত করে বাড়ি ফিরতেই এলোকেশী কাছে এসে ম্লান মুখে বলবে, তরি তো এখনও ফিরলো না, বাবা।

চম্‌কে ওঠে জয়রাম। এলোকেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, বলছো কি মা? কোত্থেকে ফিরলো না? কোথায় গেছে সে?

অপরাধীর স্বরে জবাব দেয় এলোকেশী, আমাকে বলেই গেছে। খেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বেলা প্রায় তিন পহর। আমাকে এসে বললে, আজ তো মা বিসজ্জন। মনটা ভালো লাগছে না। একবার যাবো সইয়ের বাড়ি? কথা শুনে ভাবলাম, সত্যিই তো, আজ বিজয়া। এঁয়োরা সব আজ ঠাকুর বরণ করবে। ওর তো সেখানে যেতে নাই। তাই বুঝি মন খারাপ। সইয়ের কাছে মনটা হয়তো ভালো হবে। তাই বললাম, যা। তবে বেশি দেরি গেলে করিস্‌ না। সেই যে গেল, এখনও ফেরার নাম নাই। একবার যা না বাবা কৈবর্ত্তপাড়ায়।

বিজয়া দশমীর দিন রাগারাগি করতে নেই জেনেও নিজেও আর স্থির রাখতে পারে না জয়রাম। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, এসব কী হচ্ছে মা? একটা বিধবা মেয়ে। এত রাত অবধি বাইরে থাকলে লোকে কি বলবে? আর তুমিও কিনা ওর তালে তাল দিয়ে—

জয়রামের কথার মধ্যেই আবার বলে ওঠে এলোকেশী, মাঝে মাঝেই তো যায়, কিন্তু এমন দেরি তো কোনদিন করে না। আমার কি মনে হয় জানিস?

জয়রাম জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই এলোকেশী বললে, আমার মনে হয় সইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আজ একটুকুন দেরি হয়েছে। এদিকে সবাই গেছে বিসর্জন দেখতে। বাড়িতে এমন কেউ নাই যে মেয়েটাকে এখানে দিয়ে যেতে পারে। তাই বোধহয় আসতে পারছে না। তুই একবার যা, বাবা। মেয়েটাকে নিয়ে আয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায় জয়রাম। দেহখানার ওপর দিয়ে আজ সারাদিন বড়ই ধকল গেছে। কাল আবার সাতসকালে থানায় যেতে হবে—পুণ্ডরীকের হুকুম। থানার হরকরা ছিদাম মারফৎ খবর পাঠিয়েছে পুণ্ডরীকাক্ষ। জয়রাম ভেবেছিল একটু তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়বে। কিন্তু কপালে তা' নেই। এখন ছোটো সেই কৈবর্ত্তপাড়ায়। ধরে নিয়ে এসো সেই ধিঙ্গি মেয়েটাকে।

পথে যেতে যেতে মনে মনে সংকল্প করে জয়রাম। আজ বিজয়া দশমীর দিন চুপ্ করেই থাকবে। কাল তরির ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না। ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে তরি ছাড়া আরও তো কয়েকটি বালবিধবা রয়েছে। কিন্তু তারা তো কেউ তরির মত এভাবে গাঁ-ময় ঘুরে বেরায় না।

একদণ্ড দু'দণ্ড করে প্রায় প্রহর গড়িয়ে যায়। মাটির দাওয়ায় রেড়ির প্রদীপের সামনে উবু হয়ে বসে থাকে এলোকেশী। প্রৌঢ়া এলোকেশীর দেহে বড় তাড়াতাড়ি বার্দ্ধক্য এসে পড়েছে। পাক ধরেছে চুলে। জেগে উঠেছে কণ্ঠার হাড়। চোখের কোণে কালি। তরঙ্গ বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর থেকে বড়ই তাড়াতাড়ি শরীর ভেঙ্গে পড়েছে এলোকেশীর, বোধহয় মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তায়।

অবশেষে এক প্রহর পার করে দিয়ে বাড়ি ফেরে জয়রাম। সঙ্গে তরির বদলে গাঁয়ের তিনচারজন যুবক। জয়ের চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্তি।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় এলোকেশী। বেসামাল আঁচলটা সামলাতে সামলাতে শংকিত কণ্ঠে সে জয়কে জিজ্ঞেস করে, ওকি, একা ফিরিলি যে? তরি কোথায়? এলোকেশীর শেষের কথাটা প্রায় আর্তনাদের মত শোনায়।

জয়রাম কোন কথা না বলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাওয়ায় বসে পড়ে। এলোকেশী দু'পা এগিয়ে এসে তেমনি স্বরে আবার বলে ওঠে, ওকি, কথা কইছিস্ না কেন? তরি কোথায়?

—নেই—কোথাও নেই। কথাটা উচ্চারণ করে জয়রাম হতাশ ভঙ্গিতে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে।

ডুকরে কেঁদে ওঠে এলোকেশী। দু'হাতে খুঁটিটাকে চেপে ধরে কান্নার বেগে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে জড়িত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, কোথায় তরি? কী হয়েছে তার? ওরে তোরা চুপ্ করে থাকিস না। বল্ তোরা, আমার তরি কোথায়?

এবার যুবকদের মধ্যে একজন ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয়, কৈবর্ত্তপাড়া ওর সইয়ের বাড়িতে মেয়েটা যায় নাই, খুড়িমা। কেবল কৈবর্ত্তপাড়ায় কেন, আমরা গোটা গ্রামখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কোথাও সে নাই।

কাঁদতে কাঁদতে ততক্ষণে সেখানেই বসে পড়েছে এলোকেশী। কান্নার মধ্যেই সে আবার বলতে থাকে, তোরা বাবারা আর একটুকুন কষ্ট কর্। গাঁয়ের পুকুরগুলো একবার খুঁজে দেখ্। আমার মন বলছে মেয়েটা আত্মঘাতী হয়েছে। বড়ই মন্দ অদেষ্ট নিয়ে জন্মেছিল মেয়েটা। সেই দুঃখেই বোধহয় –

এলোকেশীর কথায় যুবকেরা পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকায়। ঠোঁটের কোণে তাদের চাপা হাসি। হঠাৎ সেই দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায়, ঘৃণায় মাথাটা ঘুরে ওঠে জয়রামের। সোজা হয়ে বসে এলোকেশীর দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে, না মা, না। তোমার তরি জলে ডুবে মরে নাই। মরলে তো বাঁচতাম। উঁচু মাথা এভাবে নীচু হতো না আমার। বংশের মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে সে ঐ কব্‌রেজের ছেলেটার সঙ্গে পালিয়েছে।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে স্থির হয়ে থাকে এলোকেশী। কথাটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনি চোখে সে জয়রামের বদলে অন্য যুবকদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটি যুবক তখন বললে, হ্যাঁ খুড়িমা। আজই বিকেলে ঐ মুচিপাড়ার বদন ভবানীকে বড় বহেরার দিকে যেতে দেখেছে। সঙ্গে একজন বেধবা। ঘোমটা ঢাকা থাকায় বদন তার মুখ দেখতে পায় নাই। ঐ বেধবা তরি ছাড়া আর কেউ নয়, খুড়িমা।

ঘরের দাওয়ায় ও উঠোনে স্থির হয়ে রয়েছে কয়েকটি মানুষ। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। বাইরের হাওয়ায় প্রদীপের শিখাটা থর থর করে কেঁপে উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখগুলোকে সেই মুহূর্তে কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছিল।

লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে বেশ কয়েকটা দিন বাইরেই বেরোয় না জয়রাম। ঢি-ঢি পড়ে গেছে সারা গ্রামে। প্রায় সবার মুখেই ছি-ছি। শেষপর্যন্ত ঐ বেধবা মেয়েটা এমন একটা কাজ করে বসলো? কলি—কলি—ঘোর কলি। নইলে ঐটুকুন একটা পুঁচকে মেয়ের মাথায় এমন দুর্বুদ্ধি আসবে কেন? কেউ বা দোষারোপ করে নরহরি কবরেজের বদ ছেলেটাকে। ঐ ভাবনীই যত নষ্টের গোড়া। মেয়েটাকে বোকা পেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। ওর যা চরিত্তির! দু'চার দিন মজা লুটবে, তারপর হয়তো বেচে দেবে অন্য কারুর কাছে।

কন্যার শোকে বিছানা নিয়েছে এলোকেশী। চোখে কেবল জলের ধারা। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে কেবল জয়রামের উদ্দেশে বলে, ও-জয়, জয় রে। একবার তোর রমজান চাচাকে খবর দে। কেন আমি সেদিন তার কথা শুনি নাই রে? কেন আমি সেদিন তার কথায় সন্দ করেছিলাম রে?

খবর দিতে আর হলো না। রমজান একদিন নিজেই এসে হাজির হলো। এলোকেশী অতি কষ্টে বিছানা ছেড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই জয়রাম ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে বলে ওঠে, একী মা, তুমি যে আবার মাথাঘুরে পড়ে যাবে।

ছেলের কাঁধে মাথা রেখে ক্লান্ত কণ্ঠে থেমে থেমে এলোকেশী বলতে থাকে, না রে জয়, ভাবিস না। কিছু হবে না আমার। তোর চাচা এয়েছে। ওনার কাছে আমার অপরাধের শেষ নাই। সেদিন যদি ওনার কথা শুনতাম তা'হলে আজ আর এমন হত না রে।

উঠোনে দাঁড়িয়েছিল রমজান। এলোকেশীর কথায় সে জবাব দেয়, এসব আপনি কী বলছেন, জয়ের মা? কীসের অপরাধ আপনার? সবই আল্লার মর্জি। আপনি-আমি কী করতে পারি?

একটু সময় চুপ করে থেকে রমজান আবার জয়ের উদ্দেশে বললে, হ্যাঁরে জয়, ছোট একটা মেয়ে না হয় ভুলই করেছে। তাই বলে তুই তার বড়ভাই হয়ে একবার খোঁজ-খবরও করবি না?

—না চাচা, দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে জয়, আমাকে আর ঐ অনুরোধ করো না।

মনে করবো, তরি মরে গেছে। কথার শেষে জয়ের চোখদু'টা ছল্ ছল্ করে ওঠে।

জবাব দেয় রমজান, না রে জয়, এভাবে চুপ্ করে থাকা ঠিক না। তোর বেধবা বোন না হয় ইচ্ছা করেই একজনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু আজ যদি ওকে ডাকাতরা তুলে নিয়ে যেত? যদি মেয়েটার উপর কুনজর পড়তো জমিদারের? যদি মেয়েটা বিদেশী ফিরিঙ্গিদের হাতে পড়তো? তা'হলে তুই কী করতিস?

—কিছুই করতাম না চাচা, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয় জয়রাম, জানো তো চাচা, আমাদের সমাজের নিয়ম-কানুন বড়ই শক্ত। ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, একবার বেরোলে আর ফেরা যায় না।

রামজান ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে সবই জানি। কিন্তু মন মনে কৈ? একটা অবোধ মেয়ে—।

ভবানী ও তরঙ্গর এভাবে উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের যে যাই-ই বলুক না কেন, ভবানীর বাপ নরহরি কবিরাজ কিন্তু সব দোষ চাপায় তরঙ্গর ওপর। গলা ছেড়ে প্রকাশ্যেই সে বলে, ঐ হতচ্ছাড়ি রাঁড়ি মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। নিজের কপাল পুড়িয়ে গাঁয়ে ফিরে এসে তক্কে তক্কে ছিল। আমার বোকাসোকা ছেলেটাকে হাতের কাছে পেয়েই গিলে খাবার মতলবে সঙ্গে নিয়ে ভেগেছে। আরে বাপু, আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। বুঝি সবই। ঐ মা-ভাই দু'টোও এর মধ্যে আছে। নইলে ঐ একরত্তি মেয়েটার এমন সাহস হয়?

সব কথাই কানে আসে জয়রামের। কিন্তু জবাব দিতে পারে না। তা'ছাড়া, জবাব দেবার মত কি-ই বা আছে? তরঙ্গ যে ভবানীর সঙ্গে পালিয়ে'ছ তা'তো মিথ্যে নয়। এখন কে দায়ী, কে নয় তা' নিয়ে ঝগড়ায় নেমে লাভ কী? এ ধরনের কথাবার্তা তো এখন হতেই পারে। পাঁক যত ঘাঁটবে ততই গন্ধ ছড়াবে। তার চাইতে চুপ্ করে থাকাই ভালো।

একদিন দু'দিন করে মাস গড়ায়, কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া যায় না ভবানী ও তরঙ্গর। বাতাসের অভাবে আগুন নিভে যাবার মত প্রতিবাদের অভাবে নরহরি কবিরাজের কণ্ঠস্বরও একদিন স্তিমিত হয়ে আসে।

দশ

দিন যতই গড়িয়ে যায় প্রশাসনের ভিত ততই দুর্বল হতে থাকে। গ্রাম বাংলার জমিদার-নির্ভর প্রশাসন। নবাবী আমলে জমিদারি নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না জমিদারের। নবাব দরবারে বার্ষিক কর পৌঁছে দিতে পারলেই নবাব খুশি। এবার যেমনি ইচ্ছে তেমনি ভাবেই নিজের জমিদারিতে প্রশাসন-রথ চালাও। খারাপ হোক্ ভালো হোক্ প্রশাসন-রথের চাকা থেমে যায় না কখনও। কিন্তু এই ইংরেজ আমলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তখনও সৃষ্টি করতে পারেনি তারা। এদিকে নিজ নিজ জমিদারির ভবিষ্যৎ নিয়ে জমিদারেরা এতেই উদ্বিগ্ন যে থানাদারদের কাজ-কর্মের ওপর নজর রাখার কোন ইচ্ছাই তাদের আর রইলো না। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস ব্যস্ত নিজেদের ঘর সামলাতে। সেই কাজে কোন অপরাধই তাঁর কাছে অপরাধ নয়। কখনও তিনি চোখ রাঙাচ্ছেন জমিদারকুলকে, কখনও বা ষড়যন্ত্র করে ফাঁসির দড়িতে লটকাচ্ছেন মহারাজ নন্দকুমারের মত মানুষকে।

থানার কাজ শেষ বাড়ি ফেরার পথে জয়রাম একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় চিতলমারীর নন্দীবাড়িতে। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে তাকে দেখে বাড়ির সবাই অবাক্। লাবণ্যর বড়মা হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করতেই সে জয়রামের মাথায় হাত ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে ম্লান কণ্ঠে বললে, এতকাল কি আমাদের ভুলে গিয়েছিলে, বাবা?

জয়রাম কিছু জবাব দেবার আগেই হেমাঙ্গিনী আবার বললে, জানি বাবা, সবই শুনেছি। তোমার উপর দিয়ে ঝড়ঝাঁপ্টা কম যায় নাই। আর সেই শরমভরমেই বোধহয় এদিকে এতদিন আসো নাই। তা' বাবা, তুমি আর কী করবে? বেধবা বোন যদি ঘর ছাড়ে তাহ'লে ভাই তা' কেমন করে ঠেকাবে?

লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে জয়। বাস্তবিক, এই জন্যেই সে এতদিন এদিকে আসে নি। আশেপাশের গ্রামে পরিচিতদের মধ্যে তরঙ্গর ব্যাপারটা যে কারুর আর অজানা নেই সেকথা বুঝতে পেরেই সে একদিন এপথ মাড়ায় নি।

চুপ্ করে থাকা আর ভালো দেখায় না ভেবে জয়রাম কিছু বলার জন্যে মুখ তুলতেই দরজার দিকে নজর পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই

তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, একি লাবণ্য!

লাবণ্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরে যায় সেখান থেকে। হেমাঙ্গিনী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, হ্যাঁ বাবা, আর কিছু না থাকুক এতদিন মেয়েটার ঐ শাঁখা-সিঁদুরটুকুন বজায় ছিল, এখন আর তাও নাই। বাপের মাথা বাঁচাতে সেই শত্তুর নিজে জখম হয়েছিল। দু'দিন পরেই নাকি মরলো। আমরা খবর পেলাম এতকাল পরে।

মিথ্যে বলেনি হেমাঙ্গিনী। লাবণ্যর স্বামী রজনীকান্তের মৃত্যু হয়েছিল প্রায় সাত-আটমাস আগে সেই চৈত্রমাসের একেবারে শেষের দিকে। রজনীকান্তের বাপ নয়নচাঁদের কিছু জমিজমা ছিল তাদের গ্রাম থেকে বহুদূরে কুর্মডাঙ্গা গ্রামে। গ্রামটি উদ্ধারণপুরের কাছাকাছি। নয়নচাঁদ সেই জমিজমার তদারকিতেই গিয়েছিল ছেলে রজনীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে। অদৃষ্টের পরিহাস। বাপ-ছেলের সেটাই ছিল অগস্ত্যযাত্রা। এমনকি প্রতিকারের জন্যে সেখানকার থানায় গিয়েও কোন লাভ হয়নি। উল্টে, থানাদার ধমকে উঠে বলেছিল, এসব কি এই অঞ্চলে নতুন নাকি হে? এসময় যখন এদিকে পঞ্চাশ-ষাটজন লাঠিয়াল সঙ্গে না নিয়ে কেউ উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যায় না তখন তোমরা সাত-আটজন মানুষ কোন্ সাহসে মড়া নিয়ে বেরিয়েছিলে?

দোষ অবশ্য রজনীকান্তের নয়। পিতৃবাক্য পালন করতে গিয়েই বিপাকে পড়তে হয়েছিল তাকে। বাপের হুকুমে এককথায় লাবণ্যকে ত্যাগ করে যে লোকের দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধেনি, তার পক্ষে বাপের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করাই তো স্বাভাবিক।

কুর্মডাঙ্গা গ্রামে জমিজমা দেখাশোনা করতে গিয়ে ভেদবমিতে মারা গিয়েছিল নয়নচাঁদ। মৃত্যুর আগে সেই প্রৌঢ় মানুষটি ছেলের হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, দেখিস বাবা, গঙ্গা পাই যেন। উদ্ধারণপুরের ঘাটের চিতায় আমাকে তুলিস।

উদ্ধারণপুরের শ্মশানের পথেই ঘটলো সেই বিপত্তি। প্রথমে ঐ এলাকার কোন যুবকই রাজি হয়নি মড়ায় কাঁধ দিতে। সবার মুখেই এক কথা—ওরে বাবা, চৈত্র-সংক্রান্তির মুখে কে যাবে ঐ তল্লাটে? বোলানের দল নেমে পড়েছে। তার চাইতে এখানেই মাঠে-ঘাটে দাহ করে গলায় কাছা নিয়ে বাড়ি যাও।

কিন্তু রজনীকান্তের ইচ্ছা তা' নয়। বাপ্ বলে কথা। সেই বাপের শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পারবে না তার মত উপযুক্ত ছেলে? কাজেই সে ধরে পড়লো দেবাকে। ভালো নাম দিবাকর—ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পরোপকারী

যুবক। এককথায় সর্বঘটের কাঁঠালি কলা। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দেবা ছাড়া গতি নেই। আর ঐ পরোপকারের সূত্রেই নেশা-ভাঙের খরচটা তার মোটামুটি চলে যায়।

রাজি হলো দেবা। প্রথমে কথা ছিল জনা পঁচিশ লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। রজনীকান্ত সেইমত খরচাপত্তরও তুলে দিয়েছিল দেবার হাতে। কিন্তু মড়া কাঁধে তোলার মুহূর্তে দেখা গেল লাঠিয়াল সমেত মাত্র সাত-আটজন লোক। রজনীকান্তের প্রশ্নের জবাবে চোখ পিট্ পিট্ করে দেবা বলেছিল, ভয় নাই, এতেই হবে। দেবার দলের কাছাকাছি কেউ আসবে না। নিশ্চিন্দি থাকো।

দেবার আশ্বাসেই অবশেষে বাপের মড়া নিয়ে রজনীকান্ত রওনা হয়েছিল উদ্ধারণপুরের পথে। মড়া বাসি হবার ভয়ে সেই রাতেই রওনা হয়েছিল তারা। লাঠি কাঁধে মশাল হাতে সামনে-পেছনে দু'জন। বাকিরা মাঝখানে। চারজনের কাঁধে বাঁশের মাচার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়নচাঁদের মৃতদেহ। বোলান দলের আবির্ভাব আশঙ্কায় শবযাত্রীদের মুখ গম্ভীর। এমনকি রজনীকান্ত পর্যন্ত পিতৃশোক ভুলে ঐ বোলান দলের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলছিল।

চৈত্র সংক্রান্তির মুখে ছোট-বড় নানা আকারের দল বেরোয়। দূর-দূরান্ত গাঁ ঘর প্রতিষ্ঠিত শিবের মন্দিরের অনুচর এরা। কেউ সাজে শিব, কেউ বা মুখে চোখে রং মেখে হয়ে যায় নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত, প্রেত, পিশাচ। হাতেতে থাকে মানুষের মাথার আসল খুলি ও নকল খড়্গ। এই বেশেই গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করে তারা এগিয়ে চলে উদ্ধারণপুরের স্নানের ঘাটের দিকে। আর স্নানযাত্রার আগের দিন কালরুদ্রের মন্দিরের সামনে এসে জড়ো হয় তারা। রাতভর চলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বোলান গান। সেই গানের আসরে কোন দল যদি সত্যিকারের একটা নরমুণ্ডের মাথার চুল ধরে আসল ডাকাত দলের মত রে—রে হুঙ্কার ছেড়ে এসে লাফিয়ে পড়তে পারে তা'হলেই একেবার কিস্তিমাৎ। বহুদিন পর্যন্ত সেই দলের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

সেকালে বোধহয় দলগুলো জ্যান্ত মানুষের মুণ্ডের সন্ধানেই থাকতো। কিন্তু সেদিন আর নেই। জমিদারি প্রশাসনে নরহত্যা ঘোরতর অপরাধ। তার ওপর একালে আবার ইংরেজদের চোখ রাঙানি। তাই জ্যান্ত মানুষের মুণ্ডের বদলে একালে ঐ দলগুলো মড়ার মুণ্ডের সন্ধানেই থাকে। সুযোগ পেলেই এককোপে মড়ার মুণ্ডু কেটে নিয়েই উধাও। থানাদারেরাও এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। অসহায় শবযাত্রীরা শেষপর্যন্ত ঐ স্কন্ধকাটা মৃতদেহই শ্মশানের

চিতায় তুলে ঘাড়ের কাছে প্যাকাটির গোছা ঠেকিয়ে মুখাগ্নির নিয়ম রক্ষা করে।

রাত বাড়ে। শ্মশান যাত্রীদের কাছে উদ্ধারণপুরের দূরত্ব যতই কমতে থাকে ততই বাড়তে থাকে তাদের মনোবল। বিশেষকরে দলনেতা দেবার মুখফুটে বেরোতে থাকে তার নিজের শৌর্যবীর্যের সব কাল্পনিককাহিনী। অবশেষে উদ্ধারণপুরের প্রায় কাছাকাছি এসে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের নীচে খাটিয়া নামায় বাহকেরা। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখানেই এবার ছোট কল্কের প্রসাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মৃত নয়নচাঁদের খাটিয়া ঘিরে বাহক ও লাঠিয়ালেরা। ছোট কলকেটি এর হাত থেকে ওর হাতে ঘুরতে থাকে চক্রাকারে। মৃতের খাটিয়া ছুঁয়ে ম্লান মুখে বসে থাকে রজনীকান্ত।

হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জেগে ওঠে হা-রে-রে-রে শব্দ। পরক্ষণেই দেবার দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবের অনুচরেরা। প্রাণ বাঁচাতে দেবার দল ততক্ষণে হাওয়া। ছোট কলকেটি ও লাঠিয়ালদের দু'একটা লাঠি কেবল পড়ে থাকে সেখানে।

সবাই পালালেও বাপের মড়া ফেলে রজনীকান্ত পালাতে পারে না। নয়নচাঁদের মুণ্ড কাটার মুহূর্তে রজনীকান্ত তুলে নেয় একখানা লাঠি। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনে নেমে আসে অন্ধকার।

অবশেষে একসময় ফিরে আসে দেবার দল। তাদের চেষ্টায় রজনীকান্ত একবার চোখ মেলে তাকিয়ে স্কন্ধকাটা বাপের মৃতদেহ দেখেই আবার চোখ বোজে। আহত রজনীকান্ত গ্রামে ফিরে এসে মাত্র দু'টো দিন জীবিত ছিল। অবশেষে সেও ধরে নয়নচাঁদের পথ। বাপ-ছেলের কেউই আর ফিরতে পারলে না নিজেদের গাঁয়ে।

বিধবাবেশী লাবণ্যর সঙ্গে সেদিন জয়রামের মুখোমুখি দেখা না হলেও দিন কয়েক পরেই একদিন সেই পুকুর পাড়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল তারা। জয়রাম যেন চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না লাবণ্যের মুখের দিকে। ওর ঐ বিধবার বেশ সহ্য করতে পারছিল না জয়রাম। তা'ছাড়া সেই মুহূর্তে একা একটি সুন্দরী বিধবারি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল তার। জয়রামের চোখের সামনে বারে বারে কেবল ভেসে উঠছিল নরহরি কবিরাজের ছেলে ভবানীর মুখ।

একসময় জয়রাম মৃদু কণ্ঠে বললে, পাপের ঘড়া পূর্ণ হয় এভাবেই।

জয়রামের কথাটা ধরতে না পেরে লাবণ্য কেবল জিজ্ঞাসু চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলতে থাকে জয়রাম, না-না, তোমার স্বামীর কথা বলছি না। বলছি তার বাপের কথা। আমার তো মনে হয় আজ তোমার এই অবস্থার জন্য আসল দায়ী ঐ বাপটা। তার পরামর্শেই তো—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় জয়রাম। তারপর আবার বলতে থাকে, থাক্ ওকথা। আমি এখন ভাবছি কেবল তোমার কথা।

—আমার আর কী কথা? মাথা নীচু করে শান্ত কণ্ঠে লাবণ্য বললে, যার ভাবনার কথা সে যখন কোনদিন আমার কথা ভাবে নাই তখন তুমি ভেবে আর কী করবে গো? তা'ছাড়া, আমি আগেও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। শাড়ির বদলে থান ধুতি—এটুকুনই যা তফাৎ।

স্বামী পরিত্যক্তা সধবা লাবণ্যর সঙ্গে এমনি নিভৃতে কথা বলা জয়রামের নতুন নয়। এমনকি এক-আধবার লাবণ্যের উষ্ণ নরম হাতখানা স্পর্শ করার সুযোগও তার ঘটেছিল। লাবণ্যর তরফ থেকে এতে কোন উৎসাহ না থাকলেও সে কখনও বাধাও দেয় নি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশি একচুলও সে এগোতে দেয় নি জয়রামকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঐ বিধবাবেশী নারীর হাতখানা স্পর্শ করতে কেমন যেন ভয় করছিল জয়রামের। এক ধরনের নীতিবোধ হঠাৎ যেন পথ আগলে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার চাইতেও বড় কথা, তার হারিয়ে যাওয়া বিধবা বোন তরঙ্গর মুখখানা যেন বারে বারেই ভেসে উঠছিল তার চোখের সামনে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসে লাবণ্য। এতদিনে যা করে নি তাই সে করে বসলো। জয়রামের শীতল হাতখানা নিজের উষ্ণ দুটি হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ধরা গলায় বললে, জানো গো ছোটপাইক, বড়ই দেরিতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এখন ভাবি আগে দেখা হলে আমার জীবনটা হয়তো অন্য ধাঁচের হতো। হ্যাঁগো ছোটপাইক, স্বামীর ঘরে আমার ঠাঁই হয় নাই। সেই দুঃখ অনেকখানি ভুলেছিলাম তোমার নাগাল পেয়ে। অসম্ভব বুঝেও তোমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভাবতাম। সুখ পেতাম তাতে। কিন্তু হাতের শাঁখা ভেঙ্গে কপালের সিঁদুর মুছে এখন খেয়াল হয়েছে সেসব ছিল কেবল পাগলামী। আমার জীবনটা হেজে-মজে গেছে বলে তোমার জীবন মাটি হবে কেন গো ছোটপাইক? তুমি বিয়ে করবে—গেরস্থালি করবে—। কথাটা শেষ না করেই মাথা নীচু করে থাকে লাবণ্য। জয়রাম লক্ষ্য করে লাবণ্যর চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে তার পরনের কাপড়ের ওপর।

এতক্ষণ লাবণ্যই ধরে রেখেছিল জয়রামের হাতখানা। এবার কিন্তু জয়রামই শক্ত হাতে লাবণ্যর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে আবেগের সুরে বলে ওঠে, না-না লাবণ্য, আমি চিরকাল তোমার কাছেই থাকবো। আমি তোমাকে —তোমাকে—

—কি, বিয়ে করবে নাকি গো? হঠাৎ কণ্ঠস্বর পাল্টে হালকা সুরে বলে ওঠে লাবণ্য, তুমিও যে আমার মতই পাগল হয়ে উঠলে গো ছোটপাইক। আমার মত একটা বিধবাকে বিয়ে করে এতল্লাটে তুমি থাকতে পারবে?

—না পারি অন্য কোন গাঁয়ে চলে যাবো।

—তোমার পাইকের কাজ? জমিদারের কাছ থেকে পাওয়া তোমার চাকরাণি জমিজমা?

—সব ছেড়ে দেব। সব ফেলে রেখে চলে যাবো।

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় লাবণ্য, না ছোটপাইক তা' হবার নয়। নিজেকে তো নরকে যেতেই হবে। কিন্তু তোমাকে সেখানে আমি টেনে নিয়ে যেতে পারবো না গো।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে জয়রাম, কেন, তুমি এমন কী করেছ যে তোমাকে নরকে যেতে হবে?

সজল চোখে জবাব দেয় লাবণ্য, নরক ছাড়া আমার গতি কোথায়? স্বামী ছাড়া যে মেয়েলোকের মন পরপুরুষের দিকে ধায় তার ঠাই নরকেও হয় না। এতদিন এসব বুঝেও ঐ লোকটার সঙ্গে জেদ করেই তোমাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু মরা মানুষের সঙ্গে তো আর জেদ করা চলে না, ছোটপাইক।

—তাই বুঝি এবার আমাকে মন থেকে তাড়াতে চাইছো?

—হুঁ্যা, চাইছিল গো, স্পষ্ট জবাব লাবণ্যর, তবে চাইলেই কি পারবো? জানি না, ছোটপাইক।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামের মুখখানা অভিমানে ভারি হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ম্লান কণ্ঠে সে বললে, বেশ তাই হবে। আমি আর কোনদিন তোমার চোখের সামনে আসবো না।

জয়রামের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে মৃদু হেসে লাবণ্য আবার বললে, কিন্তু তোমাকে মন থেকে তাড়াবো কেমন করে?

জয়রাম কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে। রহস্যময় সুরে বলে ওঠে লাবণ্য, আমার একটা কথা রাখবে, ছোটপাইক?

—কি কথা? কৌতূহলী চোখে লাবণ্যর দিকে তাকায় জয়রাম।

তেমনি রহস্যময় সুরেই জবাব দেয় লাবণ্য, তুমি যদি আমার কথাটা রাখো তা'হলে বোধহয় তোমাকে আমি মন থেকে তাড়াতে পারবো। বল, আমাকে এই সাহায্যটুকুন তুমি করবে ?

লাবণ্যর কথার ধরনে সেইমুহূর্তে চোখ ফেটে প্রায় জল এসে পড়েছিল জয়রামের। নিজেকে সামলে নিয়ে সে জবাব দেয়, বেশ, রাখবো। আমাকে মন থেকে তাড়াতে তুমি আমার কাছে যে সাহায্য চাইবে তাই পাবে।

—কথা দিচ্ছ ?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

একটু সময় চিন্তা করে লাবণ্য। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, আমার ছোট বোন রাধাকে তো তুমি দেখেছ। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে তুমি বে করো।

—রাধাকে বিয়ে করবো ? স্খলিত কণ্ঠে বলে ওঠে জয়রাম।

জবাব দেয় লাবণ্য, কেন গো, ও কি তোমার যুগ্যি নয় ? দেখতে শুনতে ভালো। বে'র বয়সও হয়েছে।

—না, সেকথা বলছি না, বলতে থাকে জয়রাম, আমি বুঝতে পারছি না তাতে তোমার নিজের কী উপকার হবে ?

—ও তোমরা পুরুষেরা বুঝতে পারবে না, লাবণ্য বলতে থাকে, আমার আদরের ছোটবোন রাধা। ওর সুখের জন্য আমি সবকিছু করতে পারবো। এতদিন তোমাকে যে চোখে দেখেছি সেই চোখে আর দেখবো না। তুমি হবে আমার মত এক বিধবার ছোটবোনের আদরের বর। রাখবে গো ছোট-পাইক, আমার এই কথাটা রাখবে ?

জয়রাম সেদিন লাবণ্যকে কোন জবাব না দিয়ে নন্দীবাড়ী থেকে ফিরে এলেও বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ভাবনা-চিন্তা করলে। বিধবা লাবণ্যকে বিয়ে করে দেশান্তরী হওয়া কোন কাজের কথা নয়। থানার পাইকের কাজ, জমিজমা, অসুস্থ মা এলোকেশীকে ছেড়ে সে যাবে কোথায় ? তা'ছাড়া, লাবণ্য নিজেও এতে রাজি নয়। কাজেই আজ হোক কাল হোক বিয়ে তাকে করতেই হবে। রাধা মেয়েটিও দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। তা'হলে তাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায় ? এতে আর কিছু না হোক লাবণ্য কোনদিন তার চোখের আড়াল হবে না।

বিয়েতে ছেলের মত হয়েছে শুনে এলোকেশী তো মহাখুশি। জয়রাম বললে, হ্যাঁ মা, সংসারের পিছনে চিরকাল তো খেটেই গেলে তুমি। বাবা গত হবার পর থেকে কোনদিনই তো সুখের মুখ দেখলে না। তাই ভাবছি আর

না করবো না। দেখে শুনে এবার একটি বউ ঘরে আনো।

স্বামী জনার্দনের প্রসঙ্গে এলোকেশীর উজ্জ্বল মুখখানা সামান্য ম্লান হয়ে ওঠে। মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ বাবা, দেখে-শুনে একটি ভালো বউ ঘরে আনতে হবে। কিন্তু বাবা, ভাবনা হচ্ছে দেখবে-শুনবে কে? আমি নিজে তো মরতে বসেছি। শরীলের যা হাল, সংসারের এইটুকুন কাজকম্ম করতেই হাঁপ ধরে। এক ছিল ঐ শত্তুর মেয়েটা, সেটাও তো মুখে চূণকালি লেপে দিয়ে দেশ ছেড়েছে। বেঁচে আছে কি মরেছে তাও জানি না। কাজেই সবকিছু তো তোকেই করতে হবে, বাবা।

—তা' নাহয় করলাম মা, বলতে থাকে জয়রাম, কিন্তু পাত্রী বাছাই—

—তার জন্য তো ঘট্‌কী রয়েছে। তাকেই খবর দেব। আর তুই নিজে একবার তোর রমজান চাচাকে খবর দে। আমাদিগের দরকারে তো ঐ মানুষটাই ভরসা।

ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের পুরানো ঘট্‌কী খবরটা শুনেই চোখ মটকে বললে, ভালো কন্যে কি আর পাওয়া যাবে গো? বেধবা বোনের ঘর ছাড়ার খবর শুনে কে আসবে ঐ ঘরে কন্যে দিতে? তা বাপু, দেখি একটুকুন চেষ্টা-চরিত্তির করে।

ঘট্‌কীকে আর তেমন করে চেষ্টা-চরিত্র করতে হলো না। তার নিজের ঝুলিতে যে ক'টা অচল পাত্রী ছিল তাদের একটাকেও জয়রামের কাঁধে চাপাতে না পেরে যখন সে আরও দু'একটা পাত্রীর খোঁজ খবর করছিল ঠিক তখনই তার কাছে একটি ভালো পাত্রীর খবর এলো চিতলমারী গ্রামের নন্দীবাড়ি থেকে। চমৎকার হাতযশ সেই ঘট্‌কীর। এককথায় রাজিও হয়ে গেল দু'পক্ষই। সবকথা জানার পরেও জয়রামের জন্যে যে এমন চমৎকার একটি পাত্রী জুটে যাবে তা' কিন্তু সেই ঘট্‌কী নিজেও বুঝতে পারেনি।

বিয়ের দিন জয়রাম এমন একটা কাণ্ড করে বসলে যে কেবলমাত্র ঘুঘুডাঙ্গা ও চিতলমারী গাঁ দু'টোই নয় গোটা তল্লাটের মানুষ যে-ই খবরটা শুনলে সে-ই ছি-ছি করতে লাগলে। বিশেষকরে বরযাত্রীরা তো জয়রামের মুখের ওপর স্পষ্টই বলে দিলে, না বাপু, এসব ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমরা থাকবো না। ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ে তোমার আপনজন বলতে কেউ না থাকলেও বামুন কায়েতের তো অভাব নাই। তাদের বাদ দিয়ে শেষে কিনা একজন মোছলমান হবে বরকর্তা? কেউ কোনদিন বাপের জন্মে এসব দেখেছে, না শুনেছে? হিন্দুর বিয়েতে মোছলমান বরকর্তা?

মা এলোকেশীও মৃদু আপত্তি করেছিল, কিন্তু জয়রামের কাছে তা

টেঁকেনি। অবশেষে গাঁয়ের বয়স্করা বেঁকে বসতেই খোদ রমজান এসে অনুরোধ করেছিল জয়রামকে। বলেছিল, শোন্ জয়, আমার কথা শোন্। আমার জন্য গাঁয়ের সবাইকে নারাজ করিস না। শত হলেও তুই হিন্দু, আমি মোছলমান। এসব বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আমি কী করে বরকর্তা হবো?

জয়রাম গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, শোন চাচা, ঘুঘুভাঙ্গা গাঁয়ে যদি আমার কোন অভিবাবক থাকে তো সে হচ্ছ গিয়ে তুমি। কাজেই তুমিই হবে বরকর্তা। তা' যদি না হও তো আমি একাই যাবো বিয়ে করতে। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবো না।

শেষপর্যন্ত জয়রামের জেদই বজায় রইলো। গাঁয়ের বয়স্করা প্রায় কেউই গেল না বরযাত্রী হয়ে। জনাকয়েক অল্পবয়সী বন্ধু ও রমজানকে সঙ্গে নিয়েই চিতলমারী গ্রামে বিয়ে করতে গেল জয়রাম।

বিয়ে বাড়িতেও সবার চক্ষু স্থির। চোগা-চাপকান ও মাথায় ফেজ পরা বরকর্তা রমজান আলীকে দেখে চিতলমারী গাঁয়ের মানুষও হতভম্ব। প্রথমটায় মৃদু গুঞ্জন, তারপরে সরব আলোচনা, অবশেষে এককাট্টা হয়ে তারা স্থির করলে যে এই ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানার বাড়িতে তারা জল স্পর্শ করবে না। এমনকি গাঁয়ের সমাজপতির্দ্র নির্দেশে পুরুতঠাকুর পর্যন্ত বিয়ের আসর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

চোখের জল সামলে জয়রামকে বোঝাতে চেষ্টা করে রমজান। বলে, আমার কথা শোন্ জয়, এভাবে জেদ্ করে একটা মেয়ের সর্বনাশ করিস্ না। আমি বরঞ্চ ফিরে যাই।

জবাবে জয়রাম বললে, তুমি ফিরে গেলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, চাচা। আমি তো কোন অন্যায় করি নাই। তুমিই বলো চাচা তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? বিয়ে না হলে মেয়েটা লগ্নভ্রষ্টা হবে ঠিকই, তবে তাতে তো এই চিতলমারী গোটা গ্রামেরই অপমান।

শেষপর্যন্ত একটা রফা হলো। ঠিক্ হলো, বরকর্তা রমজান আলী বিয়ের আসরে একটা আলাদা আসনে বসবে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে।

তাই হলো। কন্যা পক্ষের কর্তা রাধার এক কাকা প্রথানুযায়ী গলবস্ত্র হয়ে রমজান আলীর কাছ থেকেই বিয়ের অনুমতি নিলে। শেষপর্যন্ত বিয়েও হয়ে গেল নির্বিঘ্নে।

বাসরঘরে লাল চেলির মধ্যে জড়োসড়ো রাধাকে দেখে প্রথমটায় বিস্মিতই হয়েছিল জয়রাম। এতদিন যে মেয়েটাকে সে দেখেও দেখেনি, আজ এই মুহূর্তে

সেই মেয়েটাই যেন নারীর সবটুকু রহস্য সঙ্গে নিয়ে ঐ চেলির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জয়রামকে অবাক করে দিয়েছে। রাধা এতদিন ছিল এগারো বছরের একটা ছোট মেয়ে। আজ সে জয়রামের বিবাহিতা স্ত্রী। স্ত্রীর মর্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাধা যেন একলাফে বড় হয়ে গিয়ে বালিকা থেকে নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিয়ের আসরে ও বাসর ঘরে লাবণ্যর অনুপস্থিতি কিন্তু নজর এড়ায়নি জয়রামের। কিন্তু আশ্চর্য, এনিয়ে তার মনের মধ্যে কোনরকম ক্ষোভের অস্তিত্বও সে টের পায়নি। এটাই যেন স্বাভাবিক। ছোটবোন রাধাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করার মুহূর্তে বিধবা লাবণ্য যে কাছে আসেনি তাতে যেন মনে মনে স্বস্তিই অনুভব করছিল জয়রাম। লাবণ্যর অধ্যায় শেষ, রাধার অধ্যায় শুরু। এই শেষ ও শুরুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার ফল যে কারুর পক্ষেই ভালো নয় তা' সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই বুঝতে পেরেছিল।

রাধা সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। সেই সুশ্রী মেয়েটিকে পুত্রবধূ রূপে পেয়ে এলোকেশী তো খুব খুশি। প্রতিবেশিনীদের কাছে সে মুখ ফুটে বলেই ফেলে, জানো গো পরাণের মা, ঠিক এমন একটি কন্যের কথাই আমি এতদিন মনে মনে ভাবছিলাম। ভগমান শুনেছে আমার মনের কথা।

প্রতিবেশী সেই পরাণের মা মাথা নেড়ে এলোকেশীর কথায় সায় দিলেও মনে মনে বলে, এগারো-বারো বছরের একটা ধিঙ্গি মেয়েকে ঘরে এনে আবার আদিখ্যেতা কত !

গার্হস্থ-জীবন শুরু হলো জয়রামের। পুরানোর ওপর নতুন ইমারত। এই নতুনের ভিত শক্ত কিম্বা ঠুনকো তা' নিয়ে ভাববার মত অবসর নেই জয়রামের। নতুন নিয়েই সে মশগুল। বিয়ের পরেই যেন সে বুঝে ফেলেছে যে নতুনই আসল, পুরানো যেন মেকি ছাড়া আর কিছু নয়।

বিয়ের অনেক পরে লাবণ্য একদিন একান্তে হাসতে হাসতে জয়রামকে বলেছিল, জানো ছোটপাইক, ভগমান সত্যিই আমার সহায়।

—কেন ? প্রশ্ন করেছিল জয়রাম।

জবাব দিয়েছিল লাবণ্য, তা' নাহলে আমার হাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরলো কেন গো ?

লাবণ্যর কথাটা ধরতে না পেরে জয়রাম কেবল তাকিয়ে ছিল তার মুখের দিকে। বলেছিল লাবণ্য, দেখ ছোটপাইক, মানুষের মন জলের মত। যখন যে পাত্তরে থাকে তখন সেই পাত্তরের আকার ধরে। এই আমার কথাই

ধরো। সোয়ামীর ঘরে ঠাঁই নাই। পড়ে আছি বাপের বাড়ি। সেই বাবাও একদিন গেল। এগিয়ে এলে তুমি। ধরলাম তোমাকে। খারাপ জেনেও মনে মনে ধরলাম। তা'ছাড়া উপায় ছিল না। মুখে না বললেও আমার মনের মধ্যে তখন একমাত্র তুমিই ছিলে গো। তখন আর সরে যাবারও কোন উপায় ছিল না। এদিকে ভয়ে মরি—এ আমি কোন্ রসাতলে যাচ্ছি গো? তারপর একদিন শাঁখা-সিন্দুরটুকুনও খোয়ালাম। ধাক্কা খেলাম। মনে মনে ঠিক্ করলাম, তোমার থেকে দূরে যেতেই হবে। কিন্তু কেমন করে যাবো? শেষে চোখ বন্ধ করে ঢিল ছুঁড়লাম। জানতাম আমার কোন কথাই তুমি ফেলতে পারবে না। আমার বোনটারও একটা গতি হলো, আর সেই সঙ্গে আমিও সরে গেলাম তোমার থেকে দূরে।

কথার শেষের দিকে লাবণ্যর আবেগমিশ্রিত কণ্ঠস্বর প্রায় স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লেগেছিল তার। তারপর আবার বলেছিল, আজ দেখ সবকিছু কেমন ঠিক্ হয়ে গেছে গো। কোথাও কিছু খারাপ নাই। আমার ছোটবোনের আদরের বর তুমি। আমার স্নেহের পাত্তর। একঢিলে দুই পাখী মারলাম কিনা?

লাবণ্য থামতেই জয়রাম কয়েক পলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে জিজ্ঞেস করেছিল, রাধা এখন আমার বৌ। তোমার প্রথম পাখীটা অবশ্যই মরেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টা কি সত্যই—

জয়রামের কথা শেষ হবার আগেই চাপা অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠেছিল লাবণ্য, হ্যাঁ—হ্যাঁ মরেছে। না মরলেও জোর করে গলা টিপে মারবো। রাধার মনে কোনদিন দুঃখু দেব না। কিছুতেই না। কথার শেষে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গিয়েছিল লাবণ্য।

এগারো

দ্বৈত শাসনের অন্তিম দিন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদিনে বুঝতে পারলে প্রশাসনের দিকে নজর না দিলে রাজস্ব ঠিকমত আদায় হবে না। রাজস্ব নিজেদের হাতে, আর প্রশাসন থাকবে ছোট ছোট জমিদারের হাতে —এমন একটা অবস্থা কিছুতেই বেশিদিন চলতে পারে না। প্রশাসনের হাতিয়ার গ্রামভিত্তিক চৌকিদার দফাদার, আর থানাভিত্তিক থানাদার পাইক-বরকন্দাজ ইত্যাদির ওপর জমিদারের প্রভাব খর্ব করতেই হবে। সে

কথা মনে রেখেই ছক্ তৈরি করে চলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।

এমনি এক দিনে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গায়ে লাল কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে কোমর-বন্ধনী ও পায়ে নাগরাই পরে প্রস্তুত হয়ে থানায় বসেছিল থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পাল। ঘরের মধ্যে রেড়ির তেলের প্রদীপে আলো-আঁধারির ছায়া। প্রদীপের শিখাটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল পুণ্ডরীক। আর সেই সঙ্গে বিড়-বিড় করে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'হরেকৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারণ করছিল থেকে থেকে। থানার বড় ঘরে পুণ্ডরীকের নির্দেশে পাইক-বরকন্দাজেরাও প্রস্তুত হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল। ইদানীং বিয়ের পরে পাইক-বরকন্দাজদের ঠাট্টা-তামাশার প্রধান লক্ষ্য জয়রাম। একসময় পাইক কামু বৈদ্য মুখটিপে হেসে বরকন্দাজ বদরুদ্দীনকে বললে, থানাদার পালমশাই যেন কি।

—কেন রে? জিজ্ঞেস করে বদরুদ্দীন।

জবাব দেয় কামু, বুড়ো হয়েছে বলে নিজের যৌবনের কথাও কি মানুষটার মনে নাই? আমরা না নয় ঘর-গেরস্থালী ফেলে রাতভর পালমশাইয়ের হুকুমে তার পিছে পিছে ছোটাছুটি করবো। কিন্তু এই ছেলেটাকে আটকানো কেন? নতুন বিয়ে করেছে। এর জন্য বাড়িতে সেই কচি বৌটার কপালেও তো কত দুর্গতি। রাতভর মেয়েটার হয়তো ঘুমই হবে না গো।

কামুর কথায় উপস্থিত সবাই হো—হো করে হেসে ওঠে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে জয়রাম।

একজন বয়স্ক পাইক জিজ্ঞেস করে কামুকে, আচ্ছা, বলো তো দাদা, আজ আমরা কোথায় হানা দেব?

—কী জানি? জবাব দেয় কামু, পালমশাই আজকাল আগে থেকে কিছুতেই মুখ খোলে না। জিজ্ঞেস করলে ভারী গলায় বলে, গিয়েই জানতে পারবে। এত উতলা হচ্ছো কেন?

—তা' যা বলেছ দাদা, বলে ওঠে আর একজন বরকন্দাজ, আজকাল যে রাতের কাজকম্ম বেড়েও গেছে। আগে হর মাসে দু'একদিন রাত জাগলেই চলতো, আর আজকাল তো প্রায়ই রাতে বাড়িতে ঘুমতে পারি না। হয় ডাকাতের ডেরায় হানা দেওয়া, নয় তো কোন ঠগীকে পাকড়াও করা। আর কিছু না থাকে তো রাতভর গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। আরে বাপু, আমরা থানার লোকলস্কর। আমরাই যদি আঁধার রাতে গ্রাম পাহারা দেব তা'হলে গ্রামের চৌকিদার-দফাদারেরা আছে কোন্ কাজে?

কাজের মানুষ কানু বৈন্ত কাজ নিয়ে থানাদারের এমনি সমালোচনা পছন্দ করছিল না। তাই সে অখুশি-কণ্ঠে বলে ওঠে, তা' বাপু থানাদারই বা কি করবে? ঠগী আর ডাকাতের হাতে দেশ তো উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। নবাব-বাদশার দিন আর নাই গো। দেশের রাজা এখন বিলেতি সাহেবরা। তাদের হুকুম মতই তো চলতে হবে থানাদারকে।

কথাটা মিথ্যে নয়। থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পাল এখন মহা ফাঁপরে। দেশের শাসনকর্তা যে এখন কে তা-ই সে সঠিক বুঝতে পারে না। একজন সাহেব কালেক্টর অবশ্য আছে, তবে সে ব্যস্ত থাকে রাজস্ব আদায় নিয়ে। থানায় হুকুম আসে তার কাছ থেকেও। তার ওপর জমিদারের এটা-ওটা হুকুম তো আছেই। এদিকে শোনা যাচ্ছে সাহেবরা নাকি দেশের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবে। তখন কি হবে, কেমন হবে কে জানে? হয়তো তখন পরিবর্ত্তনের জোয়ারে তাকেও ভেসে যেতে হবে। তাই সাহেব ও জমিদার এই দু' তরফকে খুশি রাখতে গিয়ে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার দিকে তাকে একটু বেশি করেই নজর দিতে হয়। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে পুণ্ডরীকাক্ষ এটা বুঝতে পারে যে জমিদারের দিন আর নেই। এবার সাহেবরাই হবে প্রধান।

রাত্রির প্রথম প্রহর পার হতে আর বেশি দেরি নেই। দূরে জঙ্গলের মধ্যে একদল শেয়াল তারস্বরে আসন্ন প্রথম প্রহর অতিক্রমের কথা ঘোষণা করতেই একদল কুকুরও সমান তালে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তার জবাব দেয়। থেমে যায় শেয়াল-কুকুরের ডাক। নিস্তব্ধতা নেমে আসে চারিদিকে।

এতক্ষণে সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়ায় পুণ্ডরীকাক্ষ। এবার রওনা হতে হবে। দু'পা এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় পুণ্ডরীক। ঘোড়াটাকে প্রস্তুত করার জন্যে সহিসকে ডাকতে যাবে, হঠাৎ একজন লোক দৌড়ে এসে হুড়মুড় করে পুণ্ডরীকের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে থাকে, বাঁচান গো পালমশাই। বাঁচান আমাকে।

—কি হয়েছে—কি হয়েছে? দু'পা পিছিয়ে এসে ভ্রু যুগল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক।

মাটিতে মুখ ঘসে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয় লোকটি, এজ্ঞে মগ—আরাকানী মগ ডাকাতেরা আমার সব্বনাশ করেছে গো, পালমশায়। বাধা দিতে গিয়ে আমার বড় ছেলের মাথা ফেটেছে।

লোকটির চেঁচামেচি শুনে পাইক-বরকন্দাজেরা এসে জড় হয় সেখানে। কানু পাইক এগিয়ে লোকটিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতেই কৌতূহলী পুণ্ডরীক

জিজ্ঞেস করে, বাড়ি কোথায় ?

— এজ্ঞে পলাশপুর মৌজায় চক্ সোনাপুর গাঁ। কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয় লোকটি।

একটুসময় চিন্তা করে পুণ্ডরীক। দামোদরের পাড়েই চক্ সোনাপুর গ্রাম। কিছুদিন ধরে সত্যি সত্যিই ঐ তল্লাটে আরাকানী মগ ডাকাতের হামলার গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি গুজব ছাড়া কিছু নয়। আরাকানী দস্যুদের অত্যাচার বলতেগেলে নিম্নবঙ্গেই সীমাবদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় বড় বড় বজরা ও জাহাজে চেপে ওরা ঘুরে বেড়ায়। হামলা চালায় কাছাকাছি গাঁয়ে। লুঠপাট ছাড়াও অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদেরও ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে। সেই আরাকানী মগেরা দামোদরের পথ ধরে এই রাঢ় অঞ্চলে এসে হানা দেবে তা' ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা'ছাড়া এই গ্রীষ্মকালে দামোদরের জলে বজরা কিম্বা জাহাজ ভাসানো অসম্ভব। কাজেই ব্যাপারটা কানে এলেও স্রেফ গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিল পুণ্ডরীক। কিন্তু এই লোকটি কিনা বলছে যে সেই আরাকানীরাই এসেছিল।

পুণ্ডরীক লোকটির দিকে তাকায়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চাষী শ্রেণীর লোক হলেও চেহারায় ও পোশাকে অবস্থা মোটামুটি ভালো বলেই মনে হয়।

জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ, সোনা-দানা, পয়সাকড়ি সবকিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে ?

—এজ্ঞে না। কিছু ছোঁয় নাই। কেবল—। কথাটা শেষ না করেই লোকটি আবার কাঁদতে থাকে।

—তা'হলে কি নিয়েছে ?

চোখের জল মুছতে মুছতে লোকটি জবাব দেয়, আমার সোনার পিতিমাকে। আমার সোন্দর ছেলের বউকে।

—হরেকৃষ্ণ, চক্ সোনাপুরের আর ক'টা বাড়িতে ওরা এমনি ডাকাতি করেছে ?

—এজ্ঞে না, আর কোন বাড়িতে ডাকাতি করে নাই।

পুণ্ডরীক এবার স্থির নিশ্চিত হয় একাজ আরাকানী মগ ডাকাতের নয়। তারা হানা দেয় গ্রামের পর গ্রামে। দলে দলে ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। তা'ছাড়া সোনা-দানা, পয়সা-কড়িও লুঠপাট করে। ওসব কিছু না ছুঁয়ে কেবলমাত্র একটি অল্প বয়সী বৌকে ধরে নিয়ে যাবে না তারা। এ অন্য

কোন ধরনের ডাকাতি।

জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ, ছেলের বৌয়ের বয়স কত?

—ষোল-সতের হবে।

—দেখতে বুঝি সুন্দরী?

—এজ্ঞে ডানাকাটা পরী। আমাদের তল্লাটের নামকরা সোন্দরী।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

—তা' হবে গিয়ে বেশ কিছুকাল।

—হরেকৃষ্ণ, কি করে নিয়ে গেল?

—আমি নিজে তো দেখতে পাই নাই। আমাকে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বললো সরমাকে নাকি পাল্কীতে চাপিয়ে নিয়ে গেছে, উত্তর দিকে।

দ্রুত চিন্তা করে পুণ্ডরীক। পরক্ষণেই কামু পাইকের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমরা একদল বড় বহেড়ার সোজাপথে বাহাদুরপুরের বড় সড়ক ধরে এগিয়ে যাও। আর একদল যাও চক্ সোনাপুরের দিকে। পথে পাল্কী দেখলেই আটকাবে। আমি আসছি।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজেরা দু'দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ে। পুণ্ডরীক তার ঘোড়া সাজাবার জন্যে হুকুম দেয় সহিসকে।

হিসেবে ভুল হয়নি অভিজ্ঞ থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পালের। এলাকার পথ-ঘাট তার নখদর্পণে। বাহাদুরপুরের বড় সড়কের ওপর ডাকাত-কালীর জঙ্গলের পাশে একখানা পাল্কী আটকায় পাইক-বরকন্দাজেরা। সন্দেহ বেড়ে ওঠে পাল্কীর সঙ্গে যে লাঠিয়ালেরা ছিল তাদের হাতে মশাল ছিল না বলে। অন্ধকারে এই বিপদজনক পথে কেউ যাতায়াত করে না।

পাইক-বরকন্দাজেরা পাল্কীর পথ আটকে দাঁড়াতেই দশ-বারোজন ষণ্ডামার্কা লাঠিয়াল চিৎকার করে ওঠে, পথ ছাড়ো। জমিদার বাড়ির পাল্কী এটা।

—পাল্কীর মধ্যে কে আছে? জিজ্ঞেস করে কামু।

—তা' দিয়ে তোমাদিগের দরকার কি?

—কোথা থেকে আসছো তোমরা?

—নারাণপুর থেকে।

কামুর বদলে এবার চেঁচিয়ে ওঠে জয়রাম, মিথ্যা কথা। তোমরা এয়েছো চক্ সোনাপুর থেকে।

—মিথ্যা তো মিথ্যা, জবাব দেয় লাঠিয়ালের সর্দার, পথ ছাড়ো।

গর্জে ওঠে কামু, পাল্কী নামাও।

—না, পাল্কী নামাবো না, বলে ওঠে সেই সর্দার, দরকার হলে জোর করে পাল্কী নিয়ে যাবো। কথার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়ালেরা জোর করে এগিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

বদরুদ্দীনও কংসলালকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে ওঠে কামু, বন্দুকে বারুদ ঠেসে তৈরি হও তোমরা।

লাঠিয়ালেরা আগে বুঝতে পারেনি যে এদের সঙ্গে বন্দুক আছে। তাই বন্দুকের কথায় দমে যায় তারা। অনুরোধের সুরে বললে, কেন ঝামেলা করছো ভাই? চেয়ে দেখ আমরা ডাকাত নই। জমিদারের লাঠিয়াল আমরা। পথ ছাড়ো, আমরা যাই।

কামু কিছু জবাব দেবার আগেই দূরে ভেসে ওঠে ঘোড়ার খুরের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে কামু, যাক বাঁচা গেল। এসে গেছে থানাদার। তোমাদিগের যা বলার তা' এবার তার কাছেই বলো।

একটু পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হয় পুণ্ডরীক। ঘোড়া থেকে নেমে লাঠিয়ালদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হরেকৃষ্ণ, কে তোমরা?

—এজ্ঞে জমিদারের লোক, মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় সর্দার।

—এই পাল্কী কার?

—জমিদারের।

—হরেকৃষ্ণ, পাল্কীর মধ্যে কে আছে?

কোন জবাব দেয় না সর্দার। ধমকে ওঠে পুণ্ডরীক, জবাব দাও। কে আছে এর মধ্যে?

—এজ্ঞে—এজ্ঞে—।

—বল, কে আছে?

—এজ্ঞে, একজন মেয়েলোক।

পুণ্ডরীক ইঙ্গিত করতেই কামু এগিয়ে এসে পাল্কীর দরজা খুলে দেয়। মশালের আলো পড়ে আরোহীর ওপর। ষোল-সতেরো বছরের একটি সংজ্ঞাহীন সুন্দরী যুবতী। কপালে সিঁদুর। কাপড়ের টুকরোয় হাত ও মুখ বাঁধা।

লাঠিয়ালদের সর্দারের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পুণ্ডরীক, হরেকৃষ্ণ, চক্ সোনাপুর থেকে একে চুরি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?

সহসা কোন জবাব দেয় না সর্দার। পরক্ষণেই হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে পুণ্ডরীকের পায়ে পড়ে বলতে থাকে, বিশ্বাস করেন,

আমাদিগের কোন দোষ নাই। জমিদারের হুকুমে একে নিয়ে চলেছি।

—হরেকৃষ্ণ, কোথায় নিয়ে চলেছ?

—এজ্ঞে, জমিদারের অন্দরমহলে।

গর্জে ওঠে পুণ্ডরীক, না অন্দরমহলে নয়, নাচমহলে।

সরমার সংজ্ঞাহীন দেহটা চক্ সোনাপুরে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে বেহারা-সমেত পাল্কী ও লাঠিয়ালদের নিয়ে থানায় ফিরে আসে পুণ্ডরীক। মনিবের হুকুম মানতে গিয়ে বেচারাদের সারারাত কয়েদ থাকতে হয় থানায়। অবশ্য পরের দিন সকালেই ছাড়া পায় তারা।

খবরটা কানে যেতেই ক্ষেপে ওঠে জমিদার চন্দ্রনারায়ণ। বয়স হলেও স্ফূর্তির নেশা তার এখনও কাটেনি। তাই এমন একটা চমৎকার শিকার হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে সে ডেকে পাঠায় দেওয়ান কেষ্ট দত্তকে।

চন্দ্রনারায়ণের কক্ষে পা দিয়েই একেবারে তোপের মুখে পড়ে কেষ্ট দত্ত। চেঁচিয়ে বলতে থাকে চন্দ্রনারায়ণ, কী করছেন আপনারা? কেন আছেন? আমার এলাকায় আমারই থানাদার সারারাত আমার লোকজনদের কয়েদ করে রাখলো, আর আপনারা এখনও চুপ করে বসে আছেন?

—অ'জ্ঞে না, বসে নেই, বিনীতকণ্ঠে জবাব দেয় কেষ্ট দত্ত, ভাবছি কি করে এর একটা বিহিত করা যায়।

—এতে আর ভাবনার কী আছে? তেমনি চড়া স্বরে বলতে থাকে চন্দ্রনারায়ণ, এখনই কৈফিয়ৎ তলব করুন সেই থানাদারের। এতবড় সাহস! আমার খেয়ে আমার সঙ্গেই বেইমানী! বরখাস্ত করুন ঐ লোকটাকে। নতুন থানাদার নিয়োগ করুন।

অপ্রিয় সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছে ছিল না কেষ্ট দত্তর। একটু সময় ইতস্তত করে সে বললে, মুশকিল তো সেখানেই।

—কিসের মুশকিল? চড়া স্বরে প্রশ্ন করে কড়া দৃষ্টিতে কেষ্ট দত্তর দিকে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রনারায়ণ।

নিরুপায় কণ্ঠে অবশেষে বলেই ফেলে কেষ্ট দত্ত, মুশকিল হচ্ছে এই যে এখন আর আমরা ইচ্ছা করলেই থানাদার নিয়োগ কিম্বা বরখাস্ত করতে পারি না।

—বলছেন কি? বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলে ওঠে চন্দ্রনারায়ণ, থানাদার, চৌকিদার, দফাদারেরা কি এখন আর আমাদের আওতায় নাই?

—আজ্ঞে, চৌকিদার-দফাদারেরা যদিও এখনও আমাদের মুঠোয়, তবে থানাদার কিম্বা পাইক-বরকন্দাজেরা নয়। ওরা এখন চলে জেলার সাহেব

কালেক্টরের হুকুমে।

কেষ্ট দত্তর কথায় খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে চন্দ্রনারায়ণ। মুখে-চোখে ফুটে ওঠে অসহায়তা। অবশেষে যেন একটা পথ খুঁজে পেয়েছে এমনিভাবে হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠে বললে, বেশ তবে তাই হোক্। ওরা যখন আর আমাদের আওতায় নয় তখন ওদের কাছ থেকে আমাদের দেয়া জমিজমা কেড়ে নিন। এখন থেকে বিলিতি সাহেবরাই ওদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিক্। আমাদের আওতায় যখন আর নেই তখন ওরা আমাদের নিষ্কর জমিজমা ভোগদখল করবে কোন্ অধিকারে?

জবাবে কেষ্ট দত্ত বললে, ঐ সাহেবরা তো সে পথেও কাঁটা দিয়ে রেখেছে কর্তা। হুকুম জারি হয়েছে যে চৌকিদারী চাকরাণা, চাকরাণী জমজমি, ঘাঁটিয়ালী স্বত্ব ইত্যাদিতে স্বত্ববান লোকের জমি জমিদারের খাসে নিতে হলে জেলা কালেক্টরের অনুমতি লাগবে।

আবার একটু সময় চিন্তা করে চন্দ্রনারায়ণ। তারপর বললে, তাই বলে থানাদার সাপের পাঁচ-পা দেখেছে নাকি? যা ইচ্ছা তাই করবে? তার খেয়াল-খুশির হাত থেকে কি খোদ জমিদারও রেহাই পাবে না?

—না—না, তা' অবশ্য নয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে কেষ্ট দত্ত, দরকার হলে আমরা থানাদারের নামে অভিযোগ করতে পারি।

—কার কাছে?

জবাব দেয় কেষ্ট দত্ত, কালেক্টরের কাছে।

—বেশ, তবে তাই করেন, হুকুম দেয় চন্দ্রনারায়ণ, ঐ থানাদারের নামে কালেক্টরের কাছে অভিযোগ পেশ করেন। ঐ লোকটাকে আমারই জমিদারী ছেড়ে চলে যেতেই হবে। এতবড় স্পর্ধা যে জমিদারের পাল্কী আটকায়! এত সাহস যে আমার লোকজনদের থানায় কয়েদ করে রাখে! আমি ঐ লোকটার ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে ছাড়বো।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কেষ্ট দত্ত বললে, এসব করে কি কোন লাভ হবে কর্তা? মাঝখান থেকে সত্য কথাটা জানাজানি হয়ে যাবে।

—সত্য কথা? কী সত্য কথা? বিরক্ত কণ্ঠস্বর চন্দ্রনারায়ণের।

—আজ্ঞে, বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, সেই বউটার কথা যাকে আমাদের লাঠিয়ালেরা ধরে আনছিল।

জোঁকের মুখে নুনের মত সেই সুন্দরী বউটার কথায় চন্দ্রনারায়ণের মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে। নিরুপায় ভঙ্গিতে খাঁচায় পোরা জন্তুর মত নিজের মনেই কেবল গর্জাতে থাকে। এই ইংরেজ আমলের চাইতে নবাবী আমল ছিল

অনেক ভালো। বার্ষিক খাজনা নিয়ম মত দিয়ে যাও, আর নিজের এলাকায় যা ইচ্ছে করে বেড়াও। নবাব ভুলেও তাকাবে না এদিকে। আর এখন তো সবকিছুতেই ঐ সাদা বেটাদের খবর্দারী।

সংসারে দু'দুটো মা থাকা সত্ত্বেও কিশোরী রাধার যতকিছু আবদার সবই ছিল তার দিদি লাবণ্যর কাছে। লাবণ্যর সবকিছুই রাধার চোখে ভালো। তার এই দিদিটির মত সুন্দরী মেয়ে সারা চিতলমারী গাঁয়ে নাকি আর দ্বিতীয়টি নেই। বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় তার দিদি নাকি অনেক পুরুষমানুষকেও হার মানায়। তাই লাবণ্যর কথা রাধার কাছে বেদবাক্য।

সেই লাবণ্য যখন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল তখন শোকে দুঃখে রাধা বেশ কয়েকদিন ম্রিয়মাণ হয়ে রইলো। প্রথম প্রথম তার দারুণ রাগ হতো ঐ ভগ্নীপোত মানুষটার ওপর। এমনিতেই রজনীকান্তকে তার তেমন ভালো লাগেনি। কেমন যেন গোমড়ামুখো মানুষটা। মুখে হাসি নেই। সর্বদাই প্যাঁচার মত মুখ করে থাকে। অবশেষে দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে যেতেই গোটা বিশ্বসংসার যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছিল রাধার কাছে। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় এটা জানা সত্ত্বেও বালিকা রাধার মনে অনেক ধরনের বিকল্প ব্যবস্থার কথা আনাগানো করতো। ঐ রায়দের বাড়ির মেজমেয়েরও তো বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে মেয়েটা ও তার বর তো এখানেই থাকে। ওদের মত তার দিদি ও রজনীকান্ত যদি এখানেই থাকতো তা'হলে তো তার দিদি এভাবে তার চোখের আড়াল হতো না। মনের কথাটা একদিন সে বলেই ফেলেছিল তার বড়মা হেমাঙ্গিনীকে। শুনে হেমাঙ্গিনী রাধার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কেবল একটু ম্লান হেসেছিল।

সবশেষে লাবণ্য যেদিন তার শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে বাপের কাছে ফিরে এসেছিল সেদিন তাদের আত্মীয়স্বজন সবাই মেয়েটার দুর্গতিতে দুঃখ প্রকাশ করলেও একমাত্র রাধাই দারুণ খুশি হয়েছিল। মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে একদিন সে লাবণ্যকে বলেই ফেলেছিল, এই ভাল হয়েছে গো দিদি। তুই এখন থেকে এখানেই থাকবি। সেদিন লাবণ্য রাধার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে রেখে অনেকক্ষণ চুপ্ করে ছিল। রাধা সেদিন নিজের মাথার ওপর লাবণ্যর উষ্ণ চোখের জলের ফোঁটা টের পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছিল।

ধীরে ধীরে কয়েকটা বছর কেটে গেল। বালিকা রাধা হয়ে উঠলো

কিশোরী। এখন সে অনেক কিছুই বুঝতে পারে যা সে আগে বুঝতো না। একটু একটু করে তার নিজের মনেও সে অনুভব করতে শুরু করলে এক রঙীন প্রজাপতির আনাগোনা। এখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারে তার দিদি লাবণ্যর মনের দুঃখ। প্রচণ্ড রাগ হয় সেই রজনীকান্তর ওপর। ক্ষমতা থাকলে সে দু'হাতে দুম্ দুম্ করে কিল মারতো সেই লোকটাকে, নয়তো মাটির ঢেলা ছুঁড়ে সেই লোকটার মাথা ফাটিয়ে দিতো। দিদির ব্যথায় তার নিজের মনটাও ব্যথিত হয়ে উঠতো। লাবণ্যর মুখখানা সামান্য ম্লান হয়ে উঠলেই সেই মুখে সে হাসি ফোটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠতো।

এমনি দিনে তাদের সংসারে আবির্ভাব ঘটলো থানার পাইক জয়রামের। প্রথম প্রথম জয়রামের এই আবির্ভাবকে তেমন একটা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে নি রাধা। বিশেষ করে তার দিদির সঙ্গে ঐ লোকটার ঘনিষ্ঠতা তার মত এক কিশোরীর চোখেও বিসদৃশ ঠেকতো। কিন্তু রাধার এই মনোভাব বেশিদিন বজায় রইলো না। সে লক্ষ্য করতো, তেমন কোন বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও জয়রামের উপস্থিতি তার দিদির মনটাকে খুশি করে তোলে। ধীরে ধীরে দিদির মনের এই আনন্দটুকু তার নিজের মনেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তা'ছাড়া জয়রাম মানুষটাও তেমন মন্দ নয়। বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভ। সবচাইতে বড় কথা লোকটা ভদ্র। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কোনদিন তার দিদির সঙ্গে জয়রামের কোন বিসদৃশ আচরণ সে লক্ষ্য করে নি। আর এ থেকেই রাধার মনে জেগে উঠলো অন্য ধরনের এক চিন্তা। তার দিদি লাবণ্য স্বামীপরিত্যক্তা। কোনদিন সে আর স্বামীর ঘর ফিরে পাবে না। কাজেই জয়রামের উপস্থিতি যদি লাবণ্যর মনটাকে সামান্য খুশি করে তোলে তাতে ক্ষতি কি? বিষয়টি যে বিধিসম্মত নয়, তা' জানা সত্ত্বেও কিশোরী রাধার মন থেকে জয়রাম প্রসঙ্গে সেই বিরুদ্ধ ভাবটুকু ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করলে। দিদির প্রিয়জন হয়ে উঠলো কিশোরী রাধারও প্রিয়। মাঝে মধ্যে নিজের মনেই আক্ষেপ করতো রাধা, ঐ রজনীকান্ত লোকটার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে তার দিদির বিয়ে যদি এই জয়রামের সঙ্গে হতো তাহলে তার দিদি কতই না সুখী হতো! কিন্তু নিরর্থক এই আক্ষেপ। সংশোধনের আর তো কোন পথ নেই। হিন্দু মেয়ের তো দু'বার বিয়ে হয় না। জয়রাম যতই কেন না তাদের সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠুক, তার দিদিকে চিরকাল একাই থাকতে হবে। কোনরকম অন্যায় পথে পা বাড়াবার মত মেয়ে যে তার দিদি নয় সে-বিষয়ে রাধার মনে কোন সংশয় ছিল না।

এমনি দিনে হঠাৎ এলো সেই দুঃসংবাদ—রজনীকান্তর মৃত্যু সংবাদ। নিজের সম্পদ নিজের হাতে না থেকে অন্যের কাছে থাকলেও এক ধরনের মালিকানার তৃপ্তি অনুভব করা যায়। আর, সেই সম্পদ চিরতরে নষ্ট হয়ে গেলে সেই তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। লাবণ্যর ক্ষেত্রেও ঘটলো ঠিক তাই। স্বামীপরিত্যক্তা ও বিধবা হওয়ার মধ্যের তফাৎটুকু আচমকা এসে তাকে আঘাত করলো রজনীকান্তের মৃত্যুসংবাদের মাধ্যমে।

হাতের শাঁখা ও কপালের সিঁদুর মুছে থানধুতি পরে লাবণ্য যখন এসে দাঁড়ালো রাধার সামনে সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কিশোরী রাধা সেদিন দিদিকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আর ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সেদিন নিজেই কেঁদে ফেলেছিল লাবণ্য। এরপর থেকে সাংসারিক ব্যাপারে একধরনের উদাসীনতা রাধা লক্ষ্য করতে লাগলো তার দিদির মধ্যে। এমনকি জয়রামের উপস্থিতিও যে আগের মত লাবণ্যর ওপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম তাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। তবুও মনে মনে আশা করে থাকতো রাধা, ধীরে ধীরে তার দিদি আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আর এমনি সময়ই একদিন জয়রামের কাছে লাবণ্য এসে হাজির হলো রাধাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একধরনের অনাস্বাদিত আনন্দের সঙ্গে কেমন যেন এক শঙ্কায় মনটা পূর্ণ হয়ে উঠলো কিশোরী রাধার। জয়রাম হবে তার বর—তার একান্ত মানুষ। কিন্তু তার ঐ চিরদুঃখী দিদিটার কী হবে? কথাটা ভাবতে গিয়েই যেন কান্না পায় রাধার। ইচ্ছে হয় দিদিকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তোর নিজের কী লাভ হবে গো, দিদি? কিশোরী রাধার তখনও বুঝবার মত বয়স হয়নি যে লাবণ্য এভাবেই চায় জয়রামকে কাছে টেনে রেখে দূরে সরিয়ে দিতে। জয়রাম এভাবেই হয়ে উঠবে লাবণ্যর কাছে প্রিয়ভাজনের বদলে স্নেহভাজন।

ঘুঘুডাঙ্গার শ্বশুরবাড়িতে একহাত ঘোমটার আড়ালে রাধার মনটা মাঝে মাঝেই হু-হু করে ওঠে চিতলমারী গাঁয়ের জন্যে। মা দু'জনের জন্যে তার যত চিন্তা তার চাইতে বেশি ভাবনা দিদিটার জন্যে। এতকাল রাধাই সদাসর্বদা লাবণ্যর কাছে কাছে ঘুরতো, কিন্তু আজ লাবণ্য সম্পূর্ণ একা। নিজের মা বিছানায়, আর বড়মা ঠাকুর ঘরে। কাজেই দু'টো কথা বলার জন্যেও আর কেউ তার কাছাকাছি নেই। এমনকি জয়রাম নিজেও কেন যেন আজকাল আর চিতলমারী গাঁয়ের দিকে ঘেঁসতে চায় না। রাধা এবাড়ির নতুন বৌ। তাই

মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন ভয়ে ভয়ে সে কথাটা বলেছিল জয়রামকে। বলেছিল, বাড়িতে দুই বুড়িকে নিয়ে দিদি একা পড়ে আছে। তত্ত্ব-তালাশ করার মত কেউ তো নাই। বড়ই ভাবনা হয়।

—তা' বটে। পাশ ফিরে শুতে শুতে জবাব দিয়েছিল জয়রাম। তারপর একটা মস্ত হাই তুলে আবার বলেছিল, ওদিকে থানার কাজ, এদিকে বাড়ির দেখাশোনা। তারওপর আবার মার শরীরও ভালো না। কখন যে সময় করে চিতলমারী যাই—। কথাটা শেষ না করেই চুপ্ করে ছিল জয়রাম।

যায়নি জয়রাম চিতলমারী। আবার একদিন কথাটার পুনরাবৃত্তি করে ছিল রাধা। এবার তার কণ্ঠে জেগেছিল সামান্য অনুযোগের সুর। রাধা চুপ্ করার পরেও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ছিল জয়রাম। তারপর হঠাৎ রাধার দিকে ফিরে শুয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা আমাকে যে এত করে তোমাদের বাড়ি যেতে বলছো, তোমার ভয় করে না ?

—ভয়! বিস্মিত কণ্ঠস্বর রাধার, ভয় করবে কেন গো? কীসের ভয়?

এবার জবাব দিতে গিয়ে জয়রাম নিজেই বিপাকে পড়ে। কেমন করে সে নিজের মুখে এই সরল কিশোরীকে বলবে যে তোমার দিদির সঙ্গে এককালে আমার যে সম্পর্ক ছিল সেটাই তো তোমার ভয়ের কারণ হতে পারে।

রাধা কিশোরী হলেও বোকা নয়। জয়রামকে চুপ্ করে থাকতে দেখে সে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবার বললে, বুঝেছি, তুমি বুঝি দিদির কথা ভাবছো? তা বাপু, দিদি তো তোমাকে দেখে খুশিই হবে গো। সে তো তোমাকে ভালইবাসে।

—ভালোবাসে? স্খলিত কণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ করে জয়রাম।

জবাবে তেমনি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠেই রাধা বললে, সেকি, ভালোবাসবে না? ছোটবোনের আদরের বরকে কে না ভালোবাসে?

একটি কিশোরীর কণ্ঠে এমন নির্ভরতাপূর্ণ জবাবে যুবক জয়রামের সেই মুহূর্তে আর কিছু বলার থাকে না। রাধাকে নিজের বুকের ওপর টেনে এনে তার সর্বাঙ্গে এঁকে দিতে থাকে সোহাগের চিহ্ন।

স্বামীর আদরে বিহ্বল রাধা একসময় জয়রামের বুকে মুখ লুকিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো, তাই না?

দুষ্টুমীর হাসি হেসে জবাব দেয় জয়রাম, একটুও না।

—ধেৎ! বলে ওঠে রাধা, তুমি মিছে কথা বলছো।

—কেন ?

—বউকে বুঝি কেউ ভালো না বেসে পারে ?

—যদি সত্যিই কেউ না বাসে ?

—তা'লে পাপ হয়।

—কার পাপ ?

—বউয়ের।

রাধাকে তেমনি নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেই হঠাৎ হেসে ওঠে জয়রাম। তার সেই হাসির দমক রাধার কিশোরী দেহের প্রতিটি আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে তাকে বিহ্বল করে তোলে। দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞেস করে, ওকি, হাসছো কেন গো ?

—হাসছি তোমার কথা শুনে। হাসতে হাসতে জবাব দেয় জয়রাম, স্বামী যদি তার বউকে ভালো না বাসে তা'হলে পাপ হবে বউয়ের ?

—হ্যাঁ গো, তাই। বলে ওঠে রাধা, বড়মা তো তাই বলে।

—কি বলে তোমার বড়মা ?

একটু সময় স্থির হয়ে থেকে বলার কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয় রাধা। তারপর জবাব দেয়, বড়মা বলে যে, বউয়ের দোষেই তো স্বামী বউকে ভালোবাসে না। বউ যদি স্বামীকে ভালবাসে, যদি তার কথামত চলে, যদি তার সেবাযত্ন করে তা'হলে স্বামী ঠিক তাকে ভালবাসবে। তাই তো আমি—

কথাটা শেষ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় রাধা। জয়রাম সেইমুহূর্তে তার সবল বাহুর নিষ্পেষণে রাধার নরম দেহটাকে নতুন করে নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে দিতে বললে, তাই বুঝি আমার উপর তোমার এত নজর ? তাই বুঝি এত যত্ন করো আমাকে ?

জবাব—না দিয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকোয় রাধা।

বারো

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে তারপর। এই সময়ের মধ্যে বিলেতের টেম্‌স নদী ও বাংলার গঙ্গা—পদ্মা—মেঘনা দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক জল। ওয়ারেন হেস্টিংসের স্থলে গভর্নর জেনারেল হয়েছেন কর্নওয়ালিশ। জমিদার

চন্দ্রনারায়ণের মত আরও অনেক জমিদারের আশংকাকে সত্যে পরিণত করে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে মন দিলেন তিনি। প্রথমেই আঘাত হানলেন জমিদার-ভিত্তিক প্রশাসন যন্ত্রের ওপর।

দেশের পরিবর্ত্তনের মত ইতিমধ্যে জয়রামের পারিবারিক জীবনেও ঘটেছে পরিবর্ত্তন। রাধা এখন পূর্ণ যুবতী। দেখতেও আগের চাইতে অনেক সুন্দরী। জয়রামের চোখের মণি রাধা। স্ত্রীর কোন ইচ্ছাই সে অপূর্ণ রাখে না। কেবল রাধার একটি ইচ্ছা আজও সে পূর্ণ করতে পারে নি। ইচ্ছাটা যে কেবল রাধার একার তাও নয়। জয়রামের নিজেরও সেই ইচ্ছে। কিন্তু পারে নি জয়রাম। রাধাকে একটি সন্তান উপহার দিতে পারে নি সে। ইতিমধ্যে নাতির মুখ দেখতে না পাওয়ার খেদ নিয়েই এলোকেশী পরপারে চলে গেছে। সেই একই খেদ নিয়ে রাধার মাও চলে গেছে কিছুদিন পরেই। চিতলমারীর নন্দী বাড়িতে ওদের বড়মা হেমাঙ্গিনীকে আগলে এখনও পড়ে আছে লাবণ্য। ইদানীং ইচ্ছে থাকলেও রাধার পক্ষে বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না জয়রামকে একা ফেলে রেখে। আর গেলেও দু'এক রাতের বেশি থাকা সম্ভব হয় না। এনিয়ে অনুযোগ করে বৃদ্ধা হেমাঙ্গিনী। রাধার বদলে লাবণ্যই বোঝায় সেই বৃদ্ধাকে। বলে, এ তুমি কী বলছো গো, বড়মা? ঘুঘুডাঙ্গায় ঐ লোকটাকে একা ফেলে রেখে ও এখানে থাকে কী করে?

বুঝেও বুঝতে চায় না বৃদ্ধা হেমাঙ্গিনী। অনুযোগের পর অনুযোগ। নিজের মনেই বিড় বিড় করে অনুযোগ করে, এতকাল কেটে গেল, পেটেও একটা এলোনা রে। নির্ব্বংশ হল রে নন্দীগুষ্ঠী। একচোখা ভগমান পাঁচ পাঁচটা মেয়ে দিলে, একটা ছেলেও দিলে না। মেজটা তো কলিকাতায় ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিশে ফিরিঙ্গি হয়ে গেছে। বেঁচে আছে কি নেই তাও জানি না। ছেলেপুলে আছে কি নেই তারও খবর কেউ রাখে না। ভেবেছিলাম এই ছোটটার ছেলেপুলে হলে নন্দীগুষ্ঠী দৌহিত্তির বংশের মধ্যে বাঁচবে। ভগমান তাও দিলে না।

লাবণ্যর ধমকে বৃদ্ধা হেমাঙ্গিনী চুপ করে। বলে ওঠে লাবণ্য, তুমি তো কেবল নন্দীগুষ্ঠীর কথাই ভাবছো গো, বড়মা। ভাবো তো একবার ঘুঘুডাঙ্গার কথা! আমাদের ঘরের মেয়ে নিয়ে ওরাও তো নির্ব্বংশ হলো গো। নেহাত ওর মত ছেলে। অন্য কেউ হলে এতদিনে আর একটা বিয়ে করে ছেলেপুলের বাপ হয়ে যেত, বুঝলে?

এসব নিয়ে ছোটবোনের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করতো লাবণ্যর। তবুও আকারে ইঙ্গিতে বলতে ছাড়তো না। একদিন প্রায় স্পষ্টই সে বলেছিল, শুনি তো কত লোকে কত কিছু করে। ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক, মানত। কিছু না করে চুপ করে থাকলে কি কিছু হবে ভেবেছিস ?

জবাবে ছল্‌ ছল্‌ চোখে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে বলেছিল রাধা, কিছুই বাকি রাখে নাই রে, দিদি। যে যা বলেছে তাই করেছে। এমনকি কোথাকার কোন্‌ পীরের দরগায় গিয়েও মানত করে এয়েছে।

—লোকে তো বলে গঙ্গাসাগরে মানত করলে নাকি পেত্যক্ষ ফল ফলে। তাই এবার করে দেখ্‌ না রে। পেথমটা নাহয় মা গঙ্গা নেবে। তার পরের-গুলো তো—।

লাবণ্যর কথা শেষ হবার আগেই জবাব দিয়েছিল রাধা, আমি তো দিদি তাতেও রাজি। কিন্তু ওর একেবারেই মত নাই। বলে, জন্ম জন্ম ছেলে-মেয়ের বাপ না হতে রাজি আছি, তবুও সন্তানকে জলে ফেলে দিতে পারবো না।

সেদিন বাসুদেবগঞ্জ থানায় গিয়ে কথাটা শুনে মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ে জয়রামের। কেবল জয়রাম একাই নয়, থানার পাইক-বরকন্দাজ, পেয়াদা-হরকরা, এমনকি খোদ্‌ থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে সেই দুঃসংবাদে। বাসুদেবগঞ্জ থেকে নাকি থানা উঠে যাবে। নতুন গভর্নর কর্নওয়ালিশ সাহেবের নাকি তাই হুকুম। কেবলমাত্র বাসুদেবগঞ্জই নয়, আশেপাশের অনেক থানাই নাকি উঠে গিয়ে তৈরি হবে বড় বড় এলাকা নিয়ে নতুন থানা। ইংরেজ সাহেবদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত হবে দেশের প্রশাসন।

আগের দিন জেলা সদর থেকে ঘুরে এসে থানাদার পুণ্ডরীকাক্ষ পাল নিজেই এসে খবরটা ফাঁস করেছিল, আর তাতেই থানার প্রতিটিকর্মীর মুখেই ছড়িয়ে পড়েছিল অনিশ্চয়তার ছায়া।

থানার নায়েব পাঁচকড়ির প্রশ্নের জবাবে ম্লান কণ্ঠে পুণ্ডরীক বললে, হরেকৃষ্ণ, শুনলাম এখান থেকে থানা উঠে গিয়ে নতুন থানা তৈরি হবে পলাশপুরে।

—পলাশপুর! বিস্ময় প্রকাশ পায় পাঁচকড়ির কণ্ঠে, সে তো অনেক দূর নয়-দশ ক্রোশ তো হবেই। বিপদে-আপদে এ তল্লাটের মানুষেরা অতদূর যাবে কেমন করে ?

—যেতে না পারে তো যাবে না। পুণ্ডরীকের কণ্ঠে ফুটে ওঠে বিরক্তির

সুর, দেশের লোকের সুবিধা-অসুবিধায় ঐ সাহেব ব্যাটাদিগের কি? ওরা রাজত্ব হাতে পেয়েছে, রাজত্ব করবে। হরেকৃষ্ণ।

পাঁচকড়ি আবার জিজ্ঞেস করে, এই বাসুদেবগঞ্জ থানার লোকগুলোর কী হবে?

—কী আর হবে? জবাব দেয় পুণ্ডরীক, যারা ঐ নতুন থানায় গিয়ে কাজ করতে চাইবে তারা থাকবে। বাকিরা চলে যাবে।

—জমিজমা, বাড়িঘর ফেলে রেখে কে চাইবে অত দূরে গিয়ে কাজ করতে?

পাঁচকড়ির কথায় সামান্য ম্লান হাসি ফুটে ওঠে পুণ্ডরীকের ঠোঁটে। একটু সময় থেমে সে জবাব দেয়, হরেকৃষ্ণ, জমিজমা আর থাকবে কোথায় গো? নতুন থানার পাইক-বরকন্দাজ, পেয়াদা-হরকরা কারুর জমিজমাই তো আর থাকবে না। জমিদারের দেওয়া চাকরাণার জমিজমা আবার ফিরে যাবে জমিদারেরই হাতে। নতুন থানায় প্রত্যেককেই হতে হবে ইংরাজ সাহেবদিগের মাইনে করা চাকর।

—চাকর!—চাকরি! স্খলিত কণ্ঠে বলে ওঠে পাঁচকড়ি।

—হ্যাঁগো হ্যাঁ, জবাব দেয় পুণ্ডরীক, জমিজমা ভোগদখলের বদলে থানায় কাজের নিয়ম এবার থেকে উঠে যাবে। মাস মাইনের বদলে করতে হবে চাকরের কাজ। হরেকৃষ্ণ। যে পারবে থাকবে, যে পারবে না সে চলে যাবে।

—আপনি নিজে কি করবেন, পালমশাই? প্রশ্নটা করেই পাঁচকড়ি তাকিয়ে থাকে পুণ্ডরীকের মুখের দিকে।

জবাব দিতে গিয়ে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে পুণ্ডরীক। অবশেষে একসময় একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, হরেকৃষ্ণ, আমার পক্ষে বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না। চাকরাণার জমিজমা জমিদারের খাসে চলে গেলেও আমার নিজের দু'পাঁচ বিঘা জমি আছে। ঐ দিয়েই কোনমতে চালাতে হবে। আজ এ-থানায়, কাল ও-থানায়, এভাবে ঘুরে ঘুরে থানার দারোগার চাকরি করা আমার ধাতে সইবে না।

—দারোগা? দারোগাই আদালত? বিষয়টি বুঝতে না পেরে পাঁচকড়ি তাকিয়ে থাকে পুণ্ডরীকের দিকে।

জবাবে পুণ্ডরীক আবার বললে, নাহে বাপু। হরেকৃষ্ণ। দারোগাই আদালতের বদলে জেলা সদরে বসবে মস্তবড় আদালত। আর, থানাদারের নাম হবে দারোগা।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—সারা বাংলা মুলুকে ছড়িয়ে

পড়লো কর্নওয়ালিশ সাহেবের নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার কথা। গাঁয়ে-গঞ্জের সাধারণ মানুষের এসব নিয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা নেই। প্রশাসন ব্যবস্থার রদবদলে তেমন কিছু আসে যায় না তাদের। আগে ছিল জমিদার, এখন ইংরেজ সাহেব। অত্যাচারিত, শোষিত হয়ে হয়ে তারা এই অত্যাচার ও শোষণকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মরতে যখন হবেই তখন রামের হাতে মরছি কি রাবণের হাতে মরছি তা' নিয়ে চিন্তা করে না তারা। তবে ছোট ছোট থানা এলাকা বড় বড় থানায় পরিণত হয়ে তাদের নাগাল থেকে দূরে চলে গেলে তাদের অসুবিধা যে বাড়বে বৈ কমবে না সে বোধ তাদের আছে। কিন্তু আর পাঁচটা অসুবিধার মত এটাকেও তারা মেনে নেবে অনায়াসেই। সহ্য শক্তি যে তাদের অপরিসীম।

চিন্তার রেখা ছড়িয়ে পড়ে জয়রামের মুখে। সে নিজে এবার কী করবে? স্বামী-স্ত্রীর সংসার। তৃতীয় কেউ নেই। কার ওপর রাধার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সে চলে যাবে পলাশপুর থানায় চাকরি করতে? এদিকে চাকরি না করেও উপায় নেই। খাবে কি? চাকরাণার জমিটুকু ছাড়া নিজের তো একছটাক জমিও নেই। সেই জমি যখন জমিদারের খাস হয়ে যাবে তখন তো একমাত্র থানার চাকরিই ভরসা।

স্ত্রী রাধা অবশ্য তার ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে যে সব কথা বলে জয়রামের মতে তার কোন মানে হয় না। জয়রামের চিন্তাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে হাল্কা সুরে সে সব সমস্যার সমাধান করে দেয় নিমেষে। বলে, অত চিন্তা-ভাবনার কী আছে গো? থানার পাইকগিরি বলে কথা। লোকে কত মান্যিগন্যি করে। একাজ ছেড়ে দেবে কোন্ দুঃখে গো? তার চাইতে আমার বুদ্ধি নাও। আমাকে সঙ্গে নিয়েই চলো সেই পলাশপুর।

রাধার প্রস্তাবে জয়রাম খানিকক্ষণ অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায়?

—কেন, তুমি যেখানে থাকবে। সহজ জবাব দেয় রাধা।

—বেশ বলেছ। বলে ওঠে জয়রাম, সেখানে থাকার জন্য হয়তো একটা ঘরটর কিছু থাকবে। একদল পাইক বরকন্দাজের মধ্যে তুমি থাকতে পারবে সেখানে?

রাধা আর কোন জবাব দেয় না। সত্যি, এতটা সে তলিয়ে দেখে নি। কিন্তু এছাড়া উপায় বা কি? জয়রাম পাইকাগিরি ছেড়ে দিলে তাদের চলবে

কেমন করে? জমিটুকু হবে হাতছাড়া, আর পাইকের কাজও থাকবে না। তা'হলে যে না খেয়েই মরতে হবে।

ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের দক্ষিণ চৌকির এককালের চৌকিদার রমজান আলী এখনও জীবিত। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত রামজান আলী এখন আর চৌকিদারী করে না। সেই সামর্থ্যও আর নেই তার। জয়রামের কথায় একটু সময় মুখবুজে থেকে অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, কি যে দিনকাল পড়েছে রে! ভালো হোক্ খারাপ হোক্, জমিদারের আশ্রয়ে কোনমতে দিন কাটছিল। ঐ লালমুখো ব্যাটারা এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দিতে লেগেছে। তা' বাপু, কি আর করবি? পাইকগিরি ছাড়লে যখন চলবেই না তখন চলে যা সেই পলাশপুরের নতুন থানায়। তবে যা শুনছি তাতে একটা কাজ ভালই হয়েছে। এখন থেকে তোরা নাকি থাকবি জেলার মেজিস্টর সাহেবের অধীনে, আর চৌকিদার থাকবে থানার অধীনে।

—তাতে ভালোটা কি হবে, চাচা?

জবাব দেয় রমজান, তোদের অবশ্য ভালো-মন্দ কিছু হবে না। আগে ছিলি জমিদারের অধীনে, এখন মেজিস্টরের অধীনে। তবে চৌকিদারদিগের এতে খারাপ হবে না। পঞ্চায়েতের চোখ রাঙানি, জমিদারের গোলামী থেকে রেয়াত পাবে তারা। বারো ভাতার নিয়ে আর ঘর করতে হবে না তাদের।

জয়রাম আবার বললে, কিন্তু চাচা, তোমার বৌমাকে এখানে একা ফেলে রেখে আমি কেমন করে গিয়ে পলাশপুর থাকবো?

—তা' বটে। কথার শেষে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে রমজান। তারপর ধীরে ধীরে আবার বলতে থাকে, হ্যাঁরে, সমস্যে তো গুরুতর। গাঁয়ে-গঞ্জের যে হাল তাতে ঐ সোমত্ত বৌটা থাকবে কার কাছে? আচ্ছা, তোর শ্বশুরবাড়িতে তো তোর শালী-শাউড়ি আছে। বৌকে না হয় সেখানেই পাঠিয়ে দে।

—বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে কোন্ মেয়েলোকের ভালো লাগে চাচা? বলে ওঠে জয়রাম, তা'ছাড়া লোকেই বা কি বলবে?

—তাও তো ঠিক। আবার একটু সময় চিন্তা করে অবশেষে রমজান বললে, শোন্ জয়, সমস্যে কঠিন। একদিকে বাড়ি-ঘর-বৌ, অন্যদিকে থানার পাইকগিরি। একটা রাখতে গেলে আর একটা ছাড়তে হবে। জমিটুকুন তো এমনিতেই হাতছাড়া হবে। থাকার মধ্যে থাকবে কেবল পাইকগিরির মাস মাইনেটা। আমার তো মনে হয়, ওভাবে গোলামীর খাতায় নাম না লিখিয়ে

গাঁয়ে বসেই গাঁয়ে-গতরে খেটে পেটের ভাতক'টা জোগাড় করতে পারবি সংসারে তো মাত্তর দু'টো মনিস্যি।

এতক্ষণে রমজানের পরামর্শ জয়রামের মনে ধরে। সে নিজেও এটাই চাইছিল। একে তো জমিজমার বদলে মাস মাইনের গোলামী, তার আবার নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। তার চাইতে এই ব্যবস্থাই ভালো।

আবির্ভাব ঘটলো নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার। চালু হলো 'পুলিশ' শব্দটি। ইংরেজি 'পোলিশ' শব্দটির ভারতীয় রূপ 'পুলিশ'। নতুন নতুন থানায় জাঁকিয়ে বসলো পুরানো থানাদারের বদলে দারোগা। ইংরেজ প্রভুর স্বার্থ রক্ষার জন্যে সৃষ্টি হলো নতুন পুলিশ বাহিনী। এদের অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসী নয়। মাইনে করা ভাড়াটে বাহিনীর সঙ্গে এলাকার জনসাধারণের যোগও আর রইলো না। প্রশাসন যন্ত্রই বটে। যন্ত্রের মতই ভাবাবেগ শূন্য। সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের মধ্যে সৃষ্টি হলো ফাটল। আর, এই নতুন প্রশাসন ব্যবস্থায় ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের তিরিশ বছরের শক্ত-সমর্থ যুবক জয়রাম সামন্ত মাত্র দশটি-বারোটি বছর থানায় পাইকের কাজ করার পরে মিশে গেল ভূমিহীন চাষীর দলে।

বাহাদুরপুরের জমিদার চন্দ্রনারায়ণ ও জেলার কালেক্টর হ্যারি জোন্স। ইদানীং এই দু'জন যেন একেবারে হরিহর আত্মা। জেলা কালেক্টরের সম্মানে জমিদার বাড়িতে প্রায়ই বসে পান-ভোজনের আসর। চন্দ্রনারায়ণ এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে জমিদারী ও সেইসঙ্গে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হলে কোম্পানীর এই সাহেবসুবোদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। নইলেই বিপদ। অবশ্য চন্দ্রনারায়ণের এই ইংরেজ-প্রীতির মূলে রয়েছে দেওয়ান কেষ্ট দত্তর পরামর্শ।

এলাকার প্রশাসনিক ক্ষমতা হারিয়ে জমিদার চন্দ্রনারায়ণ তখন দারুণ খাপ্পা কোম্পানীর ওপর। দেওয়ান কেষ্ট দত্তই তখন পরামর্শ দিতে গিয়ে বলতো, একদিক থেকে ব্যবস্থাটা ভালই হয়েছে।

—ভালো? কিসের ভালো? বিরক্তির সুর ভেসে উঠতো চন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠে।

জবাব দিতো কেষ্ট দত্ত, আজ্ঞে ওদের রাজত্ব ওরাই চালাক না। আমরা কেন আর এর মধ্যে মাথা গলাতে যাই?

কেষ্ট দত্তর কথায় চন্দ্রনারায়ণের বিরক্তি আরও বেড়ে উঠতো। বিদ্রূপের সুরে সে বলতো, এই বুদ্ধি নিয়েই বুঝি আপনি দেওয়ানগিরি করেন? বুঝতে পারছেন না, এভাবে নিজের জমিদারীতে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা

কতটা লজ্জার ? থানার ঐ লোকগুলো আমার জমিদারিতেই থাকবে অথচ আমার হুকুমই মানবে না।

—কেন মানবে না ? বিনীত কণ্ঠে বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, আপনার এলাকায় বাস করে আপনার হুকুম না মেনে যাবে কোথায় ?

—কেন মানবে ? বলে ওঠে চন্দ্রনারায়ণ, ওদের টিকি তো এখন আর আমার কাছে বাঁধা নয়, ওরা যে এখন কোম্পানীর লোক। জেলার কালেক্টর হ্যারি জোন্সের হুকুম মতই তো ওরা চলবে।

—না কর্তা, বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া করা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় নতুন থানার দারোগারা তা' বুঝতে পারে। জোন্স সাহেব তো আর থানায় থানায় বসে থাকবে না। কাজেই আপনার মন জুগিয়ে ওদের চলতেই হবে। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ পালের মত থানাদারেরা আর নাই। নতুন থানার নতুন দারোগারা বুদ্ধিমান। তা'ছাড়া এই ব্যবস্থায় জমিদারীর আয়ও অনেকটা বেড়ে যাবে।

জমিদারির আয় বেড়ে যাবার কথায় কান দু'টো খাড়া হয়ে ওঠে চন্দ্র-নারায়ণের। ইদানীং চেষ্টা করেও আয় বাড়ছিল না। ওদিকে খরচ কেবল বেড়েই চলছিল। বিষয়টি নিয়ে তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল চন্দ্রনারায়ণ।

বলতে থাকে কেষ্ট দত্ত, ঐ কালেক্টর জোন্স সাহেবকে আমাদের হাত করতে হবে। লোকটা একদিকে যেমন ধড়িবাজ অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ড অসৎ ও ঘুষখোড। ঐ লোকটাকে হাত করেই চৌকিদারী চাকরাণা, চাকরাণী জঙ্গী, ঘাটিয়ালী স্বত্বের যাবতীয় জমিজমা আমরা খাসে নেব। তারপর মোটা সেলামী নিয়ে আবার অন্যকে বন্দোবস্ত দেব।

কেষ্ট দত্তর পরিকল্পনা ভালই লাগে চন্দ্রনারায়ণের। একটু আগে এই মানুষটার বুদ্ধির ওপর কটাক্ষ করার জন্যে মনে মনে একটু লজ্জিতই হয়। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বলেছেন অবশ্য মন্দ নয়। তবে সাহেবটাকে হাত করতে না পারলেই তো মুশকিল।

—সে ভার আমার। জবাব দেয় কেষ্ট দত্ত, ঘাত-ঘোঁৎ সব আমার জানা। আপনি কিছু ভাববেন না কর্তা। দেখেন কেবল আমি কি করি।

বাস্তবিকই সফল হলো কেষ্ট দত্ত। শুরু হলো জেলার কালেক্টর হ্যারি জোন্সের বাহাদুরপুরে ঘন ঘন যাতায়াত, আর সেই সঙ্গে খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে চন্দ্রনারায়ণ হয়ে উঠলো জোন্সের ব্যক্তিগত বন্ধু। আর তারপরেই কলমের এক খোঁচায় সেই জমিজমা চলে গেল জমিদারের খাসে।

চৌকিদার-দফাদার, পাইক-বরকন্দাজ, ঘাঁটিয়াল-থানাদার কারুর আর্জিই আর ধোপে টিকলো না।

আরও কয়েকটি বছর কেটে গেছে তারপর। জয়রাম এখন পুরোপুরি দিন মজুর। অন্যের জমিতে ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পরিশ্রম করে। আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। স্বামীর অবস্থা দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয় রাধা। অপরাধীর ভঙ্গিতে বলে, আমার জন্যই আজ তোমার এই অবস্থা গো। তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারি সব।

—তোমার জন্য? বিস্মিত চোখে রাধার দিকে তাকায় জয়রাম।

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমারই জন্য। বলতে থাকে রাধা, আমি না থাকলে তুমি চলে যেতে সেই পলাশপুর। পাইকের কাজ ছাড়তে না তুমি।

রাধার কথা মোটেই মিথ্যে নয়। জয়রামের আজকের এই অবস্থার জন্যে আসলে রাধাই অনেকটা দায়ী। কিন্তু তাই বলে সেকথা বলে রাধাকে কষ্ট দিতে পারে না জয়রাম। তাই সে তাড়াতাড়ি রাধার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হালকা স্বরে বললে, দেখ, কপালে যা লেখা কাছে তা ঘটবেই। এজন্য আমি তুমি কেউই দায়ী না। তা'ছাড়া কে বলতে পারে ঐ পাইকের কাজ করতে করতেই একদিন কোন ডাকাতের হাতে আমার প্রাণটা যেত না? ভগবান হয়তো তাই আমাকে সরিয়ে এনেছে। কথার শেষে জয়রাম স্ত্রীকে নিজের কাছে টেনে এনে আদর করতে থাকে। স্বামীর আদরে সেই মুহূর্তে রাধা নিজেকে হারিয়ে ফেলে তার বুকে মুখ লুকোয়।

একসময় রাধা মুখ তুলে জয়রামকে বললে, আচ্ছা, আমাদের সেই জমিটুকুন আর ফেরৎ পাওয়া যায় না?

—কি করে যাবে? জবাব দেয় জয়রাম, জেলা কালেক্টরের কাছে ধন্না দিয়েও যখন কোন ফল হয় নাই তখন আর কোন আশা নাই।

—চেষ্টা করতে দোষ কি?

—না, দোষ কিছু নাই। তবে ফল হবে না।

—বেশ তো, দেখই না আবার চেষ্টা করে। জমিদার ঐ জমিটুকুন এমনি না দেয় তো বন্দোবস্ত দিক্। জমিদার নিজে তো আর চাষ করবে না।

—ওরে বাবা, বলে ওঠে জয়রাম, বন্দোবস্ত নিতে হলে যে সেলামী লাগবে তা' পাবো কোথায়?

একটু সময় কি যেন চিন্তা করে রাধা। তারপর জয়রামের দিকে চোখ তুলে বললে, আমি যদি টাকা জোগাড় করে দিই?

—তুমি কোথায় টাকা পাবে? জিজ্ঞেস করে জয়রাম। তারপর একটু থেমে আবার বললে, বুঝেছি গো, চিতলমারী থেকে আনিয়ে দেবে, তাই তো?

জবাবে একটু রহস্যময় হাসি হেসে রাধা বললে, না গো না, সেখানে পয়সাকড়ি কোথায়? তা'ছাড়া, আমি চাইবোই বা কোন্ মুখে? জানো তো, বাবা মরার সময় কিছু পয়সা-কড়ি ছাড়া কোন জমি-জিরেত রেখে যায় নাই। ঐ পয়সা দিয়েই আমার বিয়ে হয়েছে। বাকি যা খুদকুড়া পড়ে আছে তা' নেড়ে-চেড়েই ওদের চলছে।

—তা'হলে কে তোমাকে টাকা দেবে? কৌতূহলী কণ্ঠস্বর জয়রামের।

জবাব দেয় রাধা, আমার গায়ের গয়না ক'খানা তো এখনও রয়েছে। তা' দিয়েই তুমি সেলামি দেবে গো।

মাথা নেড়ে জয়রাম বললে, না—না, তা' হবে না। তোমার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া গয়না আমি নিতে পারবো না।

স্বামীর জবাবে অভিমানে মুখখানা ভারি হয়ে ওঠে রাধার। আর কিছু না বলে সে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

বলতে থাকে জয়রাম, নিজের জমি নাই তো কী হয়েছে? সংসারে তো মাত্তর দু'টো পেট। পরের জমিতে খেটেই কোনমতে চালিয়ে নেব। তুমি কিছু ভেবো না।

গম্ভীর কণ্ঠে রাধা বললে, পেট চললেই বুঝি হলো? মান-সম্মান বলে বুঝি কিছু নাই?

—মান-সম্মান? কি বলছো তুমি?

—হ্যাঁ গো, মান-সম্মান। ভেবে দেখ, কি ছিলে তুমি, আর কি হয়েছ। ছিলে তুমি থানার পাইক। গাঁয়ের মানুষ কত সমীহ করতো তোমাকে। আর, আজ তুমি পরের জমিতে গতর খাটাও।

স্ত্রীর মনের কথাটা বুঝে নিয়ে জয়রাম বললে, তা' ঠিক। পাইক বলে গাঁয়ের মানুষ একটুকুন সমীহ করতো বটে। ভালো না বাসলেও ভয় করতো। আমার বাবার আমলে বাবা চৌকিদার হয়ে গাঁয়ের মানুষের যে ভালবাসা পেয়েছে, আমি থানার পাইক হয়েও তা' পাই নাই।

অবশেষে রাধার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই জয়রামকে কথা দিতে হয়। বলতে হয়, ঠিক আছে—ঠিক আছে। বলছো যখন তখন না হয় তোমার গয়নাটুকুন নেব। তবে তার আগে জমিদার কাছারিতে গিয়ে সেলামির পরিমাণটা জানতে হবে।

তের

মেদিনীপুরের নৌকা-জাহাজ তৈরির কারখানার ধনী মালিক লোচনদাস মাঝি যেদিন তার নিজের গ্রাম পাংশুটিতে গ্রেপ্তার হলো সেদিন সারা গ্রামখানা তোলপাড় হয়ে উঠলো। কেবল লোচনদাস একাই নয়, সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হলো পাংশুটি গ্রামেরই আরও তিন-চারজন মিস্ত্রি। যারা নাকি লোচনদাসের কারখানায় কামার, ছুতোর, নক্সাকারের কাজ করতো। মালিকের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্যে তারাও গাঁয়ে এসেছিল তাদের পরিবার পরিজনের কাছে। নতুন থানা পলাশপুরের জাঁদরেল দারোগা কৃপাসিন্ধু সরকারের জালে একযোগে ধরা পড়লো সবাই।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই গোটা পাংশুটি গ্রামখানা ভেঙে পড়লো লোচনদাস ও তার মিস্ত্রিদের বাড়িতে। সবার চোখে-মুখেই কৌতূহল। ব্যাপারখানা কি? কোম্পানীর পুলিশ হঠাৎ এভাবে তাদের গ্রেপ্তার করলো কেন? কী করেছে তারা? মিস্ত্রিদের কথা বাদ দিলেও স্বয়ং লোচনদাসের মত ধনী মানুষটা যে কোনরকম চুরি-জোচ্চুরির দায়ে ধরা পড়েছে তা' তো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

লোচনদাসের অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল, প্রতিবেশীদের মধ্যে ফিস্‌ফিসে আলোচনা। কিন্তু কেউই সাহস করে দারোগা কৃপাসিন্ধুর সামনে গিয়ে কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারলে না। গম্ভীর প্রকৃতির দশাসই চেহারার লোক কৃপাসিন্ধু। ভিন্ জেলার মানুষ সে। এমনকি তার সঙ্গী পাইক-বরকন্দাজদের অধিকাংশও ভিন্ অঞ্চলের বাসিন্দা। কেবল চাকরির খাতিরেই তাদের পলাশপুর অঞ্চলে বাস।

জেলার সবচাইতে বড় থানা পলাশপুর। জমিদারী প্রশাসনের আমলের তিনটি ছোট থানা ভেঙে এই নতুন থানা। কোম্পানীর হিসেবমত এই থানায় আরও কিছু পাইক-বরকন্দাজের প্রয়োজন থাকলেও কোম্পানীর পুলিশবাহিনীতে যোগদান করার মত লোকের বড়ই অভাব। পাইক-বরকন্দাজের মাসিক মাইনে নগদ চার টাকা। এমন মোটা মাইনের লোভেও অনেকেরই এই কাজে আসতে নারাজ। কারণ অবশ্য একটাই—চাকরি—কোম্পানীর মাইনে-করা চাকরগিরি। তারওপর কর্মস্থান ও বাসস্থানের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্ন তো আছেই। কাজেই পাইক-বরকন্দাজ পদের জন্যে কোম্পানীকে নজর দিতে হলো বাংলা মুলুকের সীমানা ছাড়িয়ে

বিহার-উত্তরপ্রদেশের দিকে।

পলাশপুরের মত একটা নতুন অথচ গুরুত্বপূর্ণ থানার দারোগা পদের জন্যে একজন জাঁদরেল দারোগা পদের জন্যে ইংরেজ কালেক্টর অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে কৃপাসিন্ধু সরকারকে এনে বসিয়েছিল ঐ পদে।

ততক্ষণে লোচনদাসের কোমরে দড়ি পড়েছে। মিস্ত্রিদের কোমরেও দড়ি বেঁধে তাদের টেনে আনা হয়েছে লোচনদাসের বাড়ির সামনে। এবারে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে জেলা সদরে।

মৃত্যুশোকে শোকাতুর পরিবার-পরিজন যেমনি মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার মুহূর্তে নতুন করে একযোগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি কোমরে দড়ি বাঁধা আসামীদের চালান করবার মুহূর্তে লোচনদাসের অন্দরে আবার নতুন করে কান্নার রোল জেগে ওঠে। মিস্ত্রিদের অনেকের চোখে জল থাকলেও লোচনদাস নিজে কিন্তু স্থির। শুকনো মুখে সামান্য বিষাদের ছায়া পড়লেও তার নিজের ভাব-ভঙ্গিতে একধরনের দৃঢ়তার ছায়া। মিস্ত্রিদের মধ্যে একজনকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে লোচনদাস মৃদু কণ্ঠে তাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, ওকি রে, মেয়েমানুষের মত অমন কাঁদছিস কেন? আমিও তো যাচ্ছি রে তোদের সঙ্গে। আমি বাঁচলে তোরাও বাঁচবি।

রওনা হবার মুহূর্তে সমাজপতি শ্যাম ভট্টচাজ খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে কৃপাসিন্ধুর সামনে এসে বিনীত কণ্ঠে বললে, আমাদের লোচন তার দলবল নিয়ে বুঝি কোন কঠিন অন্যায় কাজ করেছে? তাই বুঝি ওদেরকে এভাবে বেঁধে নিয়ে চললেন?

শকুনের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্যাম ভট্টচাজের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে দারোগা কৃপাসিন্ধু। তার ঐ দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে শ্যাম ভট্টচাজ। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটু হাসতে চেষ্টা করে আবার কিছু বলতে যায় সে। কিন্তু তার আগেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে কৃপাসিন্ধুর। দু'পা এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করে, কে আপনি?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি—আমি—। ঘাবড়ে গিয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলে শ্যাম ভট্টচাজ। ভিড়ের মধ্য থেকে এমনি সময় বলে ওঠে সনাতন চক্কোত্তি, আজ্ঞে উনি এই গাঁয়ের মাথা—সমাজপতি। শ্যাম ভট্টচাজ।

সনাতনের বদলে শ্যাম ভট্টচাজের দিকে তাকিয়েই কৃপাসিন্ধু বললে, আপনিই সমাজপতি? বেশ—বেশ। তা, কী জানতে চাইছেন? কেন এদের গ্রেপ্তার করেছি সেই কৈফিয়ৎ চাইছেন?

একহাত জিভে কামড় দিয়ে বলে ওঠে শ্যাম ভট্‌চাজ, কী যে বলেন! আপনারা খোদ কোম্পানীর লোক। আপনাদিগের কৈফিয়ৎ—।

শ্যাম ভট্‌চাজের কথার মধ্যেই আবার বলতে থাকে কৃপাসিন্ধু, আপনাদের এই লোচনদাস ও তার মিস্ত্রিরা জেলা কালেক্টরের হুকুম অমান্য করেছে।

—অ্যাঁ! বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে পড়ে শ্যাম ভট্‌চাজ, কোম্পানীর রাজত্বে বাস করে কালেক্টরের হুকুম অমান্য? বড়ই গর্হিত কাজ—বড়ই গর্হিত। কৃপাসিন্ধুকে একটু খুশি করতে চেষ্টা করে শ্যাম ভট্‌চাজ। তারপর লোচনদাসকে বললে, হ্যাঁহে লোচন, তুমি তো বাবা বোকা নও। ত'াহলে এমন গর্হিত কাজ করলে কেন, বাবা?

শ্যাম ভট্‌চাজের কথায় বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় লোচনদাস, মানার মত হুকুম নয় বলেই তো মানতে পারি নাই গো, ভট্‌চাজমশায়। মেদিনীপুরে আমার ওপর সাহেব কালেক্টরের নোটিশ এলো, জাহাজ-নৌকা তৈরির কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে।

—কেন? প্রশ্ন করে শ্যাম ভট্‌চাজ।

জবাব দেয় লোচনদাস, আমার মত জাহাজ-নৌকা তৈরির কারখানার মালিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলিকাতার সেই গিলবার্ট সাহেব আর টিটাগড়ের আর এক সাহেব কিছুতেই পারছিল না। তাই তারা এসে ধরে পড়লো জেলার কালেক্টর সাহেবকে। আর সাহেবও আমাদের কারখানা বন্ধ করার হুকুম দিলে। কোম্পানীর ভয়ে সবাই কারখানা বন্ধ করলেও আমি তা' করি নাই। তাই আমাদের গ্রেপ্তার করে চালান দিচ্ছে।

এতক্ষণে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। আর পরিষ্কার হতেই উপস্থিত জনতার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ধিক্কার চিহ্ন। এ কেমন অবিচার! কলিকাতা ও টিটাগড়ের সাহেবদের তৈরি নীচু মানের জাহাজ-নৌকাকে মদত দিতে কোম্পানীর এ কেমন অত্যাচার! আর, কোম্পানী এদেশেরই একদল পুলিশকে দিয়ে নির্বিবাদে সেই অত্যাচার চালাচ্ছে!

চোখে-মুখে ধিক্কার চিহ্ন ফুটে উঠলেও মুখ ফুটে তা' বলার ক্ষমতা কিম্বা সাহস নেই উপস্থিত জনতার। তাই কৃপাসিন্ধু তার দলবল সহ লোচনদাসদের নিয়ে চোখের আড়ালে যেতেই সেই নীরব ধিক্কার সরব হয়ে ওঠে। কোম্পানীর এই অত্যাচার অবিচারে মুখর হয়ে ওঠে তারা। এমনকি রতন দত্ত, যে নাকি কোনকালেই লোচনদাসকে পছন্দ করতো না, সেই প্রৌঢ় মানুষটি

পর্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে, এ আবার কেমন ধরনের রাজত্ব শুরু হলো রে, বাবা! ঐ সাদা চামড়ার লোকগুলো এদেশের মানুষকে ব্যবসা করতেও দেবে না নাকি? লোচনের যত দোষই থাকুক না কেন, তাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়াটা কিন্তু মস্ত অন্যায়। সে তো কোন দোষ করে নাই। সে তো কেবল নৌকা-জাহাজের ব্যবসা করছিল। তা' বাপু, তোদের জাতভাইদের ব্যবসার সুবিধা করে দিতে গিয়ে এদেশের মানুষকে হেনস্থা করে তাদের পেটের ভাত মারবি কেন রে? কি বলেন হে চক্কোত্তি মশায়?

কথার শেষে রতন দত্ত সনাতন চক্কোত্তির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাতেই লোচনদাসের কট্টর সমালোচক সনাতন আমতা আমতা করে জবাব দেয়, তা' অবশ্য ঠিকই বলেছেন, দত্তমশায়। তবে কি জানেন, জলে বাস করে তো আর কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা চলে না। তুই বাপু ডিঙ্গি বানিয়ে পেট চালাস। তুই কোন্ সাহসে জেলার কালেক্টরের হুকুম অমান্যি করতে গেলি? এবার বোঝ ঠ্যালা।

সনাতনের জবাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন খুশির ভাবটুকু কিন্তু নজর এড়ায় না রতনের। মনে মনে বিরক্ত হয়ে সে আবার বললে, তা' আপনি যাই বলেন না কেন চক্কোত্তি মশায়, কোম্পানীর দারোগা এভাবে ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে মোটেই ভালো করে নাই। তা'ছাড়া ঐ নিরীহ মিস্ত্রিগুলোর বা কী দোষ?

—এ আবার আপনি কী বললেন, দত্তমশায়? কোম্পানীর দারোগার অপরাধ কোথায়? সে তো কোম্পানীর চাকর। যা হুকুম হবে তাই করবে। বলে ওঠে সনাতন।

—তাই বলে ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ থাকবে না? বলতে থাকে রতন, ঐ সাদা ব্যাটারা বিদেশী হলেও তোরা তো এদেশেরই মানুষ। হুকুমের চাকর বলে ওরা যা বলবে তাই করতে হবে?

কথা বলতে বলতে রতন দত্ত বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। আশে-পাশের প্রায় সবাই সমর্থনও করছিল তাকে। তাই দেখে সনাতন আর কথা বাড়ায় না।

রতনের কথার খেই ধরে আর একজন প্রতিবেশী বলে ওঠে, আসলে ব্যাপারখানা কি জানেন, খুড়ো? কথায় আছে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এও তাই। থানা-পুলিশের দারোগা-পাইক-বরকন্দাজগুলোই হচ্ছে হতচ্ছাড়া।

সাহেব ধরে আনতে বললে ওরা বেঁধে এনে সাহেবকে খুশি করে। সাহেবদের জুতোর তলা চাটতেও ওদের লজ্জা নাই। ছি—ছি—ছি, এমন চাকরিও মানুষ করে? আমাদের এই লোচনদাসের কথাই ধরেন না। ঐ দারোগা ব্যাটার এমন কী দরকার ছিল তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে চালান দিতে? লোচনদাস কি পালিয়ে যেত? তা নয়, খুড়ো। আসলে ঐ ব্যাটা তার ক্ষেমতা জাহির করলো।

প্রতিবেশী লোকটি থামতেই জটলার মধ্যে উপস্থিত সবাই হৈ-হৈ করে তাকে সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে জেলা কালেক্টর সেই বিদেশী লোকটার চাইতেও ঐ পুলিশ বাহিনী বিশেষ করে দারোগা কৃপাসিন্ধুর ওপরই জমে ওঠে তাদের সম্মিলিত ক্ষোভ। কোম্পানীর প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান এমনি ভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। শ্রদ্ধা হারায় তারা। বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে তাদের মনে। শাসক ও শাসিতের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা যেন প্রকট হয়ে ওঠে তাদের সামনে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু সেই ক্ষোভ প্রকাশের কোন পথ তাদের জানা নেই। ভেতরের ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ পায় না। তাই, সাদা চামড়ার আসল প্রশাসককে হাতের কাছে না পেয়ে কালো চামড়ার পুলিশ বাহিনীই হয়ে ওঠে তাদের সেই ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

জেলার কালেক্টর হ্যারি জোন্স খাঁটি বিলিতি সাহেব হলেও এদেশের যে দু'টি বস্তুর ওপর তার একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তার একটা হলো এদেশীয় নারী, আর অন্যটা দেশী নিয়মে তাম্রকূট সেবন। বাঙ্গালী ললনাদের সম্পর্কে তার প্রশস্তি মাত্র দু'টো ইংরেজি শব্দে—ভেরি সফট্। আর হুঁকো-কল্কে সম্পর্কে মাত্র একটি শব্দ—ওয়াণ্ডারফুল।

পলাশপুর থানার দুঁদে দারোগা কৃপাসিন্ধু সরকার যখন দলবল নিয়ে কালেক্টরের অফিসে এসে হাজির হয় তখন হ্যারি জোন্স আটো-সাঁটো পোশাক পরে একটা ছোট্ট কাঠের টেবিলের সামনে একখানা লম্বা পা-ওয়ালা চেয়ারে বসে কি যেন লিখছিল, আর গড়গড়ার নলে মুখ লাগিয়ে থেকে থেকে ধোঁয়া ছাড়ছিল। উর্দিপরা একজন চাপরাশি দু'হাতে ধরে রেখেছিল গড়গড়াটা। পেছনে দাঁড়িয়ে একখানা মস্তবড় পাখা হাতে আর একজন চাপরাশি নবাবী ঢংয়ে হাওয়া করে চলছিল সাহেবকে।

দারোগা কৃপাসিন্ধু তার দলবল নিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকতেই হ্যারি জোন্স চো'খ তুলে একবার তাকিয়েই তেমনি মাথা নিচু করে লিখে যেতে থাকে তার

হাতের লম্বা পাখের কলম দিয়ে। আর তার দিকে তাকিয়ে দলবল নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাসিন্ধু।

অবশেষে এক সময় শেষ হয় সাহেবের লেখা। কলমদানীতে কলম রেখে হ্যারি জোন্স কৃপাসিন্ধুর দিকে তাকাতেই কৃপাসিন্ধু সপ্রতিভ মুখে বলে ওঠে, আপনার হুকুম তামিল করেছি, হুজুর। ধরে এনেছি লোচনদাস আর তার সাগরেদদের।

কৃপাসিন্ধুর কথায় হ্যারি জোন্সের কুতকুতে চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই চোখের দৃষ্টি পাল্টে তীক্ষ্ণ চোখে লোচনদাসের দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা বাংলায় জিজ্ঞেস করে, টোমার নাম লোচনডাস আছে?

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় লোচনদাস, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

—এরা কারা আছে? হ্যারি জোন্স লোচনদাসের মিস্ত্রিদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

লোচনদাস কিছু জবাব দেবার আগেই দারোগা কৃপাসিন্ধু তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আজ্ঞে হুজুর, এরা এই লোচনদাসেরই লোক। এরা কারখানার মিস্ত্রি।

—মিস্ত্রি? ইউ মিন আর্টিজন? গুড! সাহেব এবার অপেক্ষাকৃত নরম দৃষ্টিতে দেখতে থাকে মিস্ত্রিদের। তারপর তাদের উদ্দেশেই আবার বললে, টোমরা খুব ভালো মিস্ত্রি আছে। হামি শুনিয়াছে টোমাডের জন্যেই লোচনডাসের ফ্যাক্টরীর, আই মিন, কারখানার খুব নাম-ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় কৃপাসিন্ধু, ঠিকই শুনেছেন, হুজুর। ঐ যে লোকটা —কি যেন নাম তোর—ভোলা—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভোলা নস্কর—ওর মত জাহাজ-নৌকার নক্সাকার নাকি এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নাই।

—ইয়েস—ইয়েস, বলতে থাকে জোন্স সাহেব, ক্যালকাটার গিলবার্টের কাছে হামি শুনিয়াছে ইংল্যাণ্ডের আর্টিজনদের থেকেও নাকি এই নেটিভ বেঙ্গলী আর্টিজনরা অনেক বেশি এক্সপার্ট।

—আজ্ঞে যা বলেছেন হুজুর, বলতে থাকে দারোগা কৃপাসিন্ধু, তাই তো বিলেতেও নাকি এদেশে তৈরি জাহাজ-নৌকার খুব কদর।

কথাটা বলে ফেলেই কৃপাসিন্ধু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সাহেবের কাছে তার নিজের দেশকে এভাবে খাটো করা বোধহয় ঠিক হয় নি। সাহেব বিগড়ে গেলে বিপদ। কিন্তু হ্যারি জোন্স সেদিকে না গিয়ে এবার মিস্ত্রিদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে লোচনদাসের দিকে তাকায়। জোড়া ভ্রু-যুগল কুঁচকে ওঠে আবার। গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, ওয়েল লোচনডাস, এবার টুমি

বলো, কেন টুমি মিড্‌নাপুর কলেক্টরের আদেশ অমান্য করিয়াছ ? কেন টুমি নোটিশ পাইয়া কারখানা বন্ধ কর নাই ?

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে লোচনদাস। সাহেবের এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে সে ? কেমন করে সে বলবে যে তোমরা বিলিতি মানুষগুলো এদেশে এসেছো আমাদের সর্বনাশ করতে ?

নীরব লোচনদাসকে ধমকে ওঠে সাহেব। বললে, চুপ করে আছ কেন ? জবাব ডাও। হোয়াই—কেন—কেন টুমি কারখানা চালু রাখিয়াছ ?

আর চুপ করে থাকা চলে না। একটা কিছু জবাব দিতেই হয়। তাই ধীরে ধীরে মুখ তুলে নীচু কণ্ঠে জবাব দেয় লোচনদাস, আজ্ঞে হুজুর, কারখানা বন্ধ করলে এই ওস্তাদ মিস্ত্রিরা যাবে কোথায় ? এরা যে খেতে না পেয়ে মরবে, হুজুর।

—ডোণ্ট টক্ ননসেন্স, চিৎকার করে ওঠে হ্যারি জোন্স। সাহেবের সেই চিৎকারে উপস্থিত মানুষগুলোর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। জোন্স আবার বললে, ওদের খাওয়াইবার ডায়িত্ব টোমার নয়। সে ডায়িত্ব হামার—হামাডের।

টেবিলের ওপর থেকে সেই পাখের কলমটা হাতে তুলে নিয়ে জোন্স সাহেব সেটা দিয়ে নিজের গালে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কি যেন চিন্তা করতে থাকে। তারপর একসময় আবার লোচনদাসকে বললে অল্ রাইট। হামি টোমাকে পার্ডন, আই মিন, ক্ষমা করিটে পারে। বাট্ ওয়ান থিং, টুমি কারখানা আর কখনও খুলিটে পারিবে না। ডু ইউ ফলো ?

লোচনদাসকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে কৃপাসিন্ধু, শোন লোচনদাস, বাঁচতে চাও তো সাহেবের কথায় রাজি হয়ে যাও। নইলে জেলে গিয়ে পচতে হবে।

নিরুপায় ভঙ্গিতে লোচনদাস একবার হ্যারি জোন্সের দিকে, আবার কৃপাসিন্ধুর দিকে তাকায়। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, রাজি, হুজুর।

—গুড্! বলে ওঠে জোন্স সাহেব। তারপর কৃপাসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, বণ্ড লেও।

—বণ্ড ! কথাটা বুঝতে না পেরে কৃপাসিন্ধু তাকায় জোন্সের দিকে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে জোন্স, বণ্ড—মুচলেকা—মুচলেকা। এই লোচনডাসের মুচলেকা নাও।

এরপর লোচনদাসের কাছ থেকে যথারীতি মুচলেকা নেয়া হয়। মুচলেকার কাগজে লোচ দাসের আঙুলের টিপ-ছাপ্ দেয়া শেষ হতেই হ্যারি জোন্স কৃপাসিন্ধুকে বলল, ওকে এবার ছাড়িয়া ডাও।

দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে লোচনদাস একপাশে সড়ে দাঁড়ায়। সাহেব এবার মিস্ত্রিদের দিকে তাকিয়ে বললে, টোমাডিগের ও মুচলেকা ডিটে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে নক্সাকার ভোলা নস্কর বলে ওঠে, হ্যাঁ হুজুর, মুচলেকা দেব।

—সেই সঙ্গে আর একটা কণ্ডিশন, আই মিন, শর্ট আছে। মৃদু হেসে হ্যারি জোন্স বললে।

—শর্ত? ভোলা তাকিয়ে থাকে সাহেবের মুখের দিকে।

—ইয়েস, শর্ট, বলতে থাকে জোন্স, টোমাডিগকে ক্যালকাটা ষাইটে হইবে।

—কলিকাতা! চমকে উঠে মিস্ত্রিরা একযোগে উচ্চারণ করে শব্দটা। ঐ সহরটা সম্পর্কে একধরনের ভীতি মিশ্রিত কৌতূহল ছিল তাদের মনে। সাহেবদের তৈরি ঐ মস্তবড় সহরে নাকি কেউ কাউকে চেনে না। গোলক ধাঁধার মত রাস্তায় পথ ভুল করলে নাকি ঘরে ফেরা কঠিন। তবে পুণ্যসলিলা মা গঙ্গা আছেন সেখানে। সেই টানেই গাঁয়ের এক-আধজন কখনো-সখনো ঐ সহরে গেলেও ফিরে এসে ম্লেচ্ছদের ঐ সহর সম্পর্কে তারা যে বর্ণনা দেয় তাতে শ্রোতাদের কৌতূহল বাড়লেও গাঁয়ের মানুষ ঐ সহরে যেতে তেমন একটা উৎসাহবোধ করে না। দূরে বসে সহর কলকাতার রকমারি কেচ্ছা কাহিনী শোনা, আর নিজেরা গিয়ে তার মধ্যে হাজির হওয়া এক জিনিস নয়।

কলকাতার নামোচ্চারণে মিস্ত্রিদের চমকানো কিন্তু নজর এড়ায় না কালেক্টর সাহেবের। অশিক্ষিত এই নেটিভ লোকগুলো সম্পর্কে সেই মুহূর্তে সে একধরনের অনুকম্পা বোধ করে। সে নিজে কলকাতা থেকে দূরে এই জেলা সদরে পড়ে আছে বলে খুবই অসুখী। আর এই মানুষগুলো কিনা সেখানে গিয়ে বাস করার কথা শুনেই চমকে ওঠে।

হ্যারি জোন্স আবার বললে, নো—নো, ভয়ের কিছু নাই। ক্যালকাটা ইজ এ মার্ভেলাস সিটি। বহুট বড় বড় বাড়ি আছে। বহুট পয়সা ভি আছে। গিলবার্ট হামাকে বোলেছে তার ওস্টাড আর্টিজন, আই মিন, কারিগর দরকার। টোমরা সেখানে ঠাকবে, কাম করবে, ভালো পয়সা ভি পাবে। এই—লোচনডাস টোমাডিগকে যা পয়সা ডিটো গিলবার্ট টার চাইটে বেশি ডিবে। এখন বলো, যাবে? নইলে কয়েড খেটে হোবে!

নিরুপায় মিস্ত্রিরা পরস্পরের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। হয় সাহেবের শর্ত মেনে নিয়ে মুচলেকায় টিপ-ছাপ দিতে হবে, নইলে কয়েদ যেতে হবে। ভোলা একবার তাকায় তাদের পুরানো মালিক লোচনদাসের দিকে। তার মুখেও অসহায়তার চিহ্ন। অগত্যা কপাল ঠুকে বলে ওঠে ভোলা, হ্যাঁ সাহেব, আমরা রাজি।

সাহেবদের এই অত্যাচারের খবর কেবল পাংশুটি গ্রামেই নয়, সেই গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে বড় বহেরা, চিতলমারী, কমলাপুর এমনকি ঘুঘুডাঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার সবার মুখেই কঠোর সমালোচনা—এ কেমন ধরনের রাজত্ব যে দেশের মানুষের সর্বনাশ করে বিদেশীদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করা? এ কেমন রাজত্ব যে দেশের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে ঐ সাহেবগুলো? আর তাদের এই কাজে কিনা মদত দিয়ে চলেছে দারোগা কৃপাসিন্ধুর মত কতগুলো স্বার্থপর মানুষ যাদের একমাত্র কাজ দেশের প্রজাপুঞ্জের ওপর অত্যাচার করে ঐ সাহেবদের মনোরঞ্জন করা! ওরা এদেশের মানুষ হয়েও ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের মত নিজেদের উচ্চস্তরের বলে মনে করে। ওরা ভুলে গেছে যে সেকালে এই দেশের মানুষই ছিল ওদের প্রভু। আজ কিনা ওরাই তাদের প্রভু হয়ে তাদের ওপরই ছড়ি ঘোরাচ্ছে!

সারা দেশে একমাত্র কলিকাতার ও টিটাগড়ের সাহেব কোম্পানী ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে নৌকা-জাহাজ তৈরি বন্ধের হুকুমে আলোড়ন ওঠে দেশের মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে ওস্তাদ কারিগরেরা মাথায় হাত দেয়। এবার যে তাদের জাত-ব্যবসা উঠে যাবে। তাদের যে এবার না খেতে পেয়ে মরতে হবে। কলিকাতার ঐ বিলেতি কোম্পানী আর ক'জন কারিগরকে কাজ দেবে? আর দিলেও তো পরিবার পরিজন ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে সেই সুদূর কলিকাতায় কিম্বা টিটাগড়ে। একবার গেলে, গাঁয়ে ফিরে আসাও তো এক মস্ত দায়। পথে ঘাটে দস্যু-তস্কর-ঠগীদের যে উৎপাত তাতে তো যে কোন সময় তাদের হাতে মারা পড়তে পারে।

পুরানো থানা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন থানা-পুলিশের সৃষ্টি, নতুন থানার নতুন দারোগাদের কার্যকলাপ ইত্যাদি ব্যাপারে জয়রামের মনটা এমনিতেই তিক্ত হয়ে ছিল এই নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর। থানার পাইকগিরি ছেড়ে দিয়ে ভূমিহীন কৃষকদলে মিশে যেতে বাধ্য হয়ে জয়রাম এই নতুন প্রশাসন ব্যবস্থাকেই এর জন্যে দায়ী করতো। জেলা কালেক্টর হ্যারি জোন্সের কাছে ধর্ণা দিয়েও নিজের হারানো জমিটুকু উদ্ধার করতে না পারায় ঐ বিদেশীদের ওপরই মনে

মনে খাপ্পা হয়ে ছিল সে। এমনকি জেলা কালেক্টরের কাছে বিফল হয়ে অনেক কৌশলে অবশেষে মোটা সেলামির বিনিময়ে জমিদারের দেওয়ান কেষ্ট দত্তর কাছ থেকে জমিটুকুর বন্দোবস্ত নিতে সমর্থ হয়েও ঐ বিদেশীদের সম্পর্কে তার মনের বিদ্বেষ কিন্তু একটুও হালকা হলো না। কেবলই তার মনে হতো, এই উড়ে এসে জুড়ে-বসা লোকগুলো এদেশে এসেছে কেবল তাদের সর্বনাশ করতে। ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব হবে তা' সে জানে না।

কথাটা একদিন স্ত্রী রাধাকে বলতেই রাধা চোখ বড় করে গালে হাত দিয়ে বললে, এসব কী বলছো গো? কোম্পানীর রাজত্বে বাস করে এমন ভাবনা তো ভালো লক্ষণ না।

—কোম্পানীর বাপের রাজত্ব নাকি এটা? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে জয়রাম, ওরা যা খুশি হুকুম দেবে, আর আমরা তাই শুনবো?

—চুপ্, চুপ্, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রাধা, এসব কথা বলতে নাই। দারোগা -পুলিশের কানে এসব কথা উঠলে বিপদ হবে।

তেমনি তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় জয়রাম, রাখো ওসব দারোগা পুলিশের কথা। দশ-বারো বছর আমিও থানায় কাজ করেছি। আজকের থানার এই দারোগা-পাইক-বরকন্দাজগুলোই তো যত নষ্টের গোড়া। ওদের নষ্টামিতেই গাঁয়ের মানুষের এই হাল। কোম্পানীর রাজত্বে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে, আর কোম্পানীর সাহেবদের বখরা দিয়ে, নিজেদের আখের গুছাচ্ছে।

জয়রাম থামতেই রাধা একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। পরক্ষণেই সে হালকা সুরে হেসে বলে ওঠে, বুঝেছি—এতক্ষণে তোমার রাগের আসল হেতু বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝেছ? ভ্রূ কুঁচকে স্ত্রীর দিকে তাকায় জয়রাম।

মুখটিপে হেসে জবাব দেয়ে রাধা, নতুন থানার দারোগা-পাইক-বরকন্দাজদের ক্ষেমতা দেখে তোমার চোখ টাটাচ্ছে। পাইকগিরি ছেড়ে দিয়ে এখন বোধহয় তোমার খেদ হচ্ছে। তাই না গো?

রাধার মন্তব্য কানে যেতেই মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে জয়রামের। তার নিজের স্ত্রী তার সম্পর্কে এমন ধারণা করে বসে আছে? কোন জবাব না দিয়ে ব্যথাতুর চোখে সে একটু সময় তাকিয়ে থাকে রাধার মুখের দিকে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললে, তুমি আমাকে এত ছোট মনে করলে?

সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড করে বসে রাধা। ঘরের খোলা দরজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সেই দিনের বেলা জয়রামের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, না গো, না। আমি তোমার সঙ্গে একটু মস্করা করছিলাম গো।

স্ত্রীর হাতের স্পর্শে সেই মুহূর্তে মনের অভিমানটুকু মুছে যায় জয়রামের। স্বামীর বুকে মুখ রেখে বলতে থাকে রাধা, কাজ কি বাপু এসব ভাবনা ভেবে? কে দেশে রাজত্ব করছে তা দিয়ে তোমার আমার দরকার কি? আমাদিগের জমি ছিল না, এখন হয়েছে। গায়ে-গতরে খেটে ঐ জমিতেই সোনা ফলাবে তুমি। আমাদের এতেই চলে যাবে। কি বলো গো?

রাধার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দেয় জয়রাম, যা বলেছ। দু'টো তো মাত্র পেট। এতেই আমাদের চলবে।

জয়রামের কথায় রাধা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠতেই জয়রাম মনে মনে বিস্ময় বোধ করে। রাধ এমনিতে হাসি-খুশি হলেও আজ যেন তার খুশির পরিমাণ একটু বেশি। কথাটা রাধাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, কিন্তু তার আগেই সলজ্জ কণ্ঠে বলে ওঠে রাধা, তোমাকে একটা ভালো খবর দেব গো।

—ভাল খবর? স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকায় জয়রাম।

একটু সময় মাথা নীচু করে থাকে রাধা। দেখতে দেখতে তার মুখখানা লজ্জায় আরও বেশি রাঙা হয়ে ওঠে। মুখ তুলে স্বামীর চোখে চোখ রেখেই তাড়াতাড়ি নিজের চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর আবার একটু হেসে বললে, তুমি ঠিক বলো নাই গো। আমাদের মাত্তর দু'টো পেট নয়। এবার তিনটে হবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জয়রাম তার সারা দেহে অনুভব করে এক আশ্চর্য শিহরণ। এক বিচিত্র অনুভূতিতে তার মনটা উদ্বেল ওঠে সেই মুহূর্তে। রাধাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বলে ওঠে, সত্য বলছো? সত্য সত্যই এবার আমি বাবা হবো?

তেমনি সলজ্জ ভঙ্গিতে তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে জয়রামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে জবাব দেয় রাধা, হ্যাঁগো, হ্যাঁ।

জয়রাম আবার একটুসময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে রাধার দিকে। তারপর হাসিমুখে বললে, আমি জানতাম গো, একদিন তুমি মা হবেই। মহম্মদগঞ্জের গাজি পীর খুব জাগ্রত। তার দরগায় সিন্নি দিলে মনের আশা পূর্ণ হবেই। এতদিনে তাই হয়েছে।

জয়রামের কথায় রাধার মুখখানা সামান্য ম্লান হয়ে ওঠে। একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে 'সে। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, না গো, না। গাজি পীর না। মা গঙ্গা।

—মা গঙ্গা! প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় জয়রামের কণ্ঠস্বর।

অপরাধীর স্বর ফুটে ওঠে রাধার কণ্ঠে। বলতে থাকে সে, তুমি শুনলে রাগ করবে বলে তোমাকে এতদিন বলি নাই। গঙ্গাপূজার দিন মা গঙ্গাকে মনে মনে মানত করেছিলাম। আর তার পরেই—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় রাধা।

একটা বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে জয়রামের একটু আগের সেই আনন্দোচ্ছল মুখখানা ঢেকে যায়। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে একই ভঙ্গিতে বসে থেকে অবশেষে বিষাদময় কণ্ঠে সে বলতে থাকে, শেষে ঐ মা গঙ্গার পথই বেছে নিলে? আমার বারণ শুনলে না? প্রথম সন্তানটিকে গঙ্গায় দিতে হবে?

রাধা জবাব না দিয়ে চুপ্ করে থাকে। স্বামীর মনোভাব জানা সত্ত্বেও সে একাজ করেছে। না করে উপায় ছিল না বলেই করেছে। বাঁজা শব্দটা স্ত্রীলোকের কাছে যে কত অসহ্য তা কোন কালেই কোন পুরুষ বুঝতে পারবে না। সেই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে গিয়েই সে তার প্রথম সন্তানটি মা গঙ্গাকে দিতে মানত করেছিল।

রাধাকে চুপ্ করে থাকতে দেখে জয়রাম হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বললে, মা গঙ্গা মাথায় থাকুক। যে আসছে তাকে আগে আসতে দাও। তারপর দেখা যাবে।

কথাটা বলেই জয়রাম লক্ষ্য করে রাধার চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

—ওকি তুমি কাঁদছো? জিজ্ঞেস করে জয়রাম।

রাধা জবাব দেয় না। সেই মুহূর্তে তার ঐ চোখের জলের উৎস স্বামীর মনে কষ্ট দেয়া কিম্বা তার ভবিষ্যৎ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা, তা' বোধহয় সে নিজেও জানে না।

জয়রাম একসময় নিজের ধুতির কোন দিয়ে রাধার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। স্বামীর পরিচর্যাটুকু উপভোগ করতে করতে তার ভারি মুখখানা খানিকটা হালকা হয়ে উঠতেই সে জিজ্ঞেস করে, তুমি সত্য বলছো? ওকে গঙ্গায় দেবে না?

—না, স্পষ্ট জবাব দেয় জয়রাম, ছেলে হোক কি মেয়ে হোক, আমি

কিছুতেই তাকে গঙ্গায় দেব না।

স্বামীর কথায় যেন একটু আশ্বস্ত বোধাকরে রাধা। তারপর আবার বললে, আমি যে মানত করেছি।

—তুমি করেছ। আমি করি নাই। জবাব দেয় জয়রাম।

—তা'হলে আমার যে পাপ হবে। ভীরু চোখে রাধা তাকায় স্বামীর দিকে।

দৃঢ় কণ্ঠে জয়রাম বললে, তোমার পাপ হবে কেন? তুমি তো রাজি। আমিই তো বাধা দেব। পাপ হলে আমার হবে, তোমার না।

আবার একটু সময় কি যেন চিন্তা করে রাধা। মুখখানা আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তার। হঠাৎ সে জয়রামের হাঁটুর ওপর উপুর হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, না গো, না। ওকে গঙ্গায় দিও। নইলে যে তোমার পাপ হবে গো।

চৌদ্দ

ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের মেয়ে-মহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। পড়শীরা কেউ আসে খবরটার সত্যাসত্য যাচাই করতে, কেউ বা আসে অযাচিত উপদেশ দিতে। বলে, এতে মন খারাপ করিস্ কেন লা? এতো পুণ্যির কাজ। পেরথম সন্তান গঙ্গায় দিলে মা'র সন্তোষ হবে। একবার বাধা সরে গেলেই দেখবি দশমাস দশ দিনেরও আর সবুর সইবে না।

জয়রাম একদিন কথাটা তোলে রাধার কাছে। বলে, লোকে বলে প্রথম পোয়াতি নাকি বাপের বাড়ি থাকে। ভাবছি, তোমাকেও চিতলমারী পাঠিয়ে দেব।

স্বামীর কথায় ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে রাধার। নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে, কী হবে গো সেখানে গিয়ে? তা'ছাড়া সেখানে আছেই বা কে? বড়মা তো অথব্ব। এক আছে দিদি। তা বাপু, দিদির ঘাড়ে সব ঝক্কি চাপানো কি ঠিক হবে?

—ঝক্কি আর কি? বলতে থাকে জয়রাম, আমি তো আছি। আমি মাঝে মাঝে যাবো।

—কিন্তু তোমাকে এখানে কে দেখবে?

—আমাকে আবার দেখার কি আছে? জয়রাম বললে, আমি নিজেই পারবো দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে।

একটুসময় ভেবে রাধা খানিকটা দৃঢ় স্বরে বললে, না গো, তা' হয় না। তোমাকে একলা রেখে আমি চিতলমারী গিয়ে নিশ্চিন্দি থাকতে পারবো না। আমি এখানেই থাকবো। যাদের বাপের বাড়িতে কেউ নাই তাদের শ্বশুরবাড়িতে ছেলেপুলে হয় না ?

সেদিনের মত কথাটা সেখানেই চাপা পড়লেও জয়রাম সেই প্রসঙ্গ আবার তোলে কয়েকমাস পরেই। মাঠের কাজ সেরে হাতে-পায়ে ধুলো মেখে দাওয়ায় এসে বসে সে বললে, আমি সারাদিন মাঠে-ঘাটে থাকি। এই দুর্বলশরীর একলা তোমার বাড়িতে থাকা ঠিক না। বলো, তো, তোমাকে চিতলমারী রেখে আসি গে।

বাস্তবিকই তাই। গর্ভবতী রাধার শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। তার ওপর নানারকম মেয়েলী উপসর্গ। কিন্তু জয়রামের কথার জবাবে রাধা বললে, তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখে আমি সগ্‌গেও যাবো না গো।

—তা'হলে তোমার দিদিকে এখানে আনতে হয়।

দিদির আসার সম্ভাবনায় মনটা নেচে ওঠে রাধার। পরক্ষণেই ম্লান কণ্ঠে বললে, কিন্তু দিদি এখানে এলে বড়মাকে সেখানে দেখবে কে ?

আবার একটু চিন্তা করে জয়রাম বললে, তা'হলে তোমার বড়মা, দিদি দু'জনেই এখানে চলে আসুক।

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে রাধা বললে, কিন্তু সেখানে বাড়ি, ঘর-দোর সব ফেলে রেখে——।

রাধার কথার মধ্যেই বলে ওঠে জয়রাম, তাতে আর কী হয়েছে ? তোমাদিগের তো জমিজমা তেমন কিছু নাই যে দেখাশোনা করতে হবে। এখন এসে ওরা এখানে থাকুক। তারপর ভালয় ভালয় সবকিছু মিটি গেলে ওরা না হয় আবার ফিরে যাবে।

প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটায় হেমাঙ্গিনী মৃদু আপত্তি তুলে বলেছিল, তা' কা করে হয় বাবা ? আমার এই ব্যামোর শরীল নিয়ে তোমার ঘাড়ে——।

হেমাঙ্গিনীর কথার মধ্যেই আবার বলে ওঠে জয়রাম, তাতে আর কী হয়েছে? আমার নিজের মায়ের ব্যামো হলে কি সে আমার কাছে থাকতো না ?

—তা' বটে, জবাব দেয় হেমাঙ্গিনী, তবে কিনা জামাই বাড়ি। গাঁয়ের লোক হয়তো পাঁচ কথা বলবে।

—বলবে বলুক, বলতে থাকে জয়রাম, জামাই তো ছেলের সমান।

এর পরে হেমাঙ্গিনী আর আপত্তি করতে না পারলেও বেঁকে বসে লাবণ্য।

বলে, আমার এই বাপের ভিটেয় যে তা'হলে সাঁঝের বেলায় একটা পিদিম পর্যন্ত জলবে না গো, ছোটপাইক।

—কিন্তু রাধার এখন শরীরের যে হাল তাতে——। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় জয়রাম।

আদরের ছোটবোনের কথায় চিন্তায় রেখা ফুটে ওঠে লাবণ্যর শ্বেতচন্দনের টিপ্ পরা কপালে। একটু ভেবে সে আবার বললে, তা'হলে বরং রাধাই এখানে আসুক। আমরা আছি, গাঁয়ের পাঁচজন আছে। খালাশ হয়ে একেবারে ছেলে কোলে করে ঘুঘুডাঙ্গায় ফিরে যাবে।

—আমি তাও বলেছিলাম, বলতে থাকে জয়রাম, কিন্তু আমাকে সেখানে একা ফেলে রেখে সে কিছুতেই এখানে আসতে চায় না।

—তাই নাকি গো! হাল্কা সুরে বলে ওঠে লাবণ্য, তোমাকে বুঝি চোখের আড়াল করতে চায় না, ছোটপাইক? তা বাপু, একি কেবল মনের টান না অন্য কিছু গো? কথার শেষে মুখটিপে হাসতে থাকে লাবণ্য।

সেই মুহূর্তে লাবণ্যর মুখের ওপর থেকে আর চোখ ফেরাতে পারে না জয়রাম। মুখটিপে হাসলে এখনও আগের মতই তার গালে টোল পড়ে। ঠিক্ আগের মতই তার চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে ওঠে খুশির আলো। অঙ্গে বিধবার বেশ ও কপালে চন্দনের টিপ্ লাবণ্যর আনন্দ ঝলমল মুখের ওপর একটা শান্ত সৌম্য আবরণ সৃষ্টি করলেও খুশির মুহূর্তে সেই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে সেই পুরানো দিনের লাবণ্য যাকে নাকি খুব ভালোভাবেই চেনে জয়রাম এবং বিয়ের পর থেকে রাধার কাছে অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন হবার আশঙ্কায় যাকে সে একটু ভয় করতেই শুরু করেছিল।

জয়রামের দৃষ্টি থেকে নিজের চোখজোড়া সরিয়ে না নিয়ে লাবণ্য তেমনি হাসতে হাসতেই আবার বললে, কি হলো 'ছোটপাইক, জবাব দিচ্ছ না কেন গো?

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে গিয়ে একটু ম্লান হেসে জয়রাম বললে, সেই কবে পাইকের কাজ ছেড়েছি, তা' আজও আমার' ছোটপাইক' নাম ঘুচলো না।

জবাবে লাবণ্য বললে, আমার কাছে তো তোমার ওটাই আসল পরিচয় গো।

সেই মুহূর্তে লাবণ্যর সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের কথা মনে পড়ে জয়রামের। নিজের বিয়ের আগে সে লাবণ্যকে নাম ধরে সম্বোধন করলেও বিয়ের পর থেকে স্ত্রী'র বড়বোনকে কি বলে ডাকবে স্থির করতে না পেরে সম্বোধন করাই ছেড়ে

দিয়েছিল।

অবশেষে রাজি হলো লাবণ্য। ছোটবোন রাধা প্রথম পোয়াতি। তারওপর দেহে তার নানা উপসর্গ। এ অবস্থায় যদি তার একটা কিছু ভালো-মন্দ ঘটে, তা'হলে যে সেই দুঃখ রাখার ঠাঁই থাকবে না তার। তার চাইতে বড়মাকে নিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা যাওয়াই ভালো। মোটে তো কয়েকটা মাস।

মা-দিদিকে কাছে পেয়ে রাধা যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে যেন ফিরে গেল তার সেই পুরানো দিনে যখন সে তার মা-দিদির স্নেহের ছায়ায় হেসে-খেলে দিন কাটাতো। একদিন সে স্পষ্টই বললে লাবণ্যকে, তুই এয়েছিস। আমি এবার নিশ্চিন্দি, দিদি। আমার এবার ছুটি।

—বলিস কিরে? বলে ওঠে লাবণ্য, তোর সংসারে আমরা তো দু'দিনের তরে এসেছি রে। তাতে তোর ছুটি হবে কেন?

পা ছড়িয়ে বসে একটা কাঁচা পেয়ারা চিবোতে চিবোতে আবদারের স্বরে জবাব দেয় রাধা, সংসার করা বড়ই ঝকমারি গো, দিদি। এখন থেকে এ সংসারের সব দায়িত্ব তোর। আমি কেবল আগের মত খাবো আর ঘুমাবো।

কথার শেষে রাধা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেও লাবণ্য কিন্তু হাসতে পারে না। বোধহয় সেই মুহূর্তে নিজের কথা ভেবেই তার মুখখানা বেদনাময় হয়ে ওঠে। এমনিভাবে চিরকাল অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েই তার জীবন কাটবে। এই তায় নিয়তি।

মাত্র কয়েক বছর আগেই গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত পার্মামেণ্ট সেটেল্মেণ্ট অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৌশলে দেশের মধ্যে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। রাজস্ব আদায়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল ইংরেজ কোম্পানী। ঐ দায়িত্ব এখন জমিদারের। লাটের খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে অনেক পুরানো জমিদারের জমিদারি চলে গেল। সেই জমিদারি কিনে আবার সৃষ্টি হলো নতুন জমিদার। প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানী যেমনি চাপালো জমিদারের কাঁধে তেমনি জমিদার তার জমিদারিকে ছোট ছোট তালুকে ভাগ করে তার পত্তনি তালুকদারের, দিয়ে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব চাপালো তাদের কাঁধে। নিয়ম অবশ্য একই! কোম্পানীকে লাটের খাজনা দিতে না পারলে জমিদারের জমিদারি থাকে না। জমিদারের কাছারিতে সময়মত খাজনা জমা দিতে না পারলে নিলামে ওঠে তালুকদারি। তারপর মোটা সেলামীর বিনিময়ে নতুন

করে পত্তনি।

পুরানো জমিদারের মধ্যে অনেকের জমিদারি চলে গেলেও বাহাদুরপুরের জমিদার চন্দ্রনারায়ণের জমিদারি এখনও সম্পূর্ণ অটুট দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত ওরফে কেষ্টদত্তর কূট কৌশলে। ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের সমাজপতি অম্বিকা বাড়ুয্যে এখন কেবল আর ঐ গ্রামের সমাজপতিই নয়, গোটা তালুকের তালুকদার। এই তালুকের পত্তনি পেতে নরহরি কবিরাজও চেষ্টার কসুর করে নি। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল অম্বিকার। গাঁয়ের মানুষও তাই চাইছিল। নরহরি কবিরাজের মত মানুষের হাতে তালুকদারি গেলে যে খাজনা আদায় নিয়ে নরহরির হাতে তাদের নাকাল হতে হবে এই আশংকা করেই তারা মনে মনে চাইছিল অম্বিকাকে। অবশেষে পত্তনি অম্বিকার হাতে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল তারা। আর ক্ষেপে উঠেছিল নরহরি। অম্বিকা বাড়ুয্যের সঙ্গে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল তার।

ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের সেকালের চৌকিদার জনার্দন সামান্ত বরাবরই ছিল একটু স্পষ্টবাদী। গ্রাম্য দলাদলিতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চেষ্টা করতো সে। তা' ছাড়া, সে জানতো গ্রামের একমাত্র রাজপ্রতিনিধিকে সহসা কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না। বাপের সেই স্পষ্টবাদিতার স্বভাবটি পেয়েছিল তার ছেলে জয়রাম। বিশেষ করে থানার পাইকগিরি পেয়ে তারও ধারণা হয়েছিল যে কেউ সহসা তাঁকে ঘাঁটাতে চাইবে না। কিন্তু জয়রাম ভুলে গিয়েছিল যে জনার্দনের আমল আর নেই। দেশের মানুষের মানসিকতারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। তা'ছাড়া, রাজার যেমন রাজত্ব গেলেও মেজাজ যায় না, পাইকগিরি ছেড়ে দিয়েও জয়রামের সেই মানসিকতা গেল না। তালুকদারীর পত্তনি নিয়ে অম্বিকা বাড়ুয্যে ও নরহরি কবিরাজের মধ্যে যখন টানাপোড়েন চলছিল তখন সে একদিন নরহরির মুখের ওপরই বলে দিয়েছিল, কবরেজের পক্ষে কবরেজি করাই সাজে, তালুকদারি করা কি তার শোভা পায়?

এমনিতে নরহরি কোনকালেই খুশি ছিল না জয়রামের ওপর। জয়রামের ছেলেবেলায় নরহরির জমিতে মনিষের কাজ ছেড়ে দেবার পর থেকেই সে এই ছেলেটার ওপর অখুশি হয়ে উঠেছিল। জয়রামের বিধবা বোন তরঙ্গকে নিয়ে তার জ্যেষ্ঠ ছেলে ভবানীর উধাও হয়ে যাবার ঘটনার পর থেকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না জয়রামকে। তার ধারণা, ঐ বদ্ বিধবা মেয়েটাই তার হীরের টুকরো ছেলেটাকে নিয়ে সটকে পড়েছে

জয়রামের কথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল নরহরির মাথায়। কী, এতবড় কথা! এককালে থানার পাইক ছিল বলে আজও ঐ ছেলেটা ধরাকে সরা জ্ঞান করে তারমত একটা বয়স্ক মানুষের মুখের ওপর এমনি কথা বলবে? কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল নরহরি, এতবড় আস্পর্দ্ধা তোর, আমাকে অপমান করিস? পরের জমিতে গতর খাটিয়ে তো এতটা বড় হয়েছিস। কেঁদে-কঁকিয়ে জমিদারের কাছ থেকে দু'বিঘা জমি হাতিয়ে নিয়ে ভেবেছিস বুঝি তুইও জমিদার হয়েছিস রে, হতভাগা?

—দেখেন, গাল দেবেন না, চড়া সুরে বলে উঠেছিল জয়রাম, আমি আপনাকে অপমান করি নাই। হক্ কথা বলেছি কেবল। এই তালুকের তালুকদারি আপনার হাতে গেলে গাঁয়ে আর আমরা বাস করতে পারবো না।

—না পারবি তো সেই বেধবা বোনটার মত তুইও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবি।

তরঙ্গের প্রসঙ্গে সেই মুহূর্তে জয়রামের মাথায়ও আগুন জ্বলে উঠেছিল। কি করবে, কি বলবে বুঝতে না পেরে সে নরহরির দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই নরহরির মেজ ছেলে রতিকান্ত তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বুড়ো বাপকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

নরহরির জ্যেষ্ঠ ছেলে ভবানীর চাইতে মাত্র বছর দু'য়েকের ছোট রতিকান্ত। স্বভাব-চরিত্রে সে তার বাপ ও দাদার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কথা বলে কম। চলন-বলনে শান্ত। কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি। সে বুঝতে পেরেছিল, অম্বিকা বাড়ুয্যের সঙ্গে পত্তনি নেবার দ্বন্দ্বে তারবাপ নরহরি যদি জেতে তা'হলে এই জয়রামের মত গাঁয়ের লোককে শায়েস্তা করতে তাদের বেগ পেতে হবে না। কিন্তু তার আগে এধরনের ঝগড়া-কাজিয়া করে কোন লাভ নেই।

এসব ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। তালুকের পত্তনি অম্বিকা বাড়ুয্যের কাছে। তার হয়ে তার ছেলে জন্মেজয়ই ইদানীং খাজনা আদায় উশুল করে বেড়ায়।

জমিদারি তো বটেই, এমনকি তালুকদারি চালাতে হলেও যে সতর্কতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন তা' কিন্তু একেবারেই ছিল না জন্মেজয়ের। অতি গোবেচারা নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সে। অপরকে বিশ্বাস করে সে ঠকে, কিন্তু তবুও হুঁস হয় না তার। এ নিয়ে কেউ কিছু বললে লাজুক কণ্ঠে জবাব দেয়, অবিশ্বাস করে জেতার চাইতে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।

অম্বিকা বাড়ুয্যে যতদিন সুস্থ ছিল ততদিন যাহোক করে ছেলে জন্মেজয়কে

দিয়ে তালুকদারির কাজ-কর্ম একরকম চালিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে সে বিছানা নিতেই তালুকদারির কাজকর্মে দিশেহারা হয়ে পড়লে জন্মেজয়। একদিক সামলাতে গেলে আর একদিকে ঘাটতি পড়ে। ভালো মানুষকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে সম্বৎসরের খাজনা বাকি-র খাতায় লেখাতে গাঁয়ের মানুষের মধ্যে অনেকেই তৎপর। কিন্তু যম ছাড়লেও জমিদার ছাড়ে না। চৈত্র মাসে জমিদারের পাওনা-গণ্ডা শোধ না করে উপায় নেই। কোন ওজর আপত্তিই কানে তুলবে না দেওয়ান কেষ্ট দত্ত। কাজেই ধার-দেনা করে হোক্ কিম্বা যেভাবেই হোক্ কিস্তির টাকা জোগার করতে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে জন্মেজয়।

জয়রাম আদার ব্যাপারী। জমিদারি, তালুকদারি ইত্যাদি জাহাজের খবরের প্রয়োজন নেই তার। কথাটা একদিন রাধাই বলেছিল তাকে। ঘুঘুডাঙ্গা গাঁয়ের পশ্চিমে সোমড়া গ্রাম। সেখানকার বিশালাক্ষি মন্দিরের দেবী নাকি খুবই জাগ্রতা। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তিনি। এক শীতের বিকেলে বিশালাক্ষি মন্দিরে পূজো দিয়ে রাধাকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরছিল জয়রাম। পথে হঠাৎ ভরু মিস্তিরের সঙ্গে দেখা হতেই ভরু ঘোমটার আড়ালে রাধাকে একবার দেখে নিয়েই হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, এই শীতের সাঁঝের বেলায় কোথা থেকে ফিরছিস রে, বাবা জয় ?

সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল জয়রাম, গিয়েছিলাম আপনার বৌমাকে নিয়ে সোমড়ার বিশালাক্ষি মন্দিরে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভরু মিস্তির বলেছিল, ভাল—ভাল, দেবী নাকি খুব সজাগ। দেখ্ যদি দেবীর দয়ায় শেষ পর্যন্ত আমাদের বৌমার কোলে একটি সন্তান আসে। এতদিন হয়ে গেল—।

কথাটা শেষ না করেই চুপ্ করেছিল ভরু মিস্তির। সেই মুহূর্তে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল রাধা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দেশ-গাঁয়ের কথা আলোচনা করতে করতে পথ চলছিল তারা। পাশাপাশি চলছিল ভরু মিস্তির ও জয়, আর তাদের পেছনে আসছিল রাধা।

একসময় ভরু বলেছিল, একালে ভালোর দিন আর নাই রে জয়। এই আমাদের জন্মের কথাই ধর না। এত ভাল হলে কি আর তালুকদারি থাকে ? যে যা বোঝায় তাই বোঝে।

—যা বলেছেন মিস্তির খুড়ো। জবাব দিয়েছিল জয়রাম, বাড়ুয্যে জ্যাঠা তা বিছানায় পড়ে। আর সেই সুযোগে অনেকেই নাকি জন্মকে ভুজুংভাজুং

দিয়ে তালুকদারি লাটে ওঠাবার ব্যবস্থা করেছে।

—হ্যাঁরে, বলে উঠেছিল ভরু, লোকে বলে এর পেছনে নাকি ঐ কবরেজের হাত আছে।

নরহরির প্রসঙ্গে মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল জয়ের। বলেছিল, হতে পারে। তবে আমার মনে হয় এর পেছনে আসল মানুষ তার মেজ ছেলেটা।

—মেজটা? মানে, ঐ রতিকান্ত?

—হ্যাঁ খুড়ো, জবাব দিয়েছিল জয়, সেদিন শুনলাম এই তালুকদারি লাগাবার চেষ্টায় লোকটা নাকি খুব ঘন ঘন বাহাদুরপুর দৌড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলে ভরু মিস্ত্রির আবার বলেছিল, তা' হতে পারে। কবরেজের এই মেজ ছেলেটা নাকি পেটে খুব বুদ্ধি ধরে।

—হ্যাঁ খুড়ো। থাকে ভিজে বেড়ালটির মত। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নাই। ভিতরে ভিতরে নানারকম ফন্দি নাকি ওর মাথায়।

—আর বাহাদুরপুরের জমিদারও হয়েছে তেমনি। রাত দিন তো মদ আর মেয়েমানুষের মধ্যে ডুবে থাকে। যা করে ঐ দেওয়ান কেষ্ট দত্ত।

—কেষ্ট দত্ত তো তবু একটু পদে আছে, বলতে থাকে জয়রাম, কিন্তু ঐ নায়েব দেওয়ান মুকুন্দলাল লোকটা দারুণ ধড়িবাজ। ওর অসাধ্য কোন কাজ নাই। রতিকান্ত নাকি মুকুন্দলালের কাছেই ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছে।

আবার একটুসময় চিন্তা করে বলেছিল ভরু, তা'হলে হয়তো তোর অনুমানই ঠিক। বাড়ুয্যেদাদার ছেলেটা তো ভ্যাবাগঙ্গারাম। ওকে পথে বসিয়ে তালুকদারি হাতে পাওয়ার লোভেই হয়তো রতিকান্ত চেষ্টাতদ্বির শুরু করেছে।

জয়রাম আর কিছু না বলে কেবল পথ চলছিল। ভরু আবার বলেছিল, বয়স হয়েছে। আজকাল আর বেশি চলতে ফিরতেও পারি না। তাই দেশ-গাঁয়ের কোন খবরও পাই না। তুই বাবা জয় তো অনেককাল পাইকগিরি করেছিস। জমিদারের কাছারিতেও তোর যাতায়াত আছে। আসল খবরটা একবার নে তো।

—হ্যাঁ নেবো খুড়ো। জবাব দিয়েছিল জয়।

বাড়ি ফিরে এসে কথায় কথায় রাধাই বলেছিল জয়কে, দেখ বাপু, আমার কিন্তু এসব ভালো ঠেকছে না।

—কি সব? স্ত্রীর কথাটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিল জয়।

জবাবে বলেছিল রাধা, তুমি বাপু আদার ব্যাপারী। নিজের জমিটুকুনের চাষবাস নিয়েই থাকো। ঐ জমিদারি, তালুকদারির মধ্যে তোমার মাথা

পলানো কেন? শত্রুর বাড়িয়ে লাভ কি? কার জমিদারি গেল, কার তালুকদারি রইলো তা' দিয়ে আমাদিগের দরকার কি? কেউ কি আমাদিগের খাজনা দু'টো পয়সা মুকুব করবে?

রাধা যে কথাটা মিথ্যে বলেছে তা' নয়। জয়রাম বুঝতে পারে এসব ব্যাপারে না থাকাই ভালো। কিন্তু গাঁয়ে বাস করে চোখ বন্ধ করে থাকা যে সম্ভব নয় সেই কথাটা রাধাকে বোঝাবে কেমন করে? স্ত্রীলোকের পক্ষে তা' সম্ভব হলেও পুরুষের পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়। বিশেষকরে জয়রামের যা স্বভাব তাতে তার পক্ষে গাঁয়ের ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত থাকা তো একেবারেই অসম্ভব।

ইদানীং নিজের সংসার সম্পর্কে খানিকটা নিশ্চিন্তবোধ করছে জয়রাম। আগে মাঠে কাজে গিয়েও মনে মনে বাড়ির জন্যে উৎকণ্ঠা বোধ করতো। উৎকণ্ঠা রাধাকে নিয়ে। একে প্রথম পোয়াতি, তায় আবার নানা ধরনের উপসর্গ। বাড়িতে এমন একটা লোক নেই যে প্রয়োজনে একটু সাহায্য করতে পারে। এখন বাড়িতে এসেছে লাবণ্য ও তাদের বড়মা। শত হলেও ওরা রাধার নিজের লোক।

ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। লাবণ্যর অবস্থাও তাই। যতই দিন যেতে থাকে ততই জয়রামের সংসারটা লাবণ্যর ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এই নির্ভরতার সূত্রে জয়রাম নিজের অজান্তেই যেন লাবণ্যর মধ্যে খুঁজে ফিরতে থাকে সেই পুরানো দিনের লাবণ্যকে। এতদিনে যেন সে বুঝতে পারছে যে লাবণ্যকে ভুলতে চেষ্টা করেও সে তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি। নৈকট্যের জলধারায় শুকিয়ে ওঠা গাছের ডালে যেন দেখা দিয়েছে সবুজ পাতার কুঁড়ি। এতকাল সন্ধ্যায় জয়রাম মাঠ থেকে ক্লান্ত শরীরে ফিরে ঘরের দাওয়ায় এসে বসলেই রাধা হাতের কাজ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াতো। বাতাস করতো জয়রামকে, ধামায় করে গুড়-মুড়ি এনে ধরতো ক্ষুধার্ত স্বামীর সামনে। রাধা আজও তাই করে। অসুস্থ শরীরে আজও সে এসে দাঁড়ায় গুড়-মুড়ির ধামা নিয়ে। কিন্তু জয়রামের মুখে দেখতে পায় না আগের সেই তৃপ্তির হাসি। তার বদলে ধামা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকে লাবণ্যকে। কোনদিন হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে বলেই ফেলে, তোমার দিদি কোথায় গো? দেখছি না যে?

স্বামীর প্রশ্নে মুহূর্তের জন্যে মুখখানা হয়তো গম্ভীর হয়ে ওঠে রাধার। রক্ষণেই নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়, আছে হয়তো কোথাও।

রাধার জবাবের ভঙ্গিতে সতর্ক হয়ে ওঠে জয়রাম। এমন ভাব দেখায় যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। রাধা আর কিছু না বলে উঠে যায় সেখান থেকে। ধামা থেকে দু' মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে জয়রাম লাবণ্যের জন্যেই প্রতীক্ষা করতে থাকে।

জয়রামের এধরনের আচরণ লাবণ্যার নিজের কাছেও বিসদৃশ লাগে। ছি-ছি, রাধা এসব টের পেলে কি ভাববে! কিন্তু লাবণ্য নিরুপায়। সে কেমন করে নিজের মুখে বারণ করবে জয়রামকে? তা'ছাড়া একই বাড়িতে বাস করে সে কেমন করে এড়িয়ে চলবে তাকে? এই পৃথিবীতে কেউ একজন তাকে নিয়ে ভাবে, তাকে দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে—এই অনুভূতিটুকু যে তার শুষ্ক হৃদয়রাজ্যে আজও আলোড়ন তোলে তা' তো অস্বীকার করতে পারে না লাবণ্য। কিন্তু তাই বলে জয়রামের এই আচরণকে সমর্থন করতেও পারে না। শুদ্ধাচারিণী বিধবা সে। জয়রাম তার ছোট বোনের বর। এই মুহূর্তে তার নিজের কাছে জয়রামের এটাই তো বড় পরিচয়। এর বাইরে আর কোন পরিচয় তো থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

সন্দেহ সন্দেহকেই বাড়িয়ে তোলে। ইদানীং জয়রামের প্রতিটি ভাবভঙ্গির মধ্যেই রাধা অন্য কিছু খুঁজে বেড়ায়। তার একটা সাধারণ কথার মধ্যেও সে আবিষ্কার করে অন্য কোন অর্থ। মানসিক অশান্তিতে ছটফট করে রাধা। রাতের ঘুম চলে যায়, খাদ্যবস্তুতে স্পৃহা থাকে না। রাত-দিন বিছানায় শুয়ে কেবল চিন্তা আর চিন্তা। খেইহীন চিন্তার মধ্যে কখনও সে দায়ী করে জয়রামকে, কখনও লাবণ্যকে। কিন্তু তার বিয়ের পর থেকে এই দীর্ঘদিন জয়রাম ও লাবণ্যর আচার আচরণের সঙ্গে আজকের এই আচরণের মিল খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত বোধ করে সে। অবশেষে তাদের দু'জনকে ছেড়ে সে নিজেকেই দায়ী করে। হ্যাঁ, সে নিজেই এজন্যে দায়ী। সে যদি সেদিন চিতলমারী চলে যেতো তা'হলে হয়তো জয়রামের এই পরিবর্তন ঘটতো না।

দিনে-দিনে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে রাধা। কণ্ঠার হাড় জেগে ওঠে তার। চোখের কোণে পড়ে কালির প্রলেপ। মনের কথা একজন কাউকে বলতে পারলে হয়তো একটু শান্তি পেত। কিন্তু বলবে কাকে? এ যে ভয়ানক লজ্জার কথা। লাবণ্যকে সে জানে। একরোখা চরিত্রের তার ঐ দিদিটি রাধার মনের কথার সামান্যমাত্র আঁচ পেলে সেই মুহূর্তেই যে এখান থেকে চলে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মনের কথা সন্তর্পণে মনের মধ্যে চেপে রাখতে গিয়ে অসুস্থতা আরও বেড়ে ওঠে রাধার। অবশেষে

একদিন শয্যা নেয় সে।

জয়রামের সংসারে এই তিনজন নারী-পুরুষের অসুস্থ ত্রিকোণ মানসিকতার মধ্যে একমাত্র সুস্থ ওদের বড়মা হেমাঙ্গিনী। কোন কিছুই নজরে পড়ে না এই বৃদ্ধার, আর পড়লেও সে বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে কেবল অনুযোগের স্বর তোলে, দেখছিস মেয়েটার দশা? আমার কিন্তু বাপু ভালো ঠেকছে না। এ পোয়াতির রোগ না। কেউ নজর দিয়েছে মেয়েটার ওপর। ওঝা-বদ্যি ডাক তোরা।

রাধার অবস্থা দেখে শংকিত হয়ে ওঠে লাবণ্য। জয়রাম একে পোয়াতির রোগ বলে অগ্রাহ্য করতে চাইলেও নাছোড়বান্দা লাবণ্য বলে, না ছোটপাইক, এসব হেলা-ফেলার বিষয় না। তুমি আজই কবরেজের কাছে যাও।

ঘুঘুডাঙ্গার কবিরাজ নরহরি এখন আর চোখেও ভালো দেখতে পায় না। তা'ছাড়া, তার কাছে যেতেও তেমন ইচ্ছে ছিল না জয়রামের। তাই বাধ্য হয়ে তাকে কবিরাজের খোঁজে যেতে হয় পাশের গাঁয়ে।

বৃদ্ধ কবিরাজ রাধার নাড়ি টিপে, চোখের পাতা, হাতের নখ পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে জয়রামকে বললে, এ তোমরা কী করেছ হে? মেয়েটা যে মরতে বসেছে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা আশঙ্কায় জয়রামের মনটা কেঁপে ওঠে। কবিরাজের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে কেবল তাকিয়ে থাকে সে।

বৃদ্ধ কবিরাজ বলতে থাকে, গায়ে এক ফোঁটা রক্তও নাই। ভালমত দুধ-ঘি খাওয়াতে হবে। ভাল রাখতে হবে মনটা। নইলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পেটের সন্তানটাও যাবে। স্পষ্ট ভাষায় কথাগুলো বলে সামান্য কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করে উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধ কবিরাজ।

এরপর থেকেই লাবণ্যর মধ্যে ফুটে উঠলো এক আশ্চর্য সেবিকা মূর্তি। সংসারের দিকে নজর রইলো না তার, খেয়াল রইলো না নিজের পূজোআর্চার দিকে। এমনকি জয়রামের কথাও যেন সে ভুলে গেল। ছোট বোন রাধার সেবা শুশ্রূষাই হয়ে উঠলো তার প্রধানতম কাজ। সে যেন পণ করেছে রাধাকে সে সুস্থ করে তুলবেই।

একদিন রাধার শিয়রে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে লাবণ্য বললে, একটা কথার সত্য জবাব দিবি?

কোটরগত চোখ জোড়া দিদির মুখের দিকে তুলে ম্লান কণ্ঠে রাধা বললে, কি?

সহসা আর কিছু বলে না লাবণ্য। বুকটা ধড়াস করে ওঠে রাধার। এই ক'টা মাস ধরে মনের যে কথাটা সে সঙ্গোপনে নিজের মনেই লুকিয়ে রেখেছিল সেটা কি তবে তার দিদি টের পেয়েছে? ঘুমের মধ্যে তেমনিবেফাস কিছু বলে ফেলেছে নাকি? চোখ বন্ধ করে লাবণ্যর কথা শোনার জন্যে কানদুটো খাড়া করে রাখে রাধা।

এক সময় চাপা সুরে লাবণ্য বললে, তোকে দেখে মনে হয় বুকের মধ্যে কোন একটা কষ্ট তুই লুকিয়ে রেখেছিস। সত্য করে বল্ তো, সেটা কি?

জবাব দেয় না রাধা। তেমনি চোখবুজে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে কেবল।

হঠাৎ লাবণ্য বলে ওঠে, তুই না বললেও আমি জানি তোর কি কষ্ট রে। ছোটপাইকের চলন-বলন তোর ভালো লাগছে না, কেমন?

স্তম্ভিত রাধা একবার মাত্র চোখ খুলে লাবণ্যের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে। লাবণ্য লক্ষ্য করে রাধার বন্ধ চোখের দুই কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রাধার কপালের ওপর থেকে কয়েকগাছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে সস্নেহ কণ্ঠে লাবণ্য আবার বললে, জানি রে, তুই না বললেও আমি সব বুঝতে পারি আমি যে তোর দিদি।

নিজেকে আর সামলাতে পারে না রাধা। হঠাৎ পাশ ফিরে শুয়ে দু'হাতে লাবণ্যকে জাপটে ধরে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

কেঁদে চলছে রাধা। অঝোরে ফুলে ফুলে কেঁদে চলছে। তার কয়েক মাসের বন্ধ কান্না চোখের জলের সহস্র ধারায় সে ঢেলে দিচ্ছে তার দিদির ওপর। লাবণ্য কিন্তু অচঞ্চল, স্থির। একসময় রাধা টের পায় তার গায়ের ওপর ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে তার দিদির চোখের জল। লাবণ্যও কাঁদছে। বোনের দুঃখে দিদি কাঁদছে। সহসা লাবণ্য উপুর হয়ে রাধার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলতে থাকে, তুই নিশ্চিন্দি থাক্ বোন, ছোট-পাইকের সাধ্য কি তোকে হেলাফেলা করে অন্য কোন দিকে চোখ ঘোরায়?

নতুনকে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত জয়রাম। বাড়ির পেছনের গোয়ালঘরখানি রূপান্তরিত হয়েছে আঁতুর ঘরে। ঐ ঘরেই আগমন ঘটবে নতুনের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে সে বাবা হতে চলেছে। মনের মধ্যে উদবেগাকুল আনন্দ। উদ্বেগ রাধাকে নিয়ে। ওর শরীরের যা অবস্থা।

অবশেষে এসে গেল সেই বিশেষ দিনটি। আঁতুর ঘরে গাঁয়ের কয়েকজন স্ত্রীলোক ও লাবণ্য। বাইরের উঠোনে উদ্বিগ্ন জয়রাম ও দু'একজন প্রতিবেশী।

খবর পেয়ে দক্ষিণপাড়া থেকে রমজানও এসে হাজির হয়েছে। জয়রামের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একজন প্রতিবেশী প্রৌঢ় আশ্বাস দেয় তাকে, এত ভাবনার কি আছে রে, জয় ? ওঘরে যারা আছে তারা সবাই একাজে ওস্তাদ। গাঁয়ের অনেক ছেলে-মেয়েকেই ওরা এই পৃথিবীতে এনেছে রে। ভাবনার কিছু নাই। কয়েকদণ্ড ধৈর্য ধর।

এলো সেই মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে গর্ভিনীর কাতর আর্তনাদ, স্ত্রীলোকদের চাপা কণ্ঠস্বর, এটা-ওটা আনা-নেয়া করতে লাবণ্যর ত্রস্ত পায়ে ছুটোছুটি।

উঠোনে একখানা বাঁশের খুঁটি শক্ত হাতে চেপে ধরে দূরে তাকিয়েছিল জয়রাম। কান দু'টো তার খাড়া হয়েছিল আঁতুর ঘরের দিকে। হঠাৎ আঁতুর ঘর থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসতেই সে চমকে ওঠে। দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। বুকের মধ্যে জেগে ওঠে এক অনাস্বাদিত আনন্দের জোয়ার। এতকাল পরে বাবা হয়েছে সে। কিন্তু কী হয়েছে ? ছেলে না মেয়ে ? জয়রামের সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হয় আঁতুর ঘরে ছুটে গিয়ে আপন সৃষ্টিকে চাক্ষুস দেখতে। কিন্তু তা' সম্ভব নয়। আছে কিছু সামাজিক রীতি-নীতি। আছে কিছু বাধা-নিষেধ। সে সব ডিঙিয়ে তবেই পিতা দেখতে পাবে তার সন্তানের মুখ।

এমনি সময় আঁতুর ঘর থেকে দু'জন বয়স্কা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে ঘোমটার আড়ালে কয়েক ঝাঁক উলু দিয়ে সেই সদ্যোজাতকে আমন্ত্রণ জানায়। আর সেই উলুধ্বনির ঝাঁকের সংখ্যা দিয়েই প্রতিবেশিনীরা বুঝতে পারে জয়রামের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের আবির্ভাব ঘটেছে।

জয়রামের উঠোনে প্রতিবেশিনীদের ভিড়। সঙ্গে একদল নগ্ন শিশু। প্রত্যেকের মুখে-চোখেই আনন্দের চিহ্ন। সেই সঙ্গে তাদের কৌতূহলও কম নয়। কেমন হয়েছে দেখতে সেই শিশু, কতটা বড় হয়েছে, মাথায় চুল হয়েছে কিনা, গায়ের রং রাধার মত ফর্সা নাকি জয়রামের মত কালো ইত্যাদি নানা ধরনের আলোচনায় মশগুল তারা।

একসময় বৃদ্ধ রমজান এগিয়ে এসে জয়রামের কাঁধ স্পর্শ করতেই জয়রাম চমকে উঠে তাকায়। রমজান একটু তৃপ্তির হাসি হেসে মৃদু কণ্ঠে বললে, কিরে জয়, এবার নিশ্চিন্দি হলি তো ?

জয়রাম মুখে জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে।

হঠাৎ ছন্দপতন। আঁতুর ঘরে জেগে ওঠে লাবণ্যর আর্তনাদ। সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকদেরও এস্ত কণ্ঠস্বর। মুহূর্তে পাল্টে যায় পরিবেশ। সচকিত প্রতিবেশীরা

ছুটে যায় আঁতুর ঘরের দিকে। হাসিটুকু মিলিয়ে যায় জয়রাম ও রমজানের মুখ থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার সামনে আবির্ভাব ঘটে লাবণ্যর। আলুথালু বেশ তার। উদ্‌ভ্রান্ত মুখ চোখ। জয়রামের দিকে চোখ পড়তেই ডুকরে কেঁদে ওঠে লাবণ্য। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, একি হলো গো। ছোটপাইক, এ আমাদিগের কী হলো গো! রাধা—রাধা আর নাই গো।

সেই মুহূর্তে জয়রামের উঠোনে যেন একটা বাজ পড়ে। সবাই হতভম্ব। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। সবার চোখে মুখেই একই প্রশ্ন—এ কী হলো? এ কেন হলো?

জয়রাম স্তব্ধ। কি করবে, কি বলবে যেন বুঝতে পারছে না। হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে ওঠে—কব্‌রেজ—কব্‌রেজকে ডাকো। শিগগির ডাকো।

কথাটা কানে যেতেই পাগলের মত বাইরের দিকে ছুটে যায় জয়রাম। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে রমজান বলে ওঠে, না-না, তুই না। ঐ তো ওবাড়ির মদন যাচ্ছে। তুই থাক্‌।

শেষপর্যন্ত নরহরি কবিরাজই এলো। ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করলো প্রসূতিকে। তারপর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এসে সোজা বাইরে চলে গেল। তার আর কিছুই করার ছিল না তখন।

এতক্ষণ বৃদ্ধ রমজান দু'হাতে নিজের কাছে ধরে রেখেছিল জয়রামকে। সেই মুহূর্তে জয়রামের ভাবনা চিন্তার শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট ছিল না। একদৃষ্টে সে কেবল তাকিয়েছিল আঁতুর ঘরের দিকে। অবশেষে নরহরি কবিরাজ কাউকে কিছু না বলে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতেই জয়রাম 'চাচা' বলে আর্তনাদ করে উঠে দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে সেখানেই বসে পড়লে।

পনের

"শোনেন—শোনেন গো মশাইরা। শ্রীল শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম, এখন থেকে গঙ্গাসাগরে মানত করে কেউ পুত্তুর-কন্যেকে গঙ্গায় বেসজ্জন দিতে পারবেন না। কেউ যদি দেন কিম্বা দিতে চেষ্টা করেন তা'হলে তাকে কয়েদ যেতে হবেক।"

কথার শেষে ঢেঁড়াওয়ালার ঢেঁড়া ডুম্‌ ডুম্‌ শব্দে বেজে উঠতেই ঢেঁড়াওয়ালা

ও তার দলবলের চারিদিকে একটা ছোটখাটো জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়।

জায়গাটার নাম রবিচরের হাট। ঘুঘুডাঙ্গা থেকে তিন ক্রোশ দূরে দামোদরের পাড়ে এই রবিচরের হাট দিন-দিনই জমে উঠেছে। একটা মস্ত মান্ধাতা আমলের বটগাছকে ঘিরেই এই হাট। কাছের-দূরের গাঁ থেকে ব্যাপারীরা এখানে নিয়ে আসে তাদের পসরা। চলে জোর বেচাকেনা। হপ্তায় মাত্র একদিন রবিবার হাট বসে এখানে।

জয়রাম ও তার চারপাঁচজন সঙ্গী এই হাটে নৌকোয় চাপিয়ে ধান নিয়ে এসেছিল বিক্রি করতে। বিক্রি-বাট্টার শেষে যখন তারা গাঁয়ে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ঠিক তখনই ঢেঁড়াওয়ালার দলটি সেই বটগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে ঘোষণা করছিল কোম্পানী বাহাদুরের নিষেধাজ্ঞা—গঙ্গাসাগরে মানত করে কেউ পুত্তুর-কন্যেকে গঙ্গায় বেসজ্জন দিতে পারবেক না —।

কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম সেই হাটের মধ্যে বেশ কয়েকবার ঢেঁড়া পিটিয়ে শুনিয়ে দিয়ে দলটি ভিন্ গাঁয়ের দিকে পা বাড়াতেই জনতার ভিড়ও পাতলা হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাটুরেদের মধ্যেও শুরু হয় গুঞ্জন—এ কেমন ধারা হুকুম হে! মানত রক্ষে করতে পারবো না? এতে যখন মা গঙ্গার ক্রোধ হবেন তখন ঐ সুবুদ্ধির পুত্তুর কোম্পানী বাহাদুর কি আসবে তা' ঠেকাতে?

বাস্তবিকই তাই। মা গঙ্গার ক্রোধ ঠেকানোর মত কোন পরিকল্পনা না করেই কর্ণওয়ালিস সাহেব হিন্দুর এই বহুকালের প্রথা বন্ধ করতে জারি করলে হুকুম। আর তারই ফলে দিকে-দিকে দেখা দিল ক্ষোভ ও অসন্তুষ্ট।

গাঁয়ে ফেরার পথে জয়রাম ও তার দলবলের মধ্যে এটাই হয়ে উঠলো প্রধান আলোচনার বিষয়। কেউ একে সমর্থন করে, কেউ করে না। কেউ বলে, ভালই হয়েছে গো। ধম্মের নামে এভাবে সন্তান বেসজ্জন বন্ধ করে কোম্পানী ভালই করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে আর একজন। বলে ওঠে সে, মানত যদি রক্ষে করতেই না পারো তা'হলে মানত করতে যাওয়া কেন, শুনি? জানো তো হে, কথার খেলাপ গো-বধতুল্য পাপ, বিশেষ করে দেব-দেবতার কাছে কথার খেলাপ হলে তো নরকেও তার স্থান হবে না। একেবারে নির্ব্বংশ হতে হবে। আলোচনার যোগ দিয়ে তৃতীয় আর একজন বললে, পাপ-পুণ্যি তো পরের কথা। তোরা বাপু কেরেস্তান, আর আমরা হিন্দু। আমাদের নিয়ম-কানুন বদলাবার তোরা কে হে?

আলোচনায় জয়রাম কিন্তু যোগ দেয় না। একটা কথাও বলে না সে।

কেবল মাথা নীচু করে পথ চলতে থাকে। আসলে কোন ব্যাপারেই আজকাল আর আগ্রহ নেই তার। মাঠের কাজ করতে হয় বলেই করে, হাটে গিয়ে ধান চাল বেচতে হয় বলেই বেচে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সবই যেন শেষ হয়ে গেছে রাধার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে।

জয়রামকে আলোচনায় টেনে আনতে গিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে জয়, তুই এবার কি করবি? শুনলাম, গঙ্গাসাগরে মানত করার পরেই নাকি তোর বৌয়ের পেটে ছেলেটা এয়েছিল।

রাধার প্রসঙ্গ জয়রামকে আরও বেশি উন্মনা করে তোলে। প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপর আবার পথ চলতে থাকে নিঃশব্দে।

প্রশ্নকর্তা আবার বলে ওঠে, কিরে, তুই এবার কি করবি? বৌয়ের মানত রক্ষে করতে গঙ্গাসাগর যাবি নাকি রে?

জয়রাম জবাব দেবার আগেই বলে ওঠে আর একজন, মানত করেছে বৌ, আর তা' রক্ষে করতে যাবে জয়? তাও যদি বৌটা বেঁচে থাকতো।

পড়শীদের মুখে রাধার প্রসঙ্গ সেই মুহূর্তে ভালো লাগছিল না জয়রামের। ঐ প্রসঙ্গে ইতি টানতে গিয়েই শেষপর্যন্ত মুখ খুলতে হলো তাকে। চলতে চলতে বললে, এখনও কিছু ভাবি নাই।

বাস্তবিকই তাই। রাধার অকাল মৃত্যুর ধাক্কা তখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেনি জয়রাম। মৃত্যুর তিন মাস পরেও তার আচার-আচরণে সেই একই ঔদাসীন্য। এমনকি লাবণ্যও পারেনি তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে তুলতে।

রাধার আকস্মিক মৃত্যু জয়রামের মনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। লাবণ্য ভেবেছিল এটা সাময়িক। শোকের ধাক্কা কেটে গেলেই সে আবার ফিরে আসবে নিজের স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা' ঘটলো না। জয়রামের সেই ভাঙা মন ভাঙাই রইলো। লাবণ্য তার সেবা-যত্ন দিয়েও পারলে না তা' জোড়া লাগাতে।

তিন মাসের ছেলেটা মায়ের বদলে পেয়েছে মাসীর কোল। দুধের বদলে পিটুলি গোলার মত মায়ের বুকের দুধের বদলে মাসীর হাতের ঝিনুক-দুধেই সে খুশি। কিন্তু তবুও সময় সময় প্রাকৃতিক নিয়মে বুকের দুধের বায়নায় পেয়ে বসে তাকে। ঝিনুক-দুধ কিছুতেই রোচে না তার মুখে। ছেলের চিৎকারে অসহ্য হয়ে উঠে বৃদ্ধা হেমাঙ্গিনী বলে, ওরে ও লাবি, থামা ছেলেটাকে।

চেষ্টার ত্রুটি করে না লাবণ্য কিন্তু কিছুতেই ছেলেকে থামাতে না পেরে